চেনা মহল

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

চেনামহল

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিমিটেড

প্রথম সংস্করণ মহালয়া ১৩৬০

দ্বিতীয় সংস্করণ বৈশাখ ১৩৬১

প্রকাশক

নির্মলকুমার সরকার

ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিমিটেড

৮৯ হ্যারিসন রোড কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর

দেবেন্দ্রনাথ বাগ

ব্রাহ্ম মিশন প্রেস

২১১ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদ

পূর্ণেন্দু পত্রী

মুদ্রণ

ফ্যান্সী প্রিণ্টিং কোং

বাঁধাই

স্বস্তিকা বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্

দাম পাঁচ টাকা

উৎসর্গ

সত্যেন্দ্রনাথ রায়

বন্ধুবরেষু

ানা ঘরের বড় ঘড়িটা একটানা বেজেই চলেছে—ঢং ঢং ঢং ঢং।
আরো যে বাজে। আবার বুঝি আগের মত বিগড়েছে ঘড়ি।
টা না বাজবার আগে আর থামবে না। কিন্তু এদিকে বাইরের
ার পাতলা হয়ে এসেছে। ভুবনময়ী শিয়রের জানলা দিয়ে
কবার তাকিয়েই তা টের পেলেন। ভোর হয়ে এল বলে। চারটে
কি সাড়ে চারটেই বাজল। কিন্তু ঘড়ির বাজনার শব্দে তা বুঝবার
ন্যে ভুবনময়ীকে ঘড়ির দিকে তাকাতে হয় না। ঘড়ির শব্দে কানও
ততে হয় না তাঁকে। সময় তিনি অমনিতেই টের পান। ঠিক
তনটের সময় রোজই তাঁর ঘুম ভাঙে। আজও তাই ভেঙেছে।
ঠক যা ভেবেছেন। বারো বার শব্দ করবার পর ঘড়িটা থামল।
াবার মাসখানেক হোল বিগড়েছে। বাড়িতে এত লোক। কিন্তু এ
ড়ি তেমন ভালো করে মেরামত করবার দিকে কারো ঝোঁক নেই। এ
ড়ির জন্যে তো কেউ অপেক্ষা করেনা। জনে জনে ছেলে-বুড়ো
নেকের হাতেই এখন ঘড়ি হয়েছে। তারা সেই হাত-ঘড়ি দেখেই
কলেজে যায়, অফিসে যায়।
দেয়াল ঘড়ির দিকে কারো তাকাবার দরকার হয় না।
ছলে বৈদ্যনাথ বলেছিল, 'মা, এবার ঘড়িটাকে ওখান থেকে সরিয়ে
ফেলি।'
ভুবনময়ী বলেছিলেন, 'সরিয়ে ফেলবি কেন। সারিয়ে আন।'
বৈদ্যনাথ বলেছিল, 'কতবার সারালাম। ও আর ঠিক হবে না।'
ভুবনময়ী জবাব দিয়েছিলেন, 'না হয় না হোল। তবু ও ঘড়ি ওখানেই
থাকবে। খবরদার ওতে পাছে হাত দিস। ও তাঁর হাতের জিনিস।'
ছেলে তা জানে। তাই আর কোন কথা বলেনি।

কর্তার নিজের হাতে কেনা ঘড়ি। সেই থেকে আজ কুড়ি বছ
ওই একই জায়গায় ঘড়িটা রয়েছে। তাঁর হাতের জিনিস বে
ওই ঘড়ি। বাড়ি ভরেই তো তাঁর হাতের জিনিস ছড়ানো।
পড়ে থাকে। শুধু মানুষ থাকে না।

ভুবনময়ী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। কতকাল হয়ে গেল
গেছেন। যাওয়ার আগে বলেছিলেন, ভেব না, তোমাকেও
বাদে টেনে নেব। ওগো, এই বুঝি তোমার দুদিন। যুগ-যুগ
হয়ে গেল যে। আর কতকাল ফেলে রাখবে, আর কতকাল
থাকবে।

কিন্তু ভুবনময়ী নিজেও কি ভুলে থাকেন নি? কই, কয় সময় তা
কথা মনে পড়ে, তাঁর মুখ মনে পড়ে। মনে পড়বার কি জো আছে
একপাল শত্রু যে তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে। কেবল বাঁধ
কেবল বাঁধন। 'লোহার বাঁধনে বেঁধেছে সংসার দাস-খত লি
নিয়েছে হায়।' তিনি গাইতেন। ভারি চমৎকার ছিল গলা।
কিন্তু মেয়েটার কাণ্ড দেখ। শোওয়ার ছিরি দেখ ওর।

'ও মিণ্টু, পা-টা একেবারে আমার গলার ওপর তুলে দিলি নাকি
এ্যাঁ? মেরে ফেলবি নাকি আমাকে? বজ্জাত মাগী। আট উৎরে
বছর বয়স হোল তোমার, তবু শোওয়া ঠিক হলো না?'

নাতনী মিণ্টুর পা-টা একটু রাগ করেই সরিয়ে দিলেন ভুবনময়ী।
একতলার ঘরের মেঝেয় ঢালা বিছানা। ডাইনে বাঁয়ে ছোট বড় না
বয়সী ডজন খানেক পৌত্র পৌত্রী, দৌহিত্র-দৌহিত্রী নিয়ে ভুবনময়ীকে
রাত কাটাতে হয়। দিনটাও এদের পরিচর্যায় আর রাগারাগি চেঁচা
মেচিতেই কাটে। আচ্ছা ফ্যাসাদ হয়েছে যা হোক। একটুকা
নির্জনে শান্তিতে বসে দুদণ্ড যে ঠাকুর-দেবতার নাম করবেন
হবার জো নেই। সে পথে কাঁটা দিয়েছে শত্রুরা। সব শত্রু,
শত্রু। নিজের পেটে হয়েছিল দুটি। তাদের ভিতর থেকে কা
গুলি বেরিয়েছে দেখ। রাবণের বংশ।

ঠাকুরমার ধাক্কা খেয়ে মিণ্টুর ঘুম ভেঙে গেছে; অভিমানে সে খানিকটা দূরে সরে গিয়ে একটুকাল চুপ করে রইল, তারপর বলল, 'আমার পা-টা মুচড়ে দিলে কেন ঠামা?'
ভুবনময়ী বললেন, 'ঈস মুচড়ে কেন, একেবারে ভেঙে দিয়েছি। দিয়েছি তো বেশ করেছি। যা কাল থেকে আমার কাছে আর থাকিসনে। আসিসনে আর এ-ঘরে শুদ্ধু। নিজের বাপ-মার কাছে থাকিস। মার-গুঁতো খাওয়ার জন্যে পরের কাছে এসে দরকার কি। বেশ মজা পেয়েছে তোদের বাপ-মা। বছর বছর একটি করে হবে আর এক একটিকে নিচের ঘরে ঠেলে পাঠাবে। নিজেরা আরামে নাক ডেকে ঘুমুতে পারলেই হোল। আর কেউ সারা রাতের মধ্যে চোখের পাতা এক করতে না পারুক তাতে কার কি এসে যায়। হ্যাঁরে মিণ্টু, সত্যিই লেগেছে নাকি তোর পায়ে? দেখি আয় দেখি এদিকে।' এবার মিণ্টু সরে এসে সাদরে ঠাকুরমার গলা জড়িয়ে ধরল, 'একটুও লাগেনি ঠামা। একটুও না। আমি অমনি অমনি বলছিলাম।' তারপর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে বলল, 'আজ কি হবে জানো ঠামা?' ভুবনময়ী বললেন, 'এই মুখ সরা, মুখ সরা। অমন করিসনে মিণ্টু। আমার শুড়শুড়ি লাগে।'
এপাশে ওপাশে নাতি-নাতনীর দল খিল খিল করে হেসে উঠল। শুড়-শুড়ি কথাটাই তাদের শুড়-শুড় দিয়েছে।
মিণ্টু কিন্তু মুখ সরাল না। ঠাকুরমার কানের সঙ্গে মুখ লাগিয়ে তেমনি ফিস ফিস করেই বলল, 'জানো ঠামা আজ নান্তুদা আসছে। দিল্লী থেকে নান্তুদা আসছে আজ। মনে আছে তোমার?'
ভুবনময়ী বললেন, 'না আমার মনে নেই, তোমার আছে। রাত তিনটের ঘুম ভাঙতেই সে কথা আমার মনে পড়েছে। নান্তু আসবে, সে কথা আমর মনে নেই। শোন কথা।'
অন্তু সন্তু টুনু বুলুর দল কল্ কল্ করে উঠল, 'আমাদের

সকলেরই মনে আছে। নান্তুদা আসবে. সে কথা কালও তো আমরা বলা-বলি করতে করতে ঘুমালাম। মিণ্টু তো আগে ঘুমিয়ে পড়েছিল।'

মিণ্টু প্রতিবাদ করল, 'এই মিথ্যে কথা বলবিনে,—'

ভুবনময়ী ধমক দিলেন, 'হ্যাঁ, এই নিয়ে ঝগড়া কর সক্কালবেলা। আর সারাদিন মারামারি কাটা-কাটি করে মর। একটা ভালো কথা, কি কোন ঠাকুর-দেবতার নাম তো কোন দিন মুখে নিয়ে উঠবিনে। বাপ-মার যেমন শিক্ষে, তেমন তো হবে। আর তোদের পাল্লায় পড়ে, তোদের সংসর্গ থেকে আমারও জপ-তপ, শিক্ষা-দীক্ষা সব গেছে।' বিছানা ছেড়ে এবার উঠে পড়লেন ভুবনময়ী। ফের তাড়া দিলেন নাতি-নাতনীদের, 'আর গড়াগড়ি করিসনে। ওঠ এবার উঠে বিছানা তোল।'

খিল খুলে ভুবনময়ী বেরুলেন ঘর থেকে। সামনেই মেয়ের সঙ্গে দেখা। দোতলা থেকে ভুবনময়ীর মেয়ে বাসন্তী নেমে এসেছেন। মেয়েকে দেখে ভুবনময়ী একটু যেন থমকে দাঁড়ালেন, 'ও বাসি, তুই আবার এত ভোরে উঠলি কেন। তোর না শরীর খারাপ। জ্বর জ্বর হচ্ছে ক'দিন ধরে। কেন উঠলি তুই। যা আর একটু শুয়ে থাক গে যা।'

তেতাল্লিশ উৎরে চুয়াল্লিশে পা দিয়েছে বাসন্তী। তাঁর বড় ছেলের বয়সই এখন ছাব্বিশ। কিন্তু মার ধমকাবার ধরন দেখ। বাসন্তী যেন এখনও তের চোদ্দ বছরের সেই ছোট্ট মেয়েটি রয়ে গেছেন। অসময়ে বিছানা থেকে উঠে এসেছেন বলে মা ফের তাই ধমকে শুতে পাঠাচ্ছেন ঘরে। না, সেই ছোট্টটি তিনি আর নেই। অনেক বয়স হয়ে গেছে। যতটা না বয়স হয়েছে তার চেয়ে বেশি বুড়ো দেখায়। এমনকি স্বামী অবনীমোহন পর্যন্ত সেই খোঁটা দেন। কিন্তু শুধু মার কাছে দাঁড়ালেই, মার সামনে দাঁড়ালেই নিজের বয়সের কথা আর মনে থাকে না। মনে হয় সেই ছোট্টটিই আছেন।

মার কথার জবাবে বাসন্তী বললেন, 'না উঠলে চলবে কেন মা; কত কাজ পড়ে রয়েছে। ঝি আসছে না ক'দিন ধরে। একরাশ বাসন পড়ে আছে কলতলায়।'

ভুবনময়ী চেঁচিয়ে উঠলেন. 'বাসন পড়ে রয়েছে তার তুই কি করবি রোগা শরীর নিয়ে তুই বুঝি মাজতে বসবি সারা গুষ্টীর এই এঁটে বাসন। কেন বাড়িতে আর লোক নেই? আর কেউ না থাকে তোর নিজের মেয়েগুলিতো আছে। তাদের ডেকে দে।. তারা এসে বসুক বাসন মাজতে। মেয়েগুলিকে ডাক, মেয়েগুলিকে ডাক তাদের আর বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াস নে। আহ্লাদ দিয়ে দিয়ে পরকাল নষ্ট করিসনে তাদের।'

বাসন্তী মৃদু হাসলেন, এখনো তাঁকে বেশ সুন্দর দেখায় হাসলে রঙ তেমন ফর্সা নয়, কিন্তু মুখের গড়নটুকু বেশ মিষ্টি। রোগে ভুগে ভুগে আর বেশি সন্তান হয়ে হয়ে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়েছে চোয়ালের আর চিবুকের হাড়গুলি দেখা যায়। তবু কিসের একটু লাবণ্য যেন একেবারে যাই যাই করেও যায়নি। বাসন্তী মার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'আমি যেন আমার মেয়েদের আহ্লাদ দিচ্ছি মা। আর তুমি তোমার মেয়েকে কি করেছ। তুমি তোমার মেয়েকে কিভাবে বড় ক'রে তুলেছ। সেই তুলনায় আমি ওদের কি করি, কতটুকু করতে পারি। তোমার নাতি-নাতনীরা বলে কি জানো, তুমি শুধু আমাকেই ভালোবাস, ওদের বাস না।' বলে বাসন্তী ফের একটু হাসলেন। কিন্তু ভুবনময়ী হাসলেন না খানিকক্ষণ মুখ গম্ভীর করে রইলেন। তারপর রূঢ় কণ্ঠে বললেন, 'কেবল ওদের কেন, তোমারও সেই ধারণা। তা অমার জানতে বাকি নেই বাছা, ভালবাসিইতো না। কেন বাসব। মেয়ের পেটের ছেলেমেয়ে। তারা আমার কে? তাদের ভালোবাসলে আমার কোন্ গুণ দেবে। দূরে দূরে চোখের আড়ালে থাকলে ছ' মাস বছরেও তো একবার দেখা সাক্ষাৎ হোত না। নেহাৎই কাছে আছি,

কাছে রেখেছি, তাই ভোরে উঠেই মুখ দেখতে হয়।' ভুবনময়ী এর পর গলার স্বর বদলালেন 'আমি ভালোবাসিনে ওদের, এ কথা তুই বললি। পেটের মেয়ে হয়ে এই খোঁটা তুই দিলি আমাকে। যাদের জন্যে দিনরাত আমার এক ফোঁটা অবসর নেই, মুখে ভাত নেই, চোখে ঘুম নেই, তাদের নাকি আমি ভালোবাসিনে, তাদের নাকি আমি দেখতে পারিনে'। ভগবান তুমিই শোন, তুমিই শোন।'

ভুবনময়ীর আক্ষেপোক্তি উচ্চ থেকে উচ্চতর হতে লাগল। এঘরে ওঘরে বাড়ির সবাই জেগে উঠল। কেউ কেউ মুখ বাড়াল জানালা দিয়ে।

বাসন্তী অপ্রতিভ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। আচ্ছা জ্বালা হয়েছে এই বুড়ো মাকে নিয়ে। এ'র সঙ্গে কথা বলাও বিপদ। বাসন্তী বা কোন ধরণে কথাটা বললেন, আর মা তার জবাবে কি শুরু করলেন দেখ। মার সামনে দাঁড়িয়ে মুহূর্তকাল আগে তার স্নেহের কথা ভেবে বাসন্তীর মন মাধুর্যে স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছিল এখন সেই মনেই বিরক্তির সীমা রইল না। ঝকমারি করেছেন বাসন্তী মার সঙ্গে কথা বলে। আর কক্ষণো কথা বলতে যাবেন না।

সিঁড়ি বেয়ে ততক্ষণে আর একটি মহিলা নিচে নেমে এসে দুজনের পাশে দাঁড়ালেন, 'কি হয়েছে মা?'

মেয়ে নয়, ছেলের বউ। পরের মেয়ে, তবু তার মুখের মাতৃ সম্বোধনে [illegible] কানে এই মুহূর্তে নিজের মেয়ের মা ডাকের চাইতেও বেশি মধুর লাগল। তিনি মুখ তুলে নালিশের ভঙ্গিতে বললেন, 'শোন, তোমার ননদ কি বলছে। আমি নাকি ওর ছেলেমেয়েদের ভালোবাসিনে, শুধু তোমার ছেলেমেয়েদেরই সোহাগ আদর করি।'

বাসন্তী প্রতিবাদ করে উঠলেন, 'ওকথা আবার আমি কখন বললাম মা। সকাল বেলা তুমি কেন কতগুলি মিথ্যে কথা বানিয়ে বানিয়ে বললে আমার নামে। তোমার উদ্দেশ্যটা কি। তুমি কি চাও এবাড়ি ছেড়ে আমরা চলে যাই?'

কনকলতা বাথরুমের দিকে এগুচ্ছিলেন, ননদের কথায় এবার ফিরে দাঁড়ালেন, তারপর অনুত্তেজ আর অনুচ্চ গলায় বললেন, 'যাওয়া যাওয়ির কি হোল ঠাকুরঝি। অবনীবাবু তো এ বাড়িতে ঘরজামাই হয়ে নেই যে, পান থেকে চুন খসলেই তোমরা সব উঠে যাবার ভয় দেখাবে। ভাড়াটে বাড়ি। ভাড়া দিয়ে তোমরাও আছ, আমরাও আছি। সকলেরই সমান অধিকার। যাওয়ার কথা উঠল কিসে। আসল কথা তো নিজেরা ওঠা নয়, উঠে যেতে বলা। এ বাড়ির খোঁজ এনেছিলেন অবনীবাবু, বাড়িওয়ালার সঙ্গে তাঁরই খাতির বেশি। তোমরা কেন উঠবে, উঠতে হয় আমরাই উঠে যাব।'

বাসন্তী স্থির দৃষ্টিতে একটু তাকিয়ে থেকে বললেন, 'বউদি, তুমি আবার কেন এলে আমাদের কথার মধ্যে।'

কনকলতা বললেন, 'শুধু তোমাদের কথাই যদি হোত ঠাকুরঝি, তাহলে কথা বলতে আসতাম না। নিজের গায়ে না লাগলে কার বা পায়ে যায় কথা বলতে।'

ধীরে ধীরে পা ফেলে কনকলতা চৌবাচ্চার দিকে এগিয়ে গেলেন। ঠিক মুখের মত জবাব দিতে না পেরে বাসন্তী রুদ্ধ আক্রোশে একটু-কাল কনকলতার সেই গমনভঙ্গির দিকে তাকিয়ে রইলেন।

কনকলতা বাসন্তীরই সমবয়সী এবং প্রায় সমসংখ্যক সন্তানের জননী। কিন্তু কনকলতার চেহারা দেখলে মনেই হয় না যে, সত্যিই অতগুলি ছেলেমেয়ে তাঁর হয়েছে। কনকলতা যেমন সুন্দরী, তেমনি স্বাস্থ্যবতী। এখনো তাঁর গায়ে পাকা সোনার রঙ, নিটোল মুখের সুন্দর গড়ন, বড় বড় কালো চোখের কোলে কোথাও একটু কুঁচকে যায়নি, মুখের কোথাও একটু ক্ষীণতম রেখাও পড়েনি যেন। এখনো সেজেগুজে দাঁড়ালে বাড়ির যে কোন অনূঢ়া তরুণী মেয়ের সঙ্গে তিনি পাল্লা দিতে পারেন। সাজগোজের দিকে বেশ একটু ঝোঁকও রয়েছে কনকলতার। সান্ধ্য প্রসাধনে তাঁর বেশ একটু সময় যায়, সময় লাগে চুল বাঁধতে। তা পিঠ ভরা যাঁর এখনো

অত চুলের রাশ, তাঁর সময় কিছু লাগলইবা। তাছাড়া দিনের অন্য সময়েও বেশ ফিটফাট হয়ে একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে থাকতে ভালবাসেন কনকলতা। নিজের রূপ সম্বন্ধে তিনি আত্মসচেতন। রূপ আর স্বাস্থ্য যে শরীরকে একটু তোয়াজে না রাখলে থাকে না, তা তিনি জানেন। বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে রূপসী বলে তাঁর মনে অহঙ্কারও একটু আছে। কিন্তু তা খুব প্রচ্ছন্ন। কথায় বার্তায় তা সহজে ধরা পড়ে না। শুধু চালচলনে একটু একটু ফুটে বেরোয়। তা বেরোলই বা। শোভন সীমার মধ্যে রূপবতীর মনের অহঙ্কার, তার গায়ের অলঙ্কারেরই মত।

একথাটা বাসন্তীর স্বামী অবনীমোহনই বলতেন। এখনো বলেন, অবশ্য অন্য ভাষায় বলেন। বেশি সন্তান হলেই যে সকলের স্বাস্থ্য ভাঙে না, তার চাক্ষুষ দৃষ্টান্ত হিসাবে মাঝে মাঝে কনকলতার কথাটা ওঠে তাঁদের মধ্যে। আর এই তুলনাটা বাসন্তীর ভালো লাগে না। বউদির ওপর স্বামীর যে বেশ একটু পক্ষপাতিত্ব আছে, তা বাসন্তী ভালো করেই জানেন। এর জন্যে আগে আগে যেমন খোঁচা লাগত, খটকা লাগত, এখন আর তা লাগে না। অবনীমোহন দেবচরিত্রের মানুষ। তাঁর আচার আচরণে কেউ কোনদিন অশোভনতার অপবাদ দেয়নি। আরো অনেকের মত একথা বাসন্তীও জানেন। তবু কনকলতার সঙ্গে তাঁর স্বাস্থ্যের তুলনায় বাসন্তীর মন এখনো অপ্রসন্ন হয়। এই তুলনা আর যে দেয় দিক অবনী-মোহনের দেওয়াতো উচিত নয়। তিনি কি জানেন না বাসন্তীর স্বাস্থ্যভঙ্গের মূল অবনীমোহন নিজে। তিনি কি জানেন না, শুধু সন্তানাধিক্যই নয়, স্বামীর মহানুভবতার আধিক্যই বাসন্তীকে এমন অকালে জীর্ণ করে ফেলেছে। কিন্তু একথা কোনদিন অবনীমোহন স্বীকার করবেন না।

এঁটো বাসনের পাঁজার পাশ ঘেষে ছোঁয়া বাঁচিয়ে কনকলতা কলের জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে চোখমুখ ধুয়ে নিলেন। আঁচল দিয়ে [illegible]

মুছলেন না সঙ্গে সঙ্গে। মুখের এখানে ওখানে বিন্দু বিন্দু জল লেগে রইল। ফুটন্ত পদ্মে যেন ফোঁটা ফোঁটা শিশির।

এ উপমাও অবনীমোহনেরই দেওয়া। অনেককাল আগে তরুণ বয়সে কাব্য সাহিত্যের বড় ভক্ত ছিলেন অবনীমোহন। তখনকার কথা। এখন অবশ্য জলের ফোঁটা বউদির মুখে আর তেমন করে মানায় না। অন্তত বাসন্তীর তো তাই মনে হয়। কিন্তু বউদি অনেক স্নেহ মমতা উপকারের কথা ভুললেও এই উপমাটুকুর কথা সযত্নে মনের মধ্যে যেন গেঁথে রেখেছে। ঝি না আসায় কনক-লতাদেরও বাসনের স্তূপ পড়ে রয়েছে এক পাশে। কিন্তু তিনি দিব্যি পাশ কাটিয়ে চলে এলেন। সহজে তিনি হাত দেবেন না এঁটো বাসনে। মেয়েরা মাজবে। নেহাৎই যদি ওরা কেউ কোন একটা ব্যবস্থা না করে, নিজে এসে বসবেন তখন।

বাসন্তী আর দেরি করলেন না। এগিয়ে গিয়ে বসলেন নিজের পাঁজার কাছে। কাজে হাত লাগালেন।

ভুবনময়ী মেয়ে আর ছেলের বউয়ের কথা কাটাকাটিতে এতক্ষণ হতবাক হয়েছিলেন। কনকলতার কাছে বাসন্তীর নামে অমন একটা মিথ্যে কথা বলে ফেলে তিনি নিজেও বড় কম অপ্রতিভ হননি। কেন বললেন। ওকথা বলা তো তাঁর ইচ্ছে ছিল না। আজকাল ছেলেমেয়ে নাতিনাতনীগুলির মত নিজের জিভটাও যেন আর নিজের শাসন মানে না। ফস করে এক একটা কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়। আর তাই নিয়ে কুরুক্ষেত্র বাঁধে। ওরা বোঝে না যে, বুড়ো মানুষের মুখের কথাটাই সব কথা নয়। তা ধরতে নেই।

কিন্তু জেদী মেয়ের কাণ্ড দেখ। শরীর খারাপ তবু গিয়ে বসল এঁটো বাসনগুলি নিয়ে। মেয়েকে ধমক দিলেন, 'আচ্ছা বাসি, এত বয়স হোল, বুড়ো হতে চললি, এখনো তোর একগুঁয়েমী গেল না। এখনো সেই কচিখুকীটি আছিস নাকি তুই? বললুম যে দরকার নেই তোর আজ বাসন মেজে। তবু তুই কথা শুনবিনে। তোর

মত জেদী আর দুটি দেখিনি দুনিয়ায়। সরে আয় বলছি।'
বাসন্তী দ্রুত হাতে কাজ করতে করতে বললেন, 'সরে এলে চলবে না মা। তুমি মিছামিছি বকবক না ক'রে নিজের কাজে যাও।'
মেয়ের রূঢ় কথায় ভুবনময়ী এবার রাগ করলেন না। খানিকক্ষণ আগের অপরাধের কথা তাঁর মনে আছে।
তিনি এবার কোমল সুরে অনুরোধের ভঙ্গিতে বললেন, 'লক্ষ্মীটি, উঠে আয়, আমার কথা শোন। আজ না নান্তু আসবে বাড়িতে। ওর গাড়িতো সকালের দিকেই। এসে যদি দেখে তুই এই বাসনের রাশ নিয়ে বসেছিস তাহলে আর রক্ষে রাখবে না।'
প্রবাসী ছেলের বাড়ি আসবার প্রসঙ্গে বাসন্তীর মনটা মুহূর্তের জন্য প্রসন্ন হয়ে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ল কি অবস্থায় ছেলে বাড়ি ফিরছে। মার দিকে তাকিয়ে বাসন্তী বললেন, 'না রক্ষে রাখবে না। ছেলে আমার সব দুঃখ দূর করবে বলেই তো চাকরি বাকরি সব খুইয়ে বাড়িতে এসে বসছে। কে যে আমাকে কতখানি রাজা করবে, তা আমার জানা আছে।'
প্রায় দুশো টাকা মাইনের ভালো সরকারী চাকরিটা নান্তুর চলে গেছে। তা নিয়ে ভুবনময়ীর নিজের মনেও আফসোস কম নেই। তবু সান্ত্বনার সুরে মেয়েকে বললেন, 'আহা, পুরুষ ছেলের চাকরি কখনো হয়, কখনো যায়, তাই বলে কি ঘরের ছেলে ঘরে আসবে না? এ তোর বড় অন্যায় কথা বাসি।'
বাসন্তী বললেন, 'আর ঘর কোথায়? কোন ঘরে কি এক ফোঁটা জায়গা আছে যে মাথা গুঁজবে? চিলে কোঠার ওই খুপরিটুকুর মধ্যে সে থাকত, সেখানেও তো—'
বলে বাসন্তী হঠাৎ থেমে গেলেন। সেখানে কনকলতার জামাই সুবিমল আছে ক'মাস ধরে। তারও চাকরি নেই। এখানে থেকে চাকরি বাকরির চেষ্টা করছে।
কিন্তু কথাটা বাসন্তী চাপতে চাইলেও কনকলতা চাপতে দিলেন না।

মুখ ধুয়ে দোতলায় উঠে যাচ্ছিলেন, ফের কয়েক সিঁড়ি নিচে নেমে এলেন। তারপর ননদ আর শাশুড়ীর দিকে তাকিয়ে তেমনি শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'সেখানা সুবিমল বেদখল করেছে এই তো ঠাকুরঝি। কিন্তু ছেলে বাড়ি আসবার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের ঘর তোমরা ফিরে পেলেই তো হোল। সেজন্য ভাবনা নেই তোমার। আমি তো প্রথম যেতেই দিতে চাইনি সুবিমলকে ওঘরে। আমি আগেই বলেছিলুম ওটা নান্তুর 'পড়া' ঘর, ছুটি ছাটায় এসে থাকে। ওঘরে কাউকে ঢুকতে দেখলে তার সহ্য হয় না, ওঘরে গিয়ে কাজ নেই সুবিমলের। আছে জামাই আছে, তবু সে নিচের ঘরে চাকরবাকরদের সঙ্গেই থাকুক। কি করবে। তার শ্বশুরের যেমন সাধ্য। তার বেশিতো আর কিছু করবার জো নেই। কিন্তু অবনীবাবুই তো তা হতে দিলেন না। তিনিই তো তখন ভালোমানুষিতা দেখিয়ে নিজে সব ব্যবস্থা করলেন।'

সিঁড়িতে এবার একটি পুরুষের গলা শোনা গেল। 'কি বিষয়টা কি। সকাল থেকে সকলে মিলে সেই যে বক বক শুরু করেছ, হয়েছে কি তোমাদের। ঘাড় ফিরিয়ে স্বামীকে দেখে নিয়ে মাথার আঁচলটা আর একটু টেনে সরে দাঁড়ালেন কনকলতা। বৈদ্যনাথ দ্রুত নিচে নেমে এলেন। পরনে নীল রঙের লুঙ্গি। খোলা গা। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স। রূপবান নয়, তবে স্বাস্থ্যবান পুরুষ। বেঁটে খাটো আঁটসাঁট গড়ন। এখনো বেশ শক্তসমর্থ চেহারা। এক হাতে ছোট্ট একটা হাতুড়ি।

নেমে এসে বোনের দিকে তাকিয়ে বৈদ্যনাথ জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হয়েছে রে বাসন্তী?'

বাসন্তী বললেন, 'কিছু হয়নি দাদা'।

কনকলতা বললেন, 'হবে না কেন অনেক কথা হয়েছে। [illegible] এখনি চিলে কোঠা ছেড়ে দিতে বলো। সে আজই কোন মেসে টেমে চলে যাক।'

বৈদ্যনাথ বললেন, 'কেন মেসে যাওয়ার কি হয়েছে। মেসে যাবে খাবে কি। চাকরি নেই বাকরি নেই, খরচ চালাবে কি করে।'

কনকলতা বললেন, 'সে কথা তো আর অন্য মানুষে বুঝতে আসবে না। তুমি আজই সুবিমলকে উঠে যেতে বলো। নান্তুর ঘর যেন ও এখনই ছেড়ে দেয়। আর যে কয় মাস জামাইকে পরের ঘরে রেখেছ, তার জন্যে ভাড়াটা হিসেব ক'রে গুণে দিয়ো। খাই না খাই, আমি কারো অনুগ্রহ নিতে চাইনে।' বলে কনকলতা তরতর করে উঠে গেলেন সিঁড়ি বেয়ে।

বৈদ্যনাথ গম্ভীরভাবে বললেন, 'হুঁ।' তারপর বৈঠকখানা ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

ভুবনময়ী বাধা দিয়ে বললেন, 'উঠেই ওদিকে আবার কোথায় যাচ্ছিস বৈদ্য।' বৈদ্যনাথ বললেন, 'ঘড়িটা ঠিক করতে হবে। রাত থেকে আবার বেয়াড়াভাবে বাজতে শুরু করেছে।'

ভুবনময়ী বললেন, 'তা করে করুক। ও ঘড়িতে তোমার আর হাত দিয়ে কাজ নেই বাপু।'

বৈদ্যনাথ চটে উঠে বললেন, 'কেন, আমার ঘড়িতে আমি হাত দেব, তাতে তোমার কোন্ মহাভারত অশুদ্ধ হবে শুনি?'

ভুবনময়ী অপ্রসন্ন কণ্ঠে বললেন, 'মহাভারত অশুদ্ধ হবে না, কিন্তু ঘড়িটা যাবে। যাবে কি গেছে। তুমিই ওটাকে নষ্ট করেছ। তোমার কেরামতি মেরামতিতে ও ঘড়ির যেটুকু আছে সেটুকুও আর থাকবে না।'

বৈদ্যনাথ গলা চড়িয়ে বললেন, 'বেশ, না থাকে না থাকবে। আমার জিনিস আমি নষ্ট করি, কি যা খুশি তাই করি, তা তোমার দেখতে আসবার দরকার নেই মা। সব সময় বক বক না করে একটু চুপ করে থাকতো।'

ভুবনময়ীও তিড়বিড় করে উঠলেন, 'কেন, চুপ করে থাকবার কি হয়েছে শুনি? কেন চুপ ক'রে থাকব? কার ভয়ে চুপ করে থাকব?

তোমার ভয়ে? তুমি দু'টি খেতে পারতে দিচ্ছ সেই জন্যে। দিওনা খেতে। তোমাকে তো আমি হাজার বার বলেছি, খেতে তুমি আমাকে দিও না। তুমি ছাড়া আমার আরো গতি আছে।'

বৈদ্যনাথ তিক্তস্বরে বললেন, 'তা তো আছেই। সেই আশা আছে বলেই তো তোমার গলায় এখনো এত জোর আছে। সেই আস্কারা পেয়েই তো তোমার চেঁচানি কমছে না। একটু কিছু হ'তে না হ'তেই চেঁচিয়ে একেবারে বাড়ি মাথায় করে তুলছ।'

ইঙ্গিতটা অত্যন্ত স্পষ্ট। অন্তত বাসন্তীর তা বুঝতে কিছু মাত্র অসুবিধা হোল না। বাসন মাজতে মাজতে তিনি ফের মুখ ফেরালেন 'নিজেরা মায় পোয়ে যত খুশি ঝগড়া করো দাদা, কিন্তু মিছিমিছি অন্য মানুষকে দুষতে যেয়ো না। কেউ কাউকে আস্কারা দেয়নি, দেবেও না, বিনা আস্কারাতেই এই। এরপর আস্কারা দিলে কি আর রক্ষে ছিল।'

বৈদ্যনাথ বললেন, 'তোর আবার কি হোল বাসি? তোর গায়ে আবার কোত্থেকে কোন্ ফোস্কা পড়ল।'

বাসন্তী বললেন, 'চামড়ার গা হলেই তাতে ফোস্কা পড়ে দাদা। মাটি কি পাথর দিয়ে তৈরি হলে ফোস্কা পড়ার কোন বালাই থাকে না। তাতে সব সয়। রক্ত মাংস দিয়ে তৈরি না করে বিধাতা যদি কাঠ কি পাথর দিয়ে আমাকে তৈরি করতেন, তাহ'লেই তোমাদের সকলের পক্ষে সুবিধে ছিল।'

সামনের চৌবাচ্চায় মগ ডুববার একটু শব্দ হ'তেই বাসন্তী চোখ ফিরিয়ে তাকালেন। অবনীমোহন নিঃশব্দে দোতলার ঘর থেকে কখন নেমে এসেছেন। উঠান পেরিয়ে কখন এসে চৌবাচ্চা থেকে জল নিয়েছেন মগে, কেউ টেরও পায়নি। মুখ দিয়ে সহজে তো কোন কথাই বেরোয় না অবনীমোহনের, চলাফেরাটাও যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে সারেন। একটু আগে মাটি কি পাথরে গড়া মানুষের কথা বলছিলেন বাসন্তী। স্বামীর সম্বন্ধে তাঁর সেই কথাই মনে হয়।

একেবারে পাথরের মানুষ। কালো পাথরের নয়, রঙীন পাথরের। পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে বয়স। কিন্তু স্নিগ্ধ মসৃণ গৌর বর্ণ এখনো তেমন ম্লান হয়নি। দীর্ঘ সুন্দর চেহারা, সবল আর তেমন বলা চলে না, স্বাস্থ্যবানও নয়। দেহে ভাঙন ধরেছে অবনীমোহনের। কপালের ত্রিবলী একটু যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কানের কাছে পাক ধরেছে চুলে। তবু তাঁর রূপ চোখে পড়ে। এ রূপ কনকলতার মত যত্ন করে রাখা নয়, প্রসাধনে মার্জিত নয়, অবহেলায় অনাদৃত।
বাথরুমের দিকে যাওয়ার আগে অবনীমোহন একবার সকলের মুখের দিকে তাকালেন। তাঁকে দেখে সকলেই মুহূর্তের জন্যে কথা থামিয়েছে। অবশ্য এই থামাই থামা নয়। অবনীমোহন তা জানেন। আজকাল অতখানি শ্রদ্ধা সমীহ তিনি আর দাবী করেন না। তিনি বাথরুমে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে এরা আবার কলহ শুরু করবে। তারপর শ্রান্ত হয়ে কিংবা দৈনন্দিন কাজের তাগিদে আপনিই সবাই থেমে যাবে। তার আগে ধমক দিলে শুনবে না, অনুরোধ করলে শুনবে না। তাতে কিছু লাভ নেই।
অবনীমোহন জলের মগ হাতে এগিয়ে গেলেন সামনের দিকে। পিছনে ঝগড়া চলতে লাগল।
বোনের কথার জবাবে বৈদ্যনাথ বললেন, 'থাক, থাক, আর মাটি পাথরের কথা তুলিস নে। কে যে কোন্ ধাতু দিয়ে তৈরি, কার যে কতখানি ধৈর্য স্থৈর্য, তা আমার আর জানতে বাকি নেই। চিনতে আর কাউকে বাকি নেই আমার।'
বাসন্তী কোন জবাব দিলেন না
ভুবনময়ী আগের কথার জের টেনে বলতে লাগলেন, 'কেবল আমার যা খুশি তাই করব, আমার জিনিস আমি নষ্ট করব। দিনরাত কেবল এই বুলি। কপালপোড়া, নষ্টই তো করলি জীবন ভরে। ভেঙে ফেলা ছাড়া, গড়তে পারলি কোন্‌টা। রাখতে পারলি তাঁর হাতের কোন জিনিস। একটা একটা করে নিজের খেয়ালে সবই তো খোয়ালি।

টাকা গেল পয়সা গেল, বিষয়-আশয় গেল শেষে আমার যে ক'খানা গয়না ছিল তাও রইল না। নষ্ট করা ছাড়া তুই আর কি করতে পারলি জীবনে।'

অভিযোগগুলি সত্য। তাই বৈদ্যনাথ মুহূর্তকালের জন্যে একটু চুপ করে রইলেন। ছেলে মেয়ে ভাগ্নে ভাগ্নীরা ততক্ষণে প্রায় সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে তাঁদের এই বচসা শুনছে লক্ষ্য করে নিজের ছোট ছেলে বিনুকে এক প্রচণ্ড ধমক দিলেন বৈদ্যনাথ, 'যা হাত মুখ ধুয়ে পড়তে বসগে যা। কি দেখছিস, কি শুনছিস হাঁ করে। যা ভাবছিস তা নয়। তোদের বাবা মদ খেয়ে বদমাশি করে রেস খেলে তার বাবার একটা পয়সাও ওড়ায়নি। সৎপথে ব্যবসা করতে গিয়েই সব খুইয়েছে। আর খুইয়েছে বলে তার মনে বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই।'

হঠাৎ ঘড়ি সারবার কাজের কথাটা ফের মনে পড়ে গেল বৈদ্যনাথের। তিনি আর দেরি না করে বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

বৈঠকখানা অবশ্য নামেই বৈঠকখানা। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের বাইরের ঘর। ভিতরে যাদের স্থান সঙ্কুলান হয়নি তাদেরই কেউ কেউ এসে উপচে পড়েছে এ ঘরে। তাই চেয়ার টেবিল কৌচ সোফায় না সাজিয়ে সস্তা দামের দু'খানা বড় বড় তক্তপোশ জুড়ে তাদের থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ছেলেদের মধ্যে যারা বড় হয়েছে, মা ঠাকুরমার গণ্ডি পেরিয়ে এসে তারা এঘরে স্থান নেয়। অতিথি-অভ্যাগত কেউ এলেও অপেক্ষাকৃত একটু ভালো বিছানা বালিশের ব্যবস্থা করে এই ঘরেই তাদের অভ্যর্থনা করা হয়, দিনের বেলায় ছেলেরা কেউ কেউ পড়ে। কিন্তু এখন তক্তপোশ খালি। সবাই বিছানা গুটিয়ে উঠে গেছে। শুধু বাঁ কাৎ হয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে অতুল। অবনীমোহনের মেজো ছেলে। তেইশ চব্বিশ বছরের জোয়ান। স্বাস্থ্যবান চেহারা। গায়ের রঙ কালো হোলেও নাক চোখের গড়ন হোল সুন্দর।

বৈদ্যনাথ তার পাশ দিয়ে পা টিপে টিপে ঘড়ি সারবার জন্যে উঠে

দাঁড়ালেন। ঘুমন্ত ভাগ্নের একখানা হাত পায়ের ওপর এসে পড়ল। তা পড়ুক। নেহাৎ বিজয়া দশমীর দিন ছাড়া সজ্ঞানে জাগ্রত অবস্থায় তো ভাগ্নেরা পায়ে হাত বড় একটা দেয় না। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যদি দেয় তো দিক। তাও কত বেলা অবধি ঘুমুচ্ছে। ঘুমুবে না? সারারাত বাইরে বাইরে কাটিয়ে এসেছে। কোথায় কালীকীর্তনের নাকি একটা দল আছে পাড়ায় সেখানে গিয়ে জুটেছে। কি করে আর কি না করে ভগবানই জানেন। একেবারে বয়ে গেছে ছোঁড়া। লেখা-পড়া কিচ্ছু হোল না। টেনে মেনে ফার্স্ট ক্লাস অবধি উঠেছিল। পর পর বছর দুই ফেল করে পড়া ছেড়ে দিয়েছে। পাড়া ভরে শহর ভরে হৈ চৈ মারামারি করে বেড়ান ছাড়া এখন আর ওর কোন কাজ নেই। বছরের পর বছর একইভাবে কাটছে। আশ্চর্য বাপ। অবনী বলেই তার ছেলে এমন হ'তে পেরেছে। বৈদ্যনাথের কোন ছেলে এমন বিগড়ে গেলে তিনি তাকে চাবকে সোজা করতেন। তাতেও যদি না শোধরাত বাড়ি থেকে বের করে দিতেন, দেখতেন কেমন না শোধরায়। ঢং করে একটা শব্দ হোল ঘড়ির। কিন্তু বাজে ঠিক কাঁটায় কাঁটায় ছ'টা। 'দাঁড়াও তোমাকে বাজাচ্ছি।' মনে মনে বললেন বৈদ্যনাথ। তারপর ওপরের ডায়ালটা খুলে ফেললেন।

আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সদর দরজার কাছে ঠুন্ ঠুন্ করে রিকসার শব্দ হোল। সেই সঙ্গে ছোট ছেলেমেয়েদের একযোগে কলস্বর শোনা গেল 'নান্তুদা এসেছে, নান্তুদা এসেছে।'

বৈদ্যনাথ নিজের জায়গা ছেড়ে বিন্দুমাত্র নড়লেন না। দুই বুড়ো আঙুলের ওপর ভর করে যেমন ঘড়ির কলকব্জাগুলি পরীক্ষা করছিলেন, তেমনি করে যেতে লাগলেন।

কিন্তু বাড়ির আর সবাই বৈঠকখানার দোরের কাছে এসে ভিড় করে দাঁড়াল। ঘরখানা ভরে গেল লোকে। সবাইকে ধরলও না। সব চেয়ে পিছনে এসে দাঁড়ালেন ছাই মাটিতে হাতমাখা বাসন্তী। মুখে অপূর্ব স্নিগ্ধ বাৎসল্যের হাসি। এই মুহূর্তে তিনি ভুলে গেছেন

ছেলে বেকার হয়ে এসেছে। প্রবাসী ছেলে ঘরে ফিরে এসেছে এখনকার মত এই তো ঢের।

রিকসাওয়ালাকে ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে অরুণ এসে দোরের সামনে দাঁড়ালো। তার জিনিসপত্রগুলো নিয়ে ছোট ভাইদের মধ্যে ততক্ষণে কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে। কেউ ধরেছে হোল্ড-অলটা, কেউ সুটকেস, কেউ ট্রাঙ্কটা নিয়ে টানাটানি করছে। মামাত ভাই বিজু থার্ড ইয়ারে পড়ে। আর কেউ পারছে না দেখে সে নিজে এসে তুলে নিয়ে গেল ট্রাঙ্কটা। নিজের জিনিসপত্রে অন্য কেউ হাত দেয় অরুণ তা একটা বড় পছন্দ করে না। ছেলেপুলেদের কলরবও তার খুব সহনীয় নয় কিন্তু আজকের দিন আলাদা, আজকের ধরনটা আলাদা। হাসিমুখে নিজের জিনিস আর ভাইবোনগুলির দিকে তাকিয়ে সে ভিতরে ঢুকতে গেল। আর ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গেই চৌকাঠে ঠুকে গেল মাথাটা।

ভুবনময়ী বলে উঠলেন, 'আহাহা, ষাট ষাট। দিল্লীর জল বাতাসে তুই কি আরো লম্বা হয়ে গেলি নাকি নান্তু? গায়ে পায়ে তো কিছু বাড়েনি।'

অরুণ দিদিমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল, 'এর চেয়ে আর কি বাড়বে দিদা? তাহলে তো তোমাদের দরজা দিয়ে একেবারেই ঢুকতে পারতাম না। বাইরে থেকেই বিদায় নিতে হোত।'

ভুবনময়ী বললেন, 'ঈস কথার ছিরি দেখ ছেলের। যা একখানা তালপাতার সেপাইর মত চেহারা তাই নিয়ে আবার বড়াই।'

কথাটা ঠিক। দৈর্ঘ্যের তুলনায় অরুণের প্রস্থের স্বল্পতাটা চোখে পড়ে। ওকে ঠিক সুপুরুষ বলা যায় না, স্বাস্থ্যবান পুরুষ তো নয়ই। তবু ওর নিজস্ব একটা শ্রী আছে। শুধু নাকটাই তীক্ষ্ম নয়, চোখ দুটিও ধারাল। বিদ্যে-বুদ্ধির ছাপটা বেশ ধরা যায়। চওড়া কপাল, পাৎলা ঠোঁট, ছোট্ট চিবুকে একটু আত্মম্ভরিতাও আঁচ করা কঠিন হয় না।

দিদিমাকে প্রণাম সেরে নিচু হয়ে অরুণ মামীমার পায়ে দুটি আঙুল ছোঁয়াল কি ছোঁয়াল না, তারপর মাথা তুলে সোজা তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন আছ রাঙা মামী?'

কনকলতা বললেন, 'তোর মামী ক'টা রে নান্তু যে রাঙা মামী বলছিস? ফাজিল ছেলে।'

অরুণ বলল, 'বাঃ, যা টুকটুকে তোমার রঙ, রাঙা কথাটাই সবচেয়ে আগে মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ে।'

লজ্জিত হলেন কনকলতা। লঘু গুরু জ্ঞান নেই অরুণের। বাইরের চাকরিতে গিয়ে ফিচলেমিটা আরো বেড়েছে। কনকলতা বললেন, 'তোর বাবার গায়ে তো রঙ নেহাৎ কম নেই তাহলে তাঁকেও তো—' হঠাৎ বাবার কথাটা মনে পড়ায় অরুণের মুখে কিসের একটা ছায়া পড়ল। ঘরের চারদিকে তাকিয়ে একবার দেখে নিল। না, তাঁকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। তিনি আসেননি। তিনি নামেননি নিচে। যে কথাটা অরুণ এতক্ষণ ভুলে ছিল, সেই কথা ফের মনে পড়ল। তাঁর চাকরি গেছে। যুদ্ধের সময়কার ডি জি এম পি অফিসে চাকরি। একেবারে শেষের দিকে জুটেছিল। কলকাতার অফিস উঠে গিয়েছিল দিল্লীতে। তারপর ভারত স্বাধীন হবার বছর খানেক যেতে না যেতেই ভারত গভর্ণমেণ্ট তাকেও সম্পূর্ণ স্বাধীন করে দিয়েছেন। আরও অনেক সহকর্মীদের সংগে সেও পড়েছে ছাঁটাইতে। এ চাকরি যে একান্ত অস্থায়ী বাবা তা জানতেন, ছাঁটাইয়ের কথাটাও অনেকদিন ধরে চলছিল। আঘাতটা একেবারে অপ্রত্যাশিত নয়, তবু আঘাত তো বটে। আর তাঁরই সব চেয়ে বেশি লাগবার কথা। কারণ ভুগতে তাঁকেই হবে, বিপুল পরিবারের ভার তাঁর কাঁধেই পড়বে এবার থেকে। অরুণ সবই বুঝতে পারছে। তবু একবার তিনি এলেও তো পারতেন। মনটা কেমন যেন অপ্রসন্ন হয়ে রইল অরুণের। একটু এগিয়ে গিয়ে নিচু হয়ে মাকে প্রণাম

করে তাঁর দিকে তাকাল। বাসন্তীও তাকালেন ছেলের দিকে, ‘কেমন আছিস?’

অরুণ সংক্ষেপে বলল, ‘ভালো।’

হঠাৎ চোখে পড়ল, তক্তপোশের ওপর দাঁড়িয়ে মামা কি ঠুক ঠুক করছেন। এগিয়ে এসে পা-টা আলগোছে একটু ছুঁয়ে বলল, ‘ও করছেন কি?’

বৈদ্যনাথ ঘাড় থেকে মুখ ফিরিয়ে ভাগ্নের মুখের দিকে তাকালেন, ‘এই যে ভালো আছিস? গাড়ি কি লেট ছিল?’

অরুণ বলল, ‘সামান্য। করছেন কি ওখানে?’

বৈদ্যনাথ বললেন, ‘ঘড়িটা সারছি। দিন কয়েক হোল ফের বিকল হয়েছে। ঠিক টাইম দিচ্ছে না।’

অরুণ হাসি চেপে বলল, ‘দেখুন চেষ্টা করে।’

প্রায় জন্মাবধি এই ঘড়ি মামাকে সারাতে দেখে আসছে অরুণ। নিজের মনেই ফের একটু হাসল। ও ঘড়ি আর সেরেছে।

ভিতরের দিকে আরো খানিকটা এগুতেই শ্যামবর্ণা আঠার উনিশ বছরের একটি তরুণী মেয়ে অরুণের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল, ‘কি নান্তুদা, আমাকে যে চিনতেই পারছ না, রাজধানী থেকে এসে গরীবের দিকে বুঝি আর নজরই পড়ছে না?’

মামাত বোন অণিমা।

অরুণ বলল, ‘চোখে পড়লেই কি আর চিনতে পারব? সিঁথিতে সিঁদুর টিঁদুর লেপে তুই তো একেবারে [illegible] কাজী সেজেছিস।’

অণিমা লজ্জিত হয়ে বলল, ‘আহা!’

তার পাশে প্রায় তারই সমবয়সী আরো একটি মেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। ফর্সা সুন্দর চেহারা। অরুণের নিজের বোন। তার বিয়ে হয়নি। ম্যাট্রিক পাশ করে ঘরে বসে আছে। অরুণ বাবাকে লিখেছিল কলেজে ভর্তি করে দিতে। তিনি জবাব দিয়েছিলেন তাঁর

সাধ্য নেই। অরুণের মনে হয়েছে শুধু সাধ্যের কথাই নয়, বাবার আর ইচ্ছেও নেই ওকে পড়াবার।

অরুণ বোনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি রে অমন মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে রয়েছিস যে? বিয়ে হয়নি বলে? কলেজে ভর্তি হতে পারিসনি বলে না কি আমার চাকরি গেছে সেই দুঃখে?'

প্রীতি বলল, 'তা ছাড়া আর বুঝি কোন কারণ থাকতে নেই দাদা?'

অরুণ বলল, 'আর আবার কি কারণ থাকবে? তবে কি প্রেমে ট্রেমে পড়লি না কি?'

হেসে উঠল অরুণ। হাসতে হাসতে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগল। দোতলার সিঁড়ির ডাইনে বামে তিনখানা ঘর। একখানায় সপরিবারে থাকেন বৈদ্যনাথ। আর পাশাপাশি দুখানায় থাকেন অবনীমোহন আর তাঁর মেজো ভাই মৃগাঙ্কমোহন। একটু ইতস্তত করে কাকার ঘরেই আগে ঢুকল অরুণ।

গৃহিণী গৃহমুচ্যতে এ কথার আর একবার প্রমাণ পাওয়া যায় মৃগাঙ্কের ঘরে এলে। ঘর আর ঘরণী একাত্ম না হোক্ ঘর যে ঘরণীরই প্রতিচ্ছায়া তার শিক্ষা দীক্ষা রুচির ছাপে চিহ্নিত একথা মৃগাঙ্ক আর সুরমার ঘর দেখে বিশেষভাবেই মনে পড়ে।

বাড়ির বৌ-ঝিদের মধ্যে রূপ সুরমার সবচেয়ে কম। দেখতে কালো ছিপছিপে লম্বা। দেহের গঠনও এমন কিছু সৌন্দর্যব্যঞ্জক নয়। কিন্তু বিদ্যা সবচেয়ে বেশি। আই এ পাশ করে বি এ-তে ভর্তি হয়েছিল তখন সুরমার বিয়ে হয়ে যায়। বিয়ের পরও পরীক্ষার জন্যে দু' দুবার তৈরি হয়েছিল সুরমা। কিন্তু দু' দুবারই ঠিক সময় বুঝে ছেলে মেয়ে হোল পরীক্ষা দেওয়া আর হোল না। সুরমার ছেলেমেয়েরা সহজে আসেনি। ডাক্তারের সাহায্য নিয়ে পরিবারের অনেক টাকা খরচ করিয়ে মায়ের প্রাণ-সংশয় ঘটিয়ে তবে তারা ভূমিষ্ঠ হয়েছে। এক একটি হওয়ার পর অনেক ধকল গেছে সুরমার শরীরের ওপর দিয়ে। মা বলেছেন, 'ভগবান করুন, তোর

যেন আর না হয়, যারা হয়েছে তারা বেঁচে থাকুক।' কিন্তু সুরমা শুধু ভগবানের ওপরেই নির্ভর করে নেই। নিজেরাও সতর্ক হয়েছে। যে দুটি সন্তান হয়েছে তাদেরই পেলে পুষে মানুষ করা তার পক্ষে শক্ত, আর সংখ্যা বাড়িয়ে কি হবে।

কলেজের পড়া বন্ধ হলেও বাড়িতে সাধ্যমত পড়াশুনোর অভ্যাসটা রেখেছে সুরমা। মৃগাঙ্ক কাজ করে কলেজ স্ট্রীটের এক নামকরা প্রকাশক আর বই বিক্রেতার দোকানে। বই শুধু পরের কাছে বিক্রিই করে না, নিজেরও সংগ্রহ করার দিকে ঝোঁক আছে। দু' দুটি কাঁচের আলমারি ভরতি হয়ে সুরমার বই উপচে পড়েছে র‍্যাকে সেল্‌ফে। আর একটি আলমারী কিনলে ভালো হয়। কিন্তু ফার্নিচারের দাম চড়ে গেছে। টাকা সংগ্রহ করে নতুন আলমারি আর কেনা হচ্ছে না সুরমাদের।

মৃগাঙ্কের পড়াশুনোর দিকে যে তেমন ঝোঁক আছে তা নয়, বই সংগ্রহ ক'রেই খালাস। এই বইগুলি সাজিয়ে গুছিয়ে ঝেড়ে মুছে যত্ন করে রাখা সুরমার নিত্যকর্ম। সময় সময় আগ্রহের অভাবে পড়াশুনোয় ইদানীং খানিকটা ঘাটতি পড়েছে সুরমার কিন্তু বইয়ের তত্ত্বাবধানে আলস্য আসেনি। এই লাইব্রেরী যেন ওদের তৃতীয় সন্তান।

তক্তাপোশের তলায় দু' একটা ট্রাঙ্ক স্যুটকেস আর জামাকাপড় রাখবার আলনা ছাড়া গৃহস্থালীর অন্য কোন জিনিস এঘরে স্থান পায়নি। সে সব থাকে বড় জা' বাসন্তীর ঘরে। এ ঘরে আছে দু' তিনখানা চেয়ার, পড়বার টেবিল, তার ওপর সুরমার নিজের হাতের তৈরি এমব্রয়ডারি করা ঢাকনি। তাকের ওপর দুটি ফুলদানী। তাতে কখনো ফুল থাকে, কখনো থাকে না। কিন্তু ফুলদানী দুটিই এমন সুন্দর যে, দেখতে সেগুলি প্রায় বড় বড় দুটি ফুলের মত। দেয়ালে গান্ধীজী আর রবীন্দ্রনাথের মাঝারি আকারের দুখানি ফোটো।

মৃগাঙ্কদের ঘুম ভাঙে একটু দেরিতে। কিন্তু নিচের সোরগোলে অন্যদিনের চেয়ে আজ সকালেই উঠে পড়েছে ওরা।

অরুণ ঘরে ঢুকতেই তক্তাপোশ থেকে নেমে এসে দুজনে পাশাপাশি দাঁড়াল। চেহারার দিক থেকে পরস্পরের সঙ্গে আজও মৃগাঙ্ক সুরমাকে ঠিক মানায় না। চল্লিশ উৎরে গেলে কি হবে, মৃগাঙ্গকে এখনও বেশ সুন্দর স্বাস্থ্যবান যুবক বলেই মনে হয়। গায়ের রঙ ফর্সা, চোখ মুখের গড়নও মোটামুটি সুন্দর। আর সবে তিরিশ পেরোলেও বয়সের তুলনায় সুরমাকে বেশি গম্ভীর আর রাশভারি দেখায়।

কেবল আকৃতির অমিলই নয়, প্রকৃতিগত অমিলও দুজনের মধ্যে যথেষ্ট আছে মৃগাঙ্ক চঞ্চল, স্ফূর্তিবাজ, হৈ-হল্লাপ্রিয়। আর সুরমা নিরীহ, শান্ত একান্তে শান্তিতে থাকতে ভালোবাসে। কিন্তু তবু দুজনের মধ্যে মিল আছে, বেশ। দাম্পত্য কলহ যে এক আধ সময় না হয় তা নয়, কিন্তু তা প্রবচনকে লঙ্ঘন করে না। লঘু ক্রিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। মৃগাঙ্ক নিজে পছন্দ করে দেখে শুনে সুরমাকে বিয়ে করেছে। আর বিয়ের পর সুরমা পছন্দ করেছে মৃগাঙ্ককে। দুজনে দুজনের বৈপরিত্যকে যেন ভালোবেসেছে।

মৃগাঙ্ক বলল, 'ভালো আছিস?'

অরুণ মৃদু হেসে ঘাড় নাড়ল।

পায়ে হাত দিতে যাওয়ায় সুরমা একটু পিছিয়ে গিয়ে বলল, 'থাক থাক। তারপর খবর কি তোমার।'

অরুণ বলল, 'খবর যে মোটেই সুখবর নয় তাতো আগেই শুনেছেন।' চাকরির বাকরি খুইয়ে কাশ্যপগোত্র হয়ে ফিরে এসেছি।'

কাকার ঘর থেকে বাবার ঘরে এসে ঢুকল অরুণ। মনে মনে ভাবল, খুব প্রীতিকর কর্তব্য নয়, তবু সেরে আসা যাক।

হাতমুখ ধুয়ে এসে তক্তাপোশের ওপর বসে সকালের কাগজে চোখ বুলাচ্ছিলেন অবনীমোহন। কোঁচার খুঁটটি গায়ে জড়ানো। ছেলে

এসে পায় হাত দিতেই চোখ তুলে তাকালেন। বললেন, 'এই যে শরীর ভালো আছে তো?'

অরুণ বললে, 'হ্যাঁ, আপনার?'

অবনীমোহন ছেলের দিকে তাকিয়ে একটু যেন হাসলেন, 'আমি ভালই আছি।' তারপর মিনিট খানেক চুপচাপ কাটল। অবনী কম কথা বলেন। কিন্তু অরুণ তো আর তা নয়। বন্ধুরা তাকে বলে, 'বক্তিয়ার খিলজী', সে একবার কথা বলতে শুরু করলে আর কারো মুখ খুলবার জো থাকে না। কিন্তু বাবার কাছে এসে অরুণের নিজের থেকেই বাকসংযম আসে। ভয়ে নয়। আজকাল বাবাকে সে আর ভয় করে না। কিন্তু কেমন একটা দূরত্ব যেন অনুভব করে। যেন অর্ধপরিচিত এক ভদ্রলোক তার সামনে উপস্থিত রয়েছেন। তাঁর সঙ্গে শুধু সাধারণ কুশল প্রশ্নেরই আদান প্রদান চলে; তার বেশি আলাপ চালানো অশিষ্টতা। অরুণের মনে হয়, বাবা যে তার কাছে শুধু মুখই খোলেন না তা নয়, মনও খোলেন না। একটু বাদে অবনীমোহন নিজেই কথা বললেন, 'যাও, হাত মুখ ধুয়ে বিশ্রাম করো গিয়ে।'

অরুণ বলল, হ্যাঁ যাচ্ছি।'

তারপর আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

তেতলার ছাদের লাগা ছোট একখানি ঘর। সারা বাড়ির মধ্যে এই ঘরখানিই একান্ত করে তার। সমস্ত কৈশোর আর যৌবনের প্রারম্ভ তার এই ঘরটুকুর মধ্যে কেটেছে। বছরের সমস্ত সময়টা বন্ধু মহলে আড্ডা দিয়ে পরীক্ষার কিছুদিন আগে বইপত্র নিয়ে এই চিলেকোঠার ঘরে স্বেচ্ছাবন্দী হয়েছে অরুণ। এম এ পর্যন্ত এই ছিল ওর পাঠাভ্যাসের পদ্ধতি। প্রবাসে থেকে যতবার নিজেদের বাড়ির কথা ওর মনে হয়েছে সবচেয়ে আগে চোখের সামনে ভেসে উঠেছে চিলেকোঠার এই ঘরখানি। কিন্তু নিজের ঘরের অবস্থা দেখে অরুণ মুহূর্তকাল স্তম্ভিত হয়ে রইল। বিড়ি আর সিগারেটের

বাসন্তী কনকলতার দিকে তাকিয়ে বললেন 'বউদি আমাদের জব্দ করার জন্যেই তুমি একাজ করেছ। তুমিই এর মূলে। সকাল থেকেই মেস মেস করছিলে। সেই মেসেই পাঠালে জামাইকে। শুধু আমাকে জব্দ করার জন্যে।' কনকলতা বললেন, 'জব্দ কে কাকে করছে তা সবাই দেখতে পাচ্ছে। যার জামাই না খেয়েদেয়ে দুপুর বেলায় বাড়ি থেকে রাগ ক'রে চলে গেল, সে জব্দ হোল না, তার দুঃখ হোল না, ব্যথা লাগল পাড়াপড়শীর। কার জন্যে কার যে কতটুকু ব্যথা তা আর জানতে বাকি নেই আমার?'

বাসন্তী বললেন, 'পাড়াপড়শী। হ্যাঁ! এখন তো পাড়াপড়শীই হয়েছি। পাড়াপড়শীর চেয়েও তুমি আমাদের দূরে সরিয়ে দিয়েছ।'

অরুণ ধমক দিয়ে বলল, 'মা তুমি কি থামবে না? আমার বাড়ি আসাই অন্যায় হয়েছে দেখছি।'

বাসন্তী বললেন, 'এলি কেন। না এলেই আর পাঁচজনে স্বস্তিতে থাকত।'

খাওয়া দাওয়া আর সংসারের কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে সারাদিন ধরে ননদ ভাজে কথা কাটাকাটি আর ঝগড়া চলতে লাগল। শুনতে শুনতে অরুণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। আসতে না আসতেই একি শুরু হোল বাড়িতে। এখানে সে থাকবে কি করে।

সন্ধ্যার একটু আগে আগে সবাই বাড়ি ফিরলেন। বৈদ্যনাথ কাজ করেন বড়বাজারের এক মাড়োয়ারী মার্চেণ্ট অফিসে। ক্লাইভ রোয়ের ন্যাশনাল ইনসিওরেন্সে অবনীমোহনের চাকরি। দু'জনে একই ট্রামে ফিরলেন। ফিরে এসে যাঁর যাঁর স্ত্রীর মুখে প্রায় একই সময় শুনলেন ঘটনার বিবরণ। কনকলতা বললেন, 'আমি এ বাড়িতে আর থাকব না। তুমি যদি কালই অন্য কোন বাড়ির ব্যবস্থা না করো, আমি যেদিকে দু' চোখ যায়, চলে যাব।'

বৈদ্যনাথ বললেন, 'হু' এবার সেই ব্যবস্থা করতে হবে দেখছি।

লোকের সহ্য করবার একটা সীমা আছে। কিন্তু সুবিমলেরই বা একেবারে বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার কি হোল। বাড়িতে আর কোন ঘরদোর ছিল না এমন তো নয়। ওপরের ঘরখানার ভাড়াই না হয় অবনীরা দেয়, কিন্তু নিচের দুখানা তো আমাদেরই, তাতে ওর থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেই হোত।'

কনকলতা বললেন, 'আমি তো তাই বলেছিলাম। কিন্তু সুবিমল শুনল কই।' অণিমা কাছেই ছিল, এবার এসে পাশে দাঁড়াল, 'না মা, তার চলে যাওয়াই ভালো হয়েছে। অন্য কোন ঘরে থাকতে হলে তা নিয়েও গোলমাল হোত। তার চেয়ে এই ভালো। কলকাতা শহরে তার থাকবার জায়গার অভাব কি, আত্মীয় বন্ধু কত আছে! তোমরা বলেছিলে বলেই এতদিন ছিল, না হলে কবে চলে যেত।'

পাশের ঘরে ঠিক এই বিষয় নিয়েই দাম্পত্যালাপ চলল খানিকক্ষণ।

বাসন্তী বললেন, 'রোজ রোজ এই কেলেঙ্কারি আর সহ্য হয় না। এবার তোমরা অন্য বাসা দেখ।'

অবনীমোহন চায়ের কাপে চুমুক দিলেন, 'তা না হয় দেখব। কিন্তু সুবিমল হঠাৎ চলে গেল কেন।'

বাসন্তী কিছুটা অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে বললেন, 'কেন তা আমি কি ক'রে জানব।'

অবনীমোহন বললেন, 'বেশ, যে জানে, তাকেই জিজ্ঞেস করছি।'

অরুণকে ডেকে পাঠালেন অবনীমোহন।

সব শুনে বললেন, 'তুমি অন্যায় করেছ।'

বাসন্তী বললেন, 'নিজের ছেলেমেয়েদের দোষ ছাড়া তো তোমার আর কিছু চোখে পড়ে না।'

অবনীমোহন এবার একটু হাসলেন, 'আর একজনের দোষও চোখে পড়ছে।' বাসন্তী বললেন, 'তাতো পড়বেই। আমার দোষ তো তুমি চোখ মেলতে না মেলতেই দেখতে পাও। কিন্তু আসল দোষ যে কোথায়, তাই শুধু তোমার নজরে পড়ে না।'

বাসন্তী হয়তো আরো দু একটা কথা বলতেন, কিন্তু ছেলে কাছে আছে বলে থেমে গেলেন।

অবনীমোহন ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার অন্যায় হয়েছে একথা স্বীকার করা ভালো।'

অরুণ একটু অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে বলল, 'আমি তো তা অস্বীকার করছিনে। ঘরটা অত নোংরা হয়েছে দেখে আমি মেজাজ ঠিক রাখতে পারিনি।'

অবনীমোহন বললেন, 'মানুষের বাইরের নোংরামিই কি সব? ভিতরের দিকেও তাকাতে হয়। বিশেষ করে নিজের।'

অরুণ একটু কাল চুপ করে থেকে বলল, 'আপনি তাহলে এখন কি করতে বলেন?'

অবনীমোহন বললেন, 'আমি আর কিছুই বলিনে। তোমার বয়স হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছ, তার ফলে বুদ্ধি বিবেচনাও কিছু হয়েছে বলে লোকে আশা করে।' কথা শেষ না ক'রে সেলফ্ থেকে মেটেরিয়া মেডিকাখানা টেনে নিলেন অবনীমোহন। আত্মীয় স্বজনের মধ্যে তাঁর সখের প্র্যাকটিস আছে।

অরুণ স্থির হয়ে একটুকাল তাকিয়ে রইল। তারপর মার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'বেশ, কাল সকালে গিয়ে সুবিমলকে পায়ে ধরে সেধে নিয়ে আসব। তা হলে তো আর কোন দোষ থাকবে না? আমি আজ রাত্রে কিছু খাব না মা। ক্ষিদে নেই। আর নিচের বৈঠকখানা ঘরেই আমার বিছানা পেতে দাও। বড্ড ঘুম পেয়েছে।'

অবনীমোহন বই থেকে মুখ তুললেন না।

ফলে নিজের আস্ফালনটা নিজের কাছেই ভারি ছেলেমানুষি বলে মনে হতে লাগল অরুণের।

বাসন্তী ঘরের বাইরে এসে পরম স্নেহে ছেলের হাত ধরলেন। তারপর স্নিগ্ধ স্বরে বললেন, 'তুই কি পাগল হলি নাকি। খাবিনে

কেন। উনি তো অমন কতই বলেন। অত ভালো মানুষ বলেই তো এই দশা করে তুলেছেন সংসারের।'

রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে নিজের হাতে ভাত বেড়ে পাতের কাছে বসে ছেলেকে খাওয়ালেন বাসন্তী। নান্তুর ওই এক দোষ। একটু কিছু হলেই যত রাগ যায় ওর খাওয়ার ওপর। হ্যাঁরে, এত দেশ-বিদেশ ঘুরলি এখনো কি তেমনি আছিস। কথায় কথায় রাগ হয় তোর? দিল্লীতে রাগ করতি কার ওপর? ঠাকুর চাকরের ওপর? মাসের মধ্যে ক'দিন থাকতি না খেয়ে?' বাসন্তী একটু হাসলেন, তারপর ছেলের পাতের দিকে চোখ পড়তেই ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'ওকি মাছ-টুকু ফেলে যাচ্ছিস কেন? ওটুকু খেয়ে ফেল। আমার কথা শোন। খা। তোমার আর ভদ্রতা করতে হবে না বাপু। সবার জন্যেই আছে। তুমি খাও। না খেয়ে খেয়ে যা চেহারা বানিয়েছ একখানা।' বৈঠকখানা ঘরে কিছুতেই অরুণের জন্যে বিছানা পাতলেন না বাসন্তী। অত ভিড়ের মধ্যে ওর ঘুম হবে না। এইটুকুন বয়স থেকে ওর একটু নিরিবিলিতে থাকা স্বভাব। বাসন্তীর তো কিছু আর জানতে বাকি নেই।

নিজে তোষক বালিশ টেনে টেনে ট্রাঙ্ক থেকে ফর্সা চাদর বের করে তেতলার চিলা কোঠায় ছেলের জন্যে বিছানা পেতে দিলেন বাসন্তী। বললেন, 'কাল গাড়িতে ঘুম হয়নি। আজ সকাল সকাল ঘুমো, না হলে শরীর খারাপ হয়ে পড়বে।'

চলে যেতে যেতে আবার একটু ফিরে দাঁড়ালেন, 'পারো তো চাকরি বাকরির কথা ভেবে রাত ভোর কোরো। তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে যেয়ো না। মন খারাপ কোরো না। চাকরি গেছে আবার হবে। অকাট মুখ্য তো নও গতি একটা হবেই। ঘুমোও এবার। আর আলো জেবলে রেখে কাজ নেই।'
নিজেই সুইচটা অফ করে দিয়ে গেলেন বাসন্তী। পায়ের কাছ থেকে

পাতলা চাদরখানা টেনে এনে গায়ে দিল অরুণ। মায়ের পুরোন ট্রাঙ্কের গন্ধ আছে এই চাদরে। মায়ের নিজের গায়ের গন্ধের মত। অদ্ভুত মায়ের স্নেহ। অরুণের সমস্ত অযোগ্যতা, সমস্ত অপরাধ মা চাদর দিয়ে ঢেকে রেখেছেন।

বাবা তাঁর ঔদার্য নিয়ে দূরে সরে রইলেন। কিন্তু সংকীর্ণ স্বার্থপরতায় ধরা দিলেন মা। মা ছোট, এই চিলে কোঠার মতই স্বল্প-পরিসরের। কিন্তু একান্ত নিজস্ব, একান্ত আপন। অরুণ পাশ ফিরল। ঘুম আসছে না। মায়ের হাতের সযত্নে পাতা এমন সুন্দর নরম বিছানাতেও আজ যেন ঘুম আসতে চাইছে না। ঠিক বেছে বেছে আজকেই মা এত আদর না দেখালেও পারতেন। এই স্নেহের দান আর গ্রহণের মধ্যে কিসের যেন একটা লজ্জা জড়িয়ে থাকে। অল্প বয়সে নির্বিচারে মায়ের আদর নেওয়া যায় কিন্তু বয়স বাড়লে নিজের পৌরুষ দিয়ে না নিলে, যোগ্যতা দিয়ে না নিলে ঠিক যেন নেওয়ার মত নেওয়া হয় না। বাবার চোখের সামনে মার যে অন্যায় পক্ষপাত আর স্বার্থপর স্নেহ প্রকাশ হয়ে পড়ল তার জন্যে হঠাৎ যেন ভারি লজ্জা বোধ হোল অরুণের। মার জন্যে লজ্জা নিজের জন্যে লজ্জা, সকালের কাণ্ডটার কথা মনে পড়ল। সুবিমল সত্যিই ভারি নোংরাভাবে ছিল। অরুণ নিজেও এমন কিছু গোছাল স্বভাবের নয়। কিন্তু সুবিমল তার চেয়েও বেশি অপরিচ্ছন্ন। মাথায় হাত দিয়ে অমন করে ভাবছিল কি ও? চাকরি বাকরির কথা? চাকরির কথা তো কাল থেকে অরুণকেও ভাবতে হবে। অবশ্য মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে হবে না তবু ভাবতে তো হবেই। এতক্ষণ বাদে সুবিমলের জন্যে হঠাৎ কেমন একটু সহানুভূতি হোল অরুণের আর এই মমত্ববোধ নিজের কাছেই ভালো লাগল। কিন্তু ঘুম বোধ হয় আজ আর সহজে আসবে না। আরো কিছুক্ষণ এ পাশ ও পাশ করে ঘর থেকে বেরিয়ে এল অরুণ। এসে দাঁড়াল ছাদে। আস্তে আস্তে পায়চারি করতে করতে আলসের কাছে এসে থেমে দাঁড়াল।

কারা ওখানে? পায়ের শব্দে গলার শব্দে ওরাও ফিরে তাকিয়েছে। প্রীতি এগিয়ে এসে বলল, 'আমরা।'
অরুণ হেসে বলল, 'ও তোরা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাওয়া খাচ্ছিস বুঝি?'
প্রীতি বলল, 'হ্যাঁ, ঘুম আসছিল না।' বিজু বলল, 'আর যা গরম।'
অরুণ হেসে বলল, 'হ্যাঁ সব রকমের গরমই আছে। ঝগড়ার গরমটাও নেহাৎ কম নয়।'
বিজু বলল, 'এরা কথায় কথায় এমন ঝগড়া ক'রে কি যে আনন্দ পায় বুঝিনে।'
অরুণের ভারি ভালো লাগল। এসে অবধি সকাল থেকে দুই পরিবারের মধ্যে কেবল ঝগড়া আর চেঁচামেচি শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। কিন্তু এত বিবাদ-বিসংবাদের মধ্যেও দু'টি আত্মীয় পরিবারের দু'জন প্রতিনিধি দু'টি ছেলেমেয়ে তাদের অন্তরঙ্গতার কথা মনে রেখেছে। তারাভরা একই আকাশের নিচে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে গল্প করছে দু'জনে।
প্রীতি বলল, 'এবার যাই দাদা, শোয়ার ব্যবস্থা করি গিয়ে।'
অরুণ জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় শোস তুই।' প্রীতি বলল, 'নিচে দিদিমার ঘরে। অণি থাকে আমার সঙ্গে। আজ তো সে রেগে একেবারে টং হয়ে রয়েছে। কিছু খেল না। তুমি কাজটা ভালো করো নি দাদা।'
অরুণ বলল, 'সত্যি ভারি অন্যায় হয়ে গেছে।'
বিজু বলল, 'এমন কিছু অন্যায় হয় নি। সামান্য কথা নিয়ে সুবিমলবাবুরই কি অত কাণ্ড করা উচিত হয়েছে?'
বলে বিজু নিচে নেমে গেল।
শান্ত সংযত সাংসারিক ব্যাপারে খানিকটা নির্লিপ্ত ধরনের ছেলে বিজু। পড়াশুনোয় ভালো। অরুণের মত কেবল পরীক্ষার সময়েই বইয়ের খোঁজ করে না। সারা বছর ধরে পাঠ্য বইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। কুড়ি উৎরে একুশে পড়েছে। অসুখের জন্যে একটা বছর

ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিতে দেরি হয়েছিল। না হলে এবার বি কম্ পাশ করে যেত। মামাত ভাই-বোনদের মধ্যে ওকে খুব ভালবাসে অরুণ।

প্রীতি বলল, 'তোমার আর কিছু লাগবে নাকি দাদা? জলটল সব ঠিক আছে তো?'

অরুণ বলল, 'আছে। তুই যা এবার। পতির অপমানে সতী ওদিকে দেহত্যাগ করল কিনা দেখ গিয়ে।'

প্রীতি চলে গেলে অরুণ এসে ফের বিছানায় শুয়ে পড়ল। চোখ বুজতেই এবার একটি মেয়ের মুখের আদল ফুটে উঠল অন্ধকারে। সহকর্মী বন্ধু হিরণ্ময় মজুমদারের বোন করবী। বিয়ে হয়ে গেছে, ছেলেও হয়েছে একটি। বছর তিনেক বয়স। মার মতই বেশ ফুটফুটে সুন্দর চেহারা।

সাধারণত ছোট ছেলেকে আদর করতে পারে না অরুণ। কিন্তু করবীর ছেলেকে খুব আদর করেছিল। তা দেখে করবী বলেছিল, 'আপনি তো দেখছি একেবারে বাৎসল্যে ভরপুর। ওর বাবা কিন্তু ওকে দেখতেই পারে না।' হিরণ্ময় জবাব দিয়েছিল, 'রক্ষা যে পারে না। তাহলে পরেশকে কি তুই দেখতে পারতি? বাৎসল্যটা পুরুষের বেশি বয়সে আসে। বেশি বয়সে আসাই ভালো।'

ছুটি না পাওয়ায় পরেশবাবু যেতে পারেন নি। ছেলেকে নিয়ে করবী একাই গিয়েছিল দাদা বউদির কাছে। হিরণ্ময়ই লিখেছিল তাকে যেতে।

'অস্থায়ী চাকরি কবে আছে কবে নেই। এসে একবার বেড়িয়ে যা।' সবাই মিলে খুব বেড়িয়েছিল যা হোক। শেষের দিকে হিরণ্ময়ের স্ত্রী নমিতা আর যেতেন না। পিপলুকে বউদির কাছে গছিয়ে করবী একাই বেরুত তাদের সঙ্গে। মাসখানেক ছিল, খুব হৈ হৈ করে কাটিয়ে এসেছে। আসার সময় করবী ঠিকানা দিয়ে এসেছিল,

'কলকাতায় গিয়ে অবশ্যই যাবেন। ভবানীপুরের শাঁখারীপাড়া চেনেন তো ?'

অরুণ অপরিচয়ের ভান করে বলেছিল, 'কই না'।

করবী জবাব দিয়েছিল, 'না চিনলেও চৌরঙ্গী থেকে জিজ্ঞেস করতে করতে যাবেন। আমি যেমন জিজ্ঞেস করতে করতে দিল্লী এসেছি।'

ভারি প্রগলভা। বছর বাইশ তেইশ বয়স। স্বামীপুত্রের সুখে সৌভাগ্যবতী, সেই সমৃদ্ধি নিজের মধ্যে চেপে রাখতে পারে না। আপনা থেকেই উপচে পড়ে। ঠিকানা দিয়ে বলেছিল, 'যাবেন, আলাপ করে আসবেন বোস মশাইর সঙ্গে। অবশ্য তিনি যা আলাপী—'

বলে মৃদু হেসেছিল করবী।

অরুণ জিজ্ঞেস করেছিল, 'কেন, পরেশবাবু আলাপ করতে ভালো বাসেন বুঝি ?'

করবী বলেছিল, 'ভালো ঠিকই বাসেন, ভালো পারেন না। চিঠিপত্রে খুব কলম চলে, কিন্তু আপনার মত অমন মুখ চলে না।' আর একবার অনুরোধ করেছিল করবী, 'যাবেন কিন্তু।'

পথে প্রবাসে অমন কতজনের সঙ্গেই তো আলাপ হয়, কতজনেই তো ঠিকানা দিয়ে ভদ্রতা করে যেতে বলে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে না যাওয়াটাই ভদ্রতা। তাছাড়া গিয়ে কি বলবে ? চাকরি গেছে ? ছুটিতে আসে নি, একেবারে ছাঁটাই হয়ে এসেছে ? করবী হয়তো একটু সহানুভূতি জানাবে। অনুকম্পা বোধ করবে। সেই অনুকম্পা কুড়োতে গিয়ে লাভ কি।

করবীর দাদা—হিরণ্ময়ের চাকরি এখানো অক্ষত আছে। সে অনেক আগে ঢুকেছিল। পদে দু' ধাপ ওপরে। মাইনেও বেশি। তাছাড়া ওপরওয়ালার মন জুগিয়ে চাকরি কি করে রাখতে হয় তা সে জানে। ও চাকরি গেলে অন্য ভালো চাকরি জুটিয়ে নিতে তার দেরি হবে না। বন্ধুর জন্যে খানিকটা ঈর্ষা বোধ করল অরুণ। কিন্তু সেই সঙ্গে

বন্ধুর বোনের নিমন্ত্রণের কথাটা আর একবার মনে পড়ল। পড়ুক গিয়ে। কাল থেকে শহরের অফিসে অরুণকে ধন্না দিয়ে বেড়াতে হবে। অত নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ রাখবার তার সময় কই।

আগের দিন যাঁরা প্রায় ঝগড়া মুখে নিয়ে উঠেছিলেন, আজ সারাদিনের কাজকর্মের মধ্যে অনেকবার মুখোমুখি হলেও সেই বাসন্তী, আর কনকলতা কেউ কারো সঙ্গে কথা পর্যন্ত বললেন না। বাক্যালাপ বন্ধ রইল বৈদ্যনাথ আর বাসন্তীর মধ্যে। দু'জন যে ভাই-বোন তা সহজে বুঝবার জো নেই। প্রত্যেকেই এমনভাবে চলতে লাগলেন যেন কারো সঙ্গে কারো সম্পর্ক তো দূরের কথা, পরিচয় মাত্র নেই। এও ঝগড়া। এই শব্দহীন কলহ দুই পরিবারের মধ্যে কিছুদিন ধরে চলবে। তারপর আপনিই একদিন মিটমাট হয়ে যাবে। এ তো তবু জামাইকে উপলক্ষ করে ঝগড়া হয়েছে। এর চেয়েও তুচ্ছ কারণে কলের জলের ভাগ নিয়ে যৌথ ঝি-এর কাজ আর মাইনে নিয়ে, ছাদে কাপড় মেলার জায়গা নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে হঠাৎ কলহ লেগে যায়। তারপর কিছুদিন ধরে চলে মন-কষাকষির পালা। দুই পক্ষই আস্ফালন করে, এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে। এই কেলেঙ্কারির মধ্যে আর কেউ থাকবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কারোরই যাওয়া হয় না। সবাই থেকে যায়।

আজ কুড়ি বছর ধরে এমনি হয়ে আসছে। অবশ্য গোড়াতেই যে এত ঝগড়া লাগত, কথায় কথায় কথা বন্ধ হোত তা নয়, তখনকার ঝগড়া ছিল শরতের মেঘের মত। তখন আকাশ এমন থমথমে হয়ে থাকত না। ঝড়-বৃষ্টি কদাচিৎ হোত। একজনের হাসি-পরিহাসে আর একজনের মনের আকাশ পরিষ্কার হয়ে যেতে মোটেই সময় লাগত না। দু'দিন একদিন নয়, বছর কুড়ি আগে শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের এই তেতলা বাড়িটির সামনে একই ঘোড়ার গাড়ি থেকে নেমেছিলেন বাসন্তী আর কনকলতা। তখন এত ছেলেপুলে ছিল না, লোকজন

ছিল না। কনকলতার কোলে তখন মাস-কয়েকের একটি ছেলে। আর বাসন্তীরও মাত্র দু'টি। তাদের নিয়ে ভুবনময়ী ছিলেন পিছনের গাড়িতে। শ্যামবাজারের বাড়িতে মাস দেড়েক আগে স্বামী মারা গেছেন। শ্রাদ্ধশান্তি চুকে যাওয়ার পর ভুবনময়ী বললেন, 'এ অলক্ষুণে বাড়িতে আমি আর টিঁকতে পারব না। এ-পাড়ায়ও আমার আর থাকবার ইচ্ছে নেই। তোমরা অন্য পাড়ায় অন্য বাড়ি দেখ।'
ছেলে আর জামাই দু'জনেই তাঁকে বুঝাল, বাড়ির কি দোষ। কিন্তু ভুবনময়ী কিছুতেই সে কথা শুনলেন না। বাড়ি তিনি বদলাবেনই। অবনী চন্দ আর বৈদ্যনাথ দত্ত দু'জনেই শহর ভরে তখন বাড়ির খোঁজ শুরু করলেন। জায়গামত পছন্দমত ভালো বাড়ি পাওয়া যায় না। অবশেষে অবনীমোহনই একদিন খোঁজ আনলেন এই বাড়ির। ঘরের সংখ্যা অনেক। বাড়িটাও প্রায় নতুন। শুধু অসুবিধে এই বাড়িওয়ালা আলাদা আলাদা করে ঘর ভাড়া দেবেন না। দিতে হয় গোটা বাড়িটাই দেবেন একজনকে। ভুবনময়ী বললেন, 'গোটা বাড়িই তো আমার চাই। দু' একখানা ঘর দিয়ে কি করব।'
আগে শ্যামবাজারেও একটি পুরো বাড়ি ভাড়া নিয়ে ছিলেন আদিনাথ দত্ত। কিন্তু তাঁর আর্থিক অবস্থা ছিল ভালো। বেলেঘাটার কুণ্ডুদের ধান-চালের আড়তে কাজ করতেন। গোড়ায় দশ টাকার মাইনেতে ঢুকেছিলেন, কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই হয়ে উঠেছিলেন মনিবের দক্ষিণ হস্ত। তাঁর আয় শুধু মাইনের টাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সোনা-গহনায়, আসবাবপত্রে, নগদ টাকায় বেশ সম্পন্ন গৃহস্থ বলেই পরিচিত মহলে গণ্য ছিলেন আদিনাথ। কিন্তু বৈদ্যনাথ তো আর তা নয়। পর পর বার-দুই আই এ ফেল করে মার্চেন্ট অফিসে ঢুকেছেন। একটা গোটা বাড়ি তিনি ভাড়া নেবেন কি করে। আর তার দরকারই বা কি।
কিন্তু ভুবনময়ী বলেন, 'দরকার আছে। পুরো বাড়িই আমার দরকার। আমার ছেলে থাকবে মেয়েও থাকবে। কাউকেই আমি আর

কাছ ছাড়া করব না। যাবার সময় তিনি সেই কথাই বলে গেছেন। বলেছেন দু'জনকে এক জায়গায় রেখ।'

বাবার অসুখের সময় বাসন্তী এসেছিলেন তাঁর কাছে। ননদ ভাজে একসঙ্গে সেবা-শুশ্রূষা করতেন। রাত জাগতেন পালা করে। অবনী থাকতেন মেসে। সেখান থেকে এসে দেখে যেতেন পীড়িত শ্বশুরকে। ভুবনময়ীর প্রস্তাবে অবনীমোহন বললেন, 'তাই কি হয়! একজায়গায় কি সকলের থাকা সম্ভব?'

ভুবনময়ী বললেন, 'কেন, অসম্ভব কিসে? দেশের বাড়িতে কতদিনই বা তুমি আমার মেয়েকে আর ফেলে রাখবে। এখানে যখন চাকরি-বাকরি করছ, এখানেই থাকতে হবে তোমাকে। ভাইদেরও এখানে নিয়ে এসো। তারাও পড়ুক শুনুক, চাকরি বাকরির চেষ্টা করুক। কলকাতায় তোমার এখন একটা বাসা না থাকলে কি চলে।'

অবনীমোহন ভেবে দেখলেন কথাটা ঠিক। বাবা মা মারা গেছেন। কাকারা আর খুড়তুতো ভাইরা আছেন দেশের বাড়িতে। সম্পত্তির যা আয় তাতে কেউ সেখানে বসে খেতে পারবে না। কলকাতায় আনাতেই হবে ভাইদের। বাসা এখানে একটা করা দরকার। কিন্তু শ্বশুরকুলের সঙ্গে একসঙ্গে থাকার প্রস্তাবে তাঁর মন সহজে সায় দিল না। বৈবাহিক সূত্রে যাঁরা আত্মীয় বাইরের দিক থেকে একটু দূরে দূরে থাকলেই তাঁদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা বজায় থাকে।

ভুবনময়ী জামাইএর মনোভাব আন্দাজ করতে পেরে বললেন, 'আমি জানি তুমি কি ভাবছ। এক সঙ্গে থাকতে গেলে কুটুম্বিতা থাকবে না, আমার মেয়ে আর বউয়ের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি লাগবে, এই হয়েছে তোমার চিন্তা, না?'

অবনীমোহন লজ্জিত হয়ে বললেন, 'না না, তা নয়।'

ভুবনময়ী একটু হাসলেন, 'ঠিক তাই। কিন্তু অবনী, এই কি তোমার কুটুম্বিতা বিচারের সময়? তিনি অসময়ে চলে গেলেন। আমি ভাবলাম আমার দুই ছেলে রইল। তুমি বড়, বৈদ্যনাথ ছোট। তুমিই রইলে ওর

অভিভাবক। তুমি না থাকলে আমি কাকে নিয়ে ভরসা করে ফের সংসার বাঁধব? ওকে নিয়ে? ওর কেবল বয়সই হয়েছে। কিন্তু সাংসারিক বুদ্ধি-শুদ্ধি ধীরতা স্থিরতা কি আছে? কথায় কথায় কেমন মাথা গরম করে দেখতো।' অবনীমোহন ফের ভেবে দেখলেন। অল্প বয়সে মা মারা গেছেন। সেই মাতৃস্নেহের স্বাদ যেন তিনি খানিকটা পেয়েছেন ভুবনময়ীর কাছে। জামাইয়ের মত নয়, নিজের ছেলের মতই তাঁকে দেখেছেন ভুবনময়ী। আদিনাথও তাই ভাবতেন। সদ্য শোকার্তা, বিধবা শাশুড়ীকে আঘাত দিতে তাঁর বাধল। মনে মনে ভাবলেন, এখনকার মত ও'র অনুরোধ রক্ষা করা যাক, পরে সুযোগ সুবিধে মত ভিন্ন বাসায় উঠে গেলেই হবে। শাশুড়ীর প্রস্তাবে রাজি হলেন অবনীমোহন।

ভুবনময়ী খুশি হয়ে মেয়ে আর বউকে কাছে ডেকে বললেন, 'তোমরা এসো এদিকে, শোন। আমার জামাইয়ের কিন্তু ভয় হয়েছে পাছে তোমাদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি হয়। খবরদার পাছে ঝগড়া-টগড়া কেউ করো।'

ঘরে অবনী ও বৈদ্যনাথ দু'জনেই উপস্থিত ছিলেন। তাই বাসন্তী আর কনকলতা শুধু ঘাড় নেড়ে জানালেন যে, তেমন আশঙ্কার কোন কারণ নেই। কিন্তু পরক্ষণেই পাশের ঘরে এসে দু'জনের সে কি হাসি। হাসতে হাসতে বাসন্তী গলা জড়িয়ে ধরলেন কনকলতার, 'ঝগড়া করবে নাকি বউদি? কেমন করে করবে?'

কনকলতাও হেসে ননদের দু' কাঁধে হাত রাখলেন, 'করব আবার না? রাতদিন ঝগড়া করব। ভেবেছ কি তুমি?'

বাসন্তী বললেন, 'হুঁ, তুমি আবার করবে ঝগড়া। মুখ থেকে মোটে কথা বেরোয় না। না ভাই তোমার সঙ্গে ঝগড়া করেও সুখ হবে না।'

কনকলতা তাকে ভরসা দিলেন, 'হবে গো হবে। তুমি মুখে বলবে আর আমি চোখ ঘুরোব, হাত-পা নাড়ব, ঠিক আমার ছোট পিসিমার মত।'

বলে কনকলতা হেসে উঠলেন।

বাসন্তীও হাসলেন।

তখন দু'জনেই সবে কুড়ি পেরিয়েছেন। বাসন্তীই দু'এক বছরের বড় হবেন বয়সের হিসেবে। কিন্তু কনকলতা তা কিছুতেই স্বীকার করতে চান না। বলেন, 'বউদি আবার ছোট হয় নাকি কোন দিন। আমিই বড়, ঢের বড়। তোমার পূজনীয়া। চিঠিতে পাঠ লিখবে শ্রীশ্রীচরণকমলেষু। অমন ভাই, বন্ধু-টন্ধু চলবে না।'

বাসন্তী বললেন, 'আচ্ছা আচ্ছা। দেখি শ্রীচরণখানা। ঈস্ এই ছিরি হয়েছে নাকি চরণের। এসো আলতা পরিয়ে দিই। তোমার মত পা হলে আমি আলতার বাটির মধ্যে পা ডুবিয়ে রাখতাম। শিশিতে কুলোত না।' এরপর শুরু হোল প্রসাধনের পালা। শিশি খুলে দু'জনে দু'জনের পায়ে আলতা পরিয়ে দিলেন। চুল বেঁধে দিলেন পরস্পরের।

বাড়িভাড়ার সময় তর্ক উঠল ভাড়াটা কার নামে হবে। অবনীমোহন বললেন 'বৈদ্যদা, আপনার নামেই ভাড়া হোক।'

বৈদ্যনাথ বললেন, 'তা হবে না। তোমার মতলব আমি বুঝতে পারছি অবনী। বলা নেই কওয়া নেই, তুমি স্ত্রী-পুত্র নিয়ে একদিন খিড়কি দোর দিয়ে পালিয়ে যাবে আর গোটা বাড়িটা মাথায় করে আমি পথে দাঁড়াব। ভাড়া হবে তোমার নামে।'

ভুবনময়ী মীমাংসা করে দিলেন। বললেন, 'আচ্ছা, দু'জনের নামেই থাক।'

তাই হোল।

রান্নাঘর শুদ্ধ ওপর-নিচ সব মিলিয়ে আটখানা ঘর। ভিতরে এক টুকরো উঠোনও আছে। মাথার ওপরে সেই মাপের এক টুকরো ছাদ। ভাড়া পঁয়তাল্লিশ। এক এক জনের ভাগে পড়ল সাড়ে বাইশ করে। কনকলতা বললেন, 'নাও ঠাকুরঝি, তোমার যে যে ঘর পছন্দ বেছে নাও।'

বাসন্তী বললেন, 'উঁহু, তুমিই আগে বাছ।'
ভুবনময়ী বললেন, 'বাছাবাছির কি আছে। যার যে ঘরে ইচ্ছে ঢুকে পড়। রাতখানা শুধু শুয়ে কাটানো। তারপর এ ঘরও যাদের ও ঘরও তাদের। আমার অবনীর কি ভাবনাই না ছিল, যদি একসঙ্গে তোমরা না থাকতে পার। না পারার কি আছে। এক পেটে যাদের জায়গা হয়েছে, এক বাড়িতে তাদের স্থান হবে না?'
প্রথম প্রথম কোন স্থানাভাবই ঘটেনি। শুধু শোওয়ার ঘর দু'খানাই আলাদা আলাদা রইল। আর সব চলল একসঙ্গে। একখানি রান্নাঘর একটি হাঁড়ি। কোনদিন কনকলতা রাঁধেন, স্বামী আর ভাইকে পাশাপাশি ঠাঁই করে খেতে দেন বাসন্তী।
'মাছের ঝোলটা কেমন হয়েছে দাদা?'
'ভালো।'
'বলতো কে রেঁধেছে?'
'তুই। না হলে কি এত সেধে সেধে জিজ্ঞেস করছিস?'
'মোটেই না। রান্নাটি বউদির।'
'তাহলে কিচ্ছু হয়নি।'
বাসন্তী আর একটা তরকারি পরিবেশন করতে করতে স্বামীর দিকে তাকালেন, 'কি খাচ্ছ বলতো।'
অবনী বললেন, 'মুড়ি-ঘণ্ট।'
'কেমন হয়েছে রান্না?'
'ভালো।'
'কে রেঁধেছে বলতো।'
'সোনা বউয়ের রান্না বলেই তো মনে হচ্ছে।'
'হুঃ যা ভালো তাই সোনা বউয়ের রান্না। আর বুঝি কেউ কিছু রাঁধতে জানে না।'
তখন ষাট টাকা মাইনে পান বৈদ্যনাথ। সামান্য কিছু পকেট খরচ রেখে সব ধরে দিলেন অবনীর কাছে, 'নাও হে সংসার চালাও।'

অবনী বললেন, 'ওসব আমার কাজ নয়।'
বাসন্তী বললেন, 'ভালো মানুষ ঠিক করেছ দাদা। নিজেই চলতে জানে না, আবার সংসার চালাবে। বরং তুমি নিয়ে হিসেবপত্তর করে চালাও সংসার।'
স্বামীর মাইনের আশি টাকা এনে দাদার হাতে ধরে দিলেন বাসন্তী।
বৈদ্যনাথ বললেন, 'আচ্ছা সব টাকা তোর কাছেই রেখে দে। খরচপত্তর যা লাগবে আমি চেয়ে চেয়ে নেব। মোটামুটি একটা জমা-খরচ রাখিস তাহলেই হবে।'
বাসন্তী বললেন, 'জমা-খরচ রাখবে বউদি।'
কনকলতা বললেন, 'উহুঁ, ও সব আমার দ্বারা হবে না।'
বাসন্তী বললেন, 'তবে তোমার দ্বারা কি হবে। সংসারের কোন্ কাজটা করবে তুমি।'
অবনীমোহন বললেন, 'কেন আর বুঝি কোন কাজ নেই। সোনা বউ ছেলেদের মাথা আঁচড়ে দেবে, জামা পরাবে, পছন্দ মত করে সাজাবে, আর বসে বসে আমার পান সাজবে।'
পানটা একটু বেশি খান অবনীমোহন। অফিসে যাওয়ার সময় ডিবা ভরে পান না নিলে তাঁর চলে না।
বাসন্তী বললেন, 'ভিতরে ভিতরে বুঝি তোমাদের এই চুক্তি হয়েছে? আর তুমি কি করবে?'
স্বামীর দিকে ফিরে তাকালেন বাসন্তী।
অবনীমোহন বললেন, 'আমি আর কি করব।'
বাসন্তী বললেন, 'উনি শুধু ওপর ওপর কর্তৃত্ব করবেন, বুঝলে দাদা?'

-

এই যৌথ সংসার চলেছিল একটানা বছর চারেক। তারপর আস্তে আস্তে ফাটল ধরল। অবনীমোহনের দুই ভাই এসে পড়ল দেশ থেকে। একজন পড়বে আর একজন চাকরি করবে। আত্মীয়স্বজনের যাতায়াত বাড়ল। দুজনেরই ছেলে-মেয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি হতে লাগল।

অথচ আয় সেই হারে বাড়ল না। মাঝখানে রাখী মালের কারবার করে বৈদ্যনাথ পৈতৃক পুঁজি লোকশান দিলেন। তারপর থেকে সাংসারিক ব্যাপারে খুব হিসেবী হয়ে গেলেন। হিসেব করে দেখলেন, একান্নে বড় অসুবিধে, বড় ঝামেলা। সংসারের কোন্ দিক দিয়ে যে কি খরচ হয়, তা টেরও পাওয়া যায় না। জমা-খরচের খাতায় তা ধরা পড়ে না। অনেক অদৃশ্য খাতে ব্যয় হয়ে যায় টাকা। অবনীমোহনও অসুবিধেটা বুঝতে পারলেন। তবু নিজে কিছু মুখ ফুটে বললেন না।

কিন্তু আপনা থেকেই ক্রমে সব ফুটে বেরুতে লাগল। যৌথ সংসারে বোন কর্ত্রী, ভাই কর্তা। ব্যবস্থাটা গোড়ার দিকে যত নিখুঁত মনে হয়েছিল, কিছুদিন বাদে তেমন আর রইল না। নানারকম খুঁত বেরিয়ে পড়তে লাগল। কনকলতার হাতে একখানা পোস্টকার্ড কেনার পয়সা থাকে না যে, বাপের বাড়িতে চিঠি লিখবেন। এই নিয়ে একদিন কথান্তর হওয়ায় বৈদ্যনাথ স্ত্রীকে আলাদা করে হাত-খরচ দিতে লাগলেন। চা-বাগানের শেয়ার থেকে যে টাকাটা আসত, তাও বৈদ্যনাথ ভিন্ন করে রাখলেন। অথচ অবনীমোহন বোনাসের টাকাটা পুরোপুরিই যৌথ সংসারের তহবিলে জমা দিয়েছেন। বাসন্তী কনকলতার কাছে কথাটা উল্লেখ করতে ছাড়লেন না। অবনীমোহন আর বৈদ্যনাথ দু'জনে মিলে ঠিক করলেন যে, প্রত্যেকেরই ছেলেপুলে হয়েছে, তাদের ভবিষ্যৎটা আর না দেখলে চলে না। রোজগারের টাকা সব যদি কেবল বাজার আর বাড়িভাড়াতেই ব্যয় হয়ে যায়, দু'দিন পরে কি হবে। স্থির হোল খোরাক পোশাক আর বাড়িভাড়াটা যৌথ তহবিল থেকে ব্যয় হবে। অন্য খরচ যার যার নিজের তহবিল থেকে করবেন। ইনসিওরেন্সের প্রিমিয়াম আদালা আলাদা দেবেন, সে হিসেব সাধারণ জমা-খরচের খাতায় লেখা হবে না। বছরখানেক বাদে পোশাকের বেলাতেও অসুবিধে দেখা গেল। কনকলতার শাড়ি দু'তিনখানা বেশি লাগে। আধময়লা কাপড়ও তিনি পরতে পারেন না। ফলে

ধোপাখরচ বেশি হয়ে যায়। একদিন মাসের শেষে দেখা গেল, তাঁর সবগুলি শাড়িই ছিঁড়ে গেছে। একজোড়া শাড়ি না কিনলেই নয়। বাসন্তী মুখ ভার করে বললেন, 'তহবিলে যা আছে, তা থেকে যদি শাড়ি কেনার টাকা নাও দাদা, একদিনও আর বাজার চলবে না।' বৈদ্যনাথ গম্ভীর মুখে চুপ করে রইলেন। হঠাৎ কোন কথা বললেন না।

বাসন্তী বললেন, 'আর এই বা শাড়ি পরার কি ধরন। দু'জনের শাড়ি তো একসঙ্গেই এসেছে, কই আমি তো দিব্যি পরছি। আমাকে কে কয় জোড়া শাড়ি বেশি এনে দিয়েছে। আর সপ্তাহে দু'বার করে অত যদি ধোয়ানো হয়, কাপড় কি টেঁকে। কাপড় তো সুতোরই তৈরি, লোহার তো নয়।'

বৈদ্যনাথ বললেন, 'থাক থাক। তোর আর বক্তৃতা দিতে হবে না। শাড়ির আমি ব্যবস্থা করছি।'

বৈদ্যনাথ মাসের শেষে বেশ একজোড়া মিহি চওড়াপেড়ে নতুন শাড়ি কিনে দিলেন স্ত্রীকে।

বাসন্তীর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। রাত্রে স্বামীকে বললেন, 'এ কি একচোখোমি বল তো।'

অবনীমোহন বললেন, 'ছি ছি ছি থামো। তাঁর স্ত্রীকে তিনি আলাদা করে কাপড় কিনে দিয়েছেন, এতে আমাদের বলবার কি আছে।'

বাসন্তী বললেন, 'বলবার কিছু থাকত না, তুমি যদি তোমার স্ত্রীকে আলাদা করে অমন জোড়ায় জোড়ায় শাড়ি কিনে দিতে পারতে। আমার শাড়িও তো ছিঁড়ে গেছে। আমি কি পরে বেড়াচ্ছি, তা সংসারের কার চোখে পড়ল।'

অবনীমোহন বললেন, 'আঃ থামো।'

কিন্তু বাসন্তী তখনকার মত থামলেও দিনের বেলায় প্রসঙ্গটা উল্লেখ করতে ছাড়লেন না।

কনকলতাও অধীর হয়ে বললেন, 'কি জানি এমন সৃষ্টিছাড়া ব্যবস্থা

তো আমি জন্মেও দেখিনি। একজন শাড়ি পরলে আর একজনের চোখ টাটাবে। বাজারে তো আর শাড়ির অভাব নেই। গিয়ে কিনে নিলেই হয়। কেউ তো কারো ঘাড়ে বসে খাচ্ছে না। যার যার রোজগারে সে সে খাচ্ছে পরছে। তার অত কথা কিসের।'

তবু কথার পিঠে কথা চলতে লাগল। কথান্তরও হোল এই নিয়ে। শেষে ব্যবস্থা হোল খোরাকটাই শুধু একসঙ্গে চলবে, পোশাকের খরচ যার যার তার তার। কনকলতা নিজের হাতে আলাদা ধোপার খাতা বাঁধলেন। ওপরে গোটা গোটা করে লিখলেন, 'ধোপার হিসাব। শ্রীকনকলতা দত্ত।' নিজের নামটা নিজের চোখেই বড় সুন্দর লাগল দেখতে। নিজের খরচটা নিজের হাতে আসায় দেখা গেল, সপ্তাহে দু'বারের বদলে দেড় সপ্তাহে একবার ধোয়ান হচ্ছে তাঁদের ঘরের জামা-কাপড়।

হিসেবটা স্বামীকে বাসন্তীই বুঝিয়ে দিয়ে বললেন, 'দেখলে বড়দির কাণ্ড? যখন একসঙ্গে ছিলাম, তখন দু'দিনের বেশি এক শাড়ি পরতে পারত না। এখন তো বেশ পারে।'

পোশাকের পর আলাদা হোল দুধ আর জলখাবার। কারণ দুধ নিয়েও একদিন কথা উঠেছিল। অসময়ে বাসন্তীর দেওর মৃগাঙ্কের একদল বন্ধু এসে হাজির, তাদের চা করে দিতে দিতে বাড়ির সব দুধ গেল ফুরিয়ে। রাত্রে আর দুধ মিলল না। কোলের মেয়ে বিরক্ত করায় রাগ করে তার পিঠে গোটাকয়েক চড় দিলেন কনকলতা। মেয়েটি চেঁচিয়ে উঠল। বৈদ্যনাথও কম চেঁচালেন না।

তারপর থেকে দুধ আর জলখাবারের বন্দোবস্ত আলাদা হয়ে গেল। যৌথ রইল শুধু ভাত ডাল মাছ তরকারি।

কিন্তু একদিন তা নিয়েও গোলমাল বাঁধল। কনকলতার ঘুম থেকে উঠতে সাধারণত দেরি হয়। এদিকে আপিসের ভাত দিতে হলে অত দেরিতে উঠলে চলে না। বাসন্তীই আগে উঠে উনোনে আঁচ দিয়ে

রান্না চড়িয়ে দেন। কিন্তু সেদিন বাসন্তী উঠলেন না, বললেন, তাঁর শরীর ভালো নেই— জ্বর হয়েছে।

কনকলতা উঠে দেখেন, ভোরের কাজ সব পড়ে রয়েছে। উনোনে আঁচ দেওয়াও হয়নি। বাসন্তীর ঘরে গিয়ে বললেন, ব্যাপার কি ঠাকুরঝি। আজ কি সব আপিস আদালত বন্ধ? এখনো শুয়ে রয়েছ যে?'

বাসন্তী লেপের ভিতর থেকে বললেন, 'এমন কি দাসখত লিখে দিয়েছি সংসারে যে, শরীর খারাপ হলেও একটুকাল শুয়ে থাকতে পারব না? কি এমন দায় পড়েছে যে, অসুখ নেই বিসুখ নেই রাত থাকতে উঠে নিত্যি আমাকে হাঁড়ি ঠেলতে হবে? আপিসের ভাত তো কেবল আমার ঘরের জন্যেই হয় না, সকলের ঘরের জন্যেই দরকার হয়।'

কনকলতা একটুকাল চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর বললেন, 'ও, সেই কথা বল। মিথ্যে অসুখ-বিসুখের অজুহাত এতক্ষণ দিচ্ছিলে কেন। কাল রাত্রে বলে দিলেই পারতে যে, তুমি আজ রাঁধতে পারবে না, আমাকে রাঁধতে হবে। এমন তো নয় পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে বসে খাই, আর সংসারের সব কাজই তুমি দেখ।'

বাসন্তী বললেন, 'দেখিই তো। এর চেয়ে আবার বেশি দেখবার ক্ষমতা আছে কার। অসুখ নেই বিসুখ নেই, ঠাকুরঝিকে তো ঝি-এর মত খাটিয়ে নিচ্ছ, তবু তোমার আশ মেটে না বউদি?'

কনকলতা বললেন, 'বেশ খেট না। দেখি সংসার চলে কি না চলে। কেবল কি আমার জন্যেই খাটছ, আমার আর ক'জন লোক। নিজের সংসারের জন্যে নিজে খাটবে, তার আবার অত খোঁটা কিসের। খাই না খাই খোঁটা আমি কারো শুনতে পারব না।'

ভুবনময়ী এসে বললেন, 'কি হোল আবার। রোজ কাজ নিয়ে তোদের খিটিমিটি। ছি ছি ছি। তিন শ' পঁয়ষট্টি দিন একহাতে বত্রিশজন লোকের আমি হাঁড়ি ঠেলেছি। তাও দু'এক বছর নয়,

বছরের পর বছর। চেঁচামেচি দূরের কথা, আমার মুখের কথাটি কেউ শুনতে পায়নি। আর তোরা কেবল নিজের নিজের সোয়ামী-পুত্তকে ভাত রেঁধে দিতে বাড়ি মাথায় করে নিয়েছিস। তোদের কারো কিচ্ছু করতে হবে না। আমি রাঁধব। যাসনে তোরা কেউ রান্নাঘরে।'

কিন্তু এভাবে সমস্যার কোন স্থায়ী সমাধান হোল না। কনকলতা নিজে গিয়ে উনোনে আঁচ দিয়ে ভাত চড়ালেন। সেই সঙ্গে মেজাজও চড়তে লাগল।

বৈদ্যনাথ নিচে নেমে এসে বললেন, 'এ কি কেলেঙ্কারি। কাজ নিয়ে রোজই তোমাদের মধ্যে ভাগাভাগি ঠেলাঠেলি লেগেই আছে। এর চেয়ে হাঁড়ি আলাদা করে নিলেই হয়।'

বাসন্তী বললেন, 'তোমার মনের ইচ্ছেটা তো তাই দাদা।'

বৈদ্যনাথ বললেন, 'কেবল আমার মনের কেন, সকলের মনেরই সেই ইচ্ছে। শুধু আমার মুখ দিয়ে বার করানোটা ছিল তোদের মতলব। বেশ দিলুম বের করে। আমি অত ঢাক-ঢাক গুর-গুর পছন্দ করিনে। আমি সোজা কথার মানুষ। এক হাঁড়িতে বনিবনাও হচ্ছে না। বেশ, হাঁড়িটা আলাদা করে নাও, তাতে লজ্জা কিসের। এ তো আর দুই ভাই নয়, ভাই বোন। দু'জনের দুই আলাদা সংসার। একসঙ্গে জোর করে মেশাতে গেলে মিশবে কেন।'

অবনীমোহনকেও বৈদ্যনাথ সেইকথা বুঝিয়ে বললেন, 'তুমি আমাকে সংকীর্ণচেতা মনে করতে পারো।'

অবনীমোহন বাধা দিয়ে বললেন, 'না না সে কি কথা।'

বৈদ্যনাথ বললেন, 'আমি একটা প্রিন্সিপল্ নিয়ে চলি। আমার প্রিন্সিপল্ হচ্ছে শান্তিতে থাকা। দেখা যাচ্ছে, আমরা যেভাবে আছি তাতে শান্তি থাকছে না। ঝগড়াঝাঁটি লেগেই আছে। মেয়েদের রান্নাবান্নার ব্যবস্থা আলাদা করে না দিলে এ ঝগড়া মিটবে না। মাঝখান থেকে বিরোধ আরো বেড়ে যাবে।'

অবনীমোহন একটু হাসলেন, 'শুধু রান্নার হাঁড়ি-উনোন আলাদা করলেই কি সব ঝগড়া মিটবে?'

বৈদ্যনাথ বললেন, 'অনেকখানি মিটবে। অন্তত রোজ এমন গোলমাল বাঁধবে না।'

তাই হোল। খুব বেশি যে ঝগড়া-ঝাঁটি হোল তা নয়। দুই ভাই আলাদা হতে গেলে যে হাঙ্গামা লাগে, রাগ দুঃখ ভাবাবেগের পালা উল্টোপাল্টা চলতে থাকে, এ ক্ষেত্রে তা হোল না। তাঁদের পক্ষে স্বতন্ত্র থাকাটাই স্বাভাবিক, একথা দুই পরিবারের সকলেই বুঝতে পেরেছেন। পাঁচ বছর আগেও তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় পৃথকান্নে ছিলেন। এখনও তাই থাকবেন, এতে অস্বাভাবিকতার কি আছে।

অবস্থাটা সকলেই শান্তভাবে মেনে নিলেন। কারো মনে খুব যে বেশি আঘাত লেগেছে তা মনে হোল না শুধু ছটফট্ করতে লাগলেন ভুবনময়ী, 'এ তোরা কি করলি, কি সর্বনাশ করলি।'

বৈদ্যনাথ বললেন, 'তুমি থামোতো মা। সর্বনাশ সর্বনাশ কোরো না। তোমার বুদ্ধিতেই সর্বনাশ হচ্ছিল। দুনিয়াভর যা চলছে, তার উল্টোটা করতে গেলে চলবে কেন।'

রান্নাঘরখানা বেশ বড়। পশ্চিম দিকে আর একটা নতুন উনোন পাতা হোল।

একটু দূরে দূরে ঘরের দুই প্রান্তে বসে বাসন্তী আর কনকলতা দু'জনেই রান্না চড়ালেন। ঠিক প্রথমেই পরস্পরের দিকে কেউ তাকাতে পারলেন না। কেমন যেন লজ্জা লজ্জা লাগে। মাঝখানে একটা দেয়াল থাকলে যেন ভালো হোত। অন্ততপক্ষে একটা পর্দা।

খানিক বাদে বিরাট স্থূল দেহ নিয়ে ভুবনময়ী এসে বঁটি পেতে মাঝখানে বসলেন। ভুবনময়ী বললেন, 'দাও, কার কি কুটতে কাটতে হবে কুটে দিচ্ছি। সাধ যখন হয়েছে আলাদা খাবে খাও। খেয়ে দেখ কি মজা।'

আলাদা আলাদা থালা নিয়ে দু'জনেরই তরকারি কুটে দিলেন ভুবনময়ী।

চার বছরের দৌহিত্রী প্রীতি এসে বলল, 'দিদা, তুমি কাদের ভাগে? আমাদের না?'

ছ' বছরের পৌত্র বিজু বলল, 'ঈস্ আমাদের। না ঠামা? তাই না?'

ভুবনময়ী বঁটি ফেলে দু'জনকেই কোলে টেনে নিলেন, 'হ্যাঁ, এবার তোরা আমাকে কেটে ভাগ করে নে। তাই তো এখন বাকি আছে।'

কিন্তু ভুবনময়ীকে তখনকার মত ভাগ করা হোল না। তিনি গোটাই রইলেন সাধ্যমত দুই পরিবারেরই কাজ করেন। ছেলে আর মেয়ে দু'জনেরই ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা তাঁর কাছে শোয়। পৌত্র-পৌত্রী-দৌহিত্র-দৌহিত্রী সবারই তিনি পরিচর্যা করেন। ছেলে আর জামাই দু'জনেরই খাওয়ার সময় গিয়ে বসেন সামনে। নিজের রান্না নিরামিষ তরকারি বাটিতে করে দু'জনের সামনেই এগিয়ে দেন।

ভুবনময়ী ছাড়া এই দুই পৃথক পরিবারে আরো কিছু জিনিস এজমালি রইল, এখনো আছে। বৈঠকখানা নামে বৈদ্যনাথের হলেও এজমালি ঘর হিসাবেই সেখানার ব্যবহার চলে। দুই পরিবারেরই আসবাবপত্র এ ঘরে আছে। বৈদ্যনাথের আছে দেয়াল-ঘড়ি আর তক্তাপোশ, অনীমোহনদের আছে খানকয়েক চেয়ার। দু'জনেরই বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন এখানে এসে বসেন। দু'জনেরই বয়স্ক ছেলেদের কেউ কেউ রাত্রে এ ঘরে এসে শোয়। একখানা বাংলা কাগজ রাখেন বৈদ্যনাথ, একখানা ইংরেজি দৈনিক রাখেন অবনী-মোহন। একই হকার দু'খানা কাগজ একসঙ্গে ফেলে দিয়ে যায়। বাংলা কাগজখানা দুই পরিবারের মেয়েরাই পড়েন, ইংরেজিখানায় দুই পরিবারের মেয়েরাই চোখ বুলোন। বাইরে চিঠির বাক্সও একটাই রয়েছে। দুই পরিবারের চিঠিই এই একই বাক্সে পিওন রেখে দিয়ে যায়।

ছাদের ঘরখানা অবনীমোহনের নামে থাকলেও সেখানে খানিকটা অলিখিত এজমালি স্বত্ব আছে বৈদ্যনাথের। তাঁর শ্বশুর কি শালা এলে এ ঘরে শুতে দেওয়া হয়। পরীক্ষার সময় তাঁর ছেলেমেয়েরাও এই নির্জন ঘরে এসে আশ্রয় নেয়। কিন্তু অরুণ বাড়ি এলে কেউ আর সে ঘরে ঢুকতে পারে না।

কনকলতা স্বামীকে বললেন, 'তেতলার ঘরে আমাদের যদি একেবারেই কোন অধিকার না থাকে, তাহলে একতলার বৈঠকখানার ঘরও তো—'

বৈদ্যনাথ স্ত্রীকে ধমক দিলেন, 'বেশি বাড়াবাড়ি করো না। তুমি কি বলতে চাও বৈঠকখানা ঘরে আমি ওদের যাওয়া বন্ধ করব? ওরা ছোট হতে পেরেছে বলে পাল্লা দিয়ে আমিও ছোট হব? সব কিছুরই একটা সীমা আছে।'

ধমক খেয়ে কনকলতা চুপ করে রইলেন।

বৈঠকখানা ঘরের মালিকানা নিয়ে কনকলতা আর কোন কথা বললেন না। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে শুধু বললেন, 'আমার তো নিজের ঘর দোর কিছু নেই এ বাড়িতে, আমার ঘরে বাইরের বাজে লোক এসে থাকলেও মুখ ফুটে আমার কিছু বলবার জো নেই। এ বাড়িতে আছি এই পর্যন্ত।'

বাস, আর কিছু বলতে হোল না। এতেই সব টের পেলেন বাসন্তী। দীর্ঘকাল একসঙ্গে বাস করে শুধু মুখের দিকে তাকালেই একজন আর একজনের মনের ভাব টের পান। মুখের কথা শোনার জন্যে অপেক্ষা করতে হয় না।

কনকলতার মনের ভাব টের পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাসন্তী চলে এলেন বাইরের ঘরে। মণীন্দ্র ছুটি নিয়ে দেশে গেছে। সে অবনীমোহনের অফিসের বেয়ারা আর বাড়ির বাজার সরকার। অফিস থেকে কোন-রকমে কয়েকদিন ছুটি জোগাড় করতে পারলেই সে অবনীমোহনের কাছ থেকেও ছুটি নিয়ে দেশে চলে যায়। ছোট ভাইয়ের অভিভাবকত্বে এখনো তার বউ আর ছেলেমেয়েরা পাকিস্থানে গাঁয়ের বাড়িতেই

রয়েছে। মণীন্দ্র নিজে কলকাতায় থাকে। মন পড়ে থাকে দেশে। এবার ছুটি পেয়ে অসুস্থ দেহ নিয়েও সেখানে ছুটেছে।

এ ঘরে জোড়া তক্তাপোশের একখানায় থাকে এখন অতুল আর এক-খানায় শোয় বিজু, আর বিনু—ওর দুই মামাত ভাই। তারা অনেক আগেই উঠে গেছে। প্রাত্যহিক অভ্যাসমত আজও অনেক বেলায় ঘুম ভেঙেছে অতুলের। উঠে সে কেবল বিছানা গুটিয়ে রাখছে বাসন্তী এসে দাঁড়ালেন, 'তোর বিছানা আর এখানে রেখে দরকার নেই। ওপরে নিয়ে যা।'

অতুল মার দিকে তাকাল, 'কি যে বল তার ঠিক নেই। ওপরে কোথায় রাখব।'

বাসন্তী বললেন, 'তোর দাদার ঘরে। আজ থেকে সেখানেই শুবি তুই।'

অতুল বলল, 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে মা? অতটুকু ঘরে একসঙ্গে শোয়া যায়?'

বাসন্তী বললেন, 'বাড়িতে আর জায়গা না থাকলে কি করবি।'

অতুল বলল, 'কেন এ ঘরে তো যথেষ্ট জায়গা আছে। এ ঘরের কি দোষ হোল?'

বাসন্তী গম্ভীরভাবে বললেন, 'না এ ঘরে তোদের আর থাকা চলবে না।'

অতুল মুহূর্তকাল মার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর মুচকে হেসে বলল, 'ফের বুঝি তোমাদের ভাই-বোনের মধ্যে শরিকী বিবাদ শুরু হয়েছে? তোমাদের জ্বালায় আর পারলাম না মা। তা ভাই-বোনে যত খুশি ঝগড়াঝাঁটি কর, কেউ তো বাধা দিচ্ছে না। আমাকে নিয়ে টানাটানি কেন বাবা। আমাকে এখান থেকে কেউ নড়াতে পারবে না। তোমার দাদা ত দাদা, তোমার মরা বাপ যদি চিতে থেকে উঠে আসে তারও সাধ্য নেই আমাকে বেদখল করে। ভূতে মানুষে এক হাত লড়ব, তারপরে যা হয় কিছু একটা সেটেলড্ হবে।'

মনে এত অশান্তি সত্ত্বেও ছেলের কথায় বাসন্তী না হেসে পারলেন না। হাসি চেপে বললেন, 'বাঁদর কোথাকার, আমার বাবা পুণ্যাত্মা ছিলেন। তিনি মরে স্বর্গে গেছেন, তিনি কেন ভূত হতে যাবেন, ভূত তো তুই নিজে।'

অতুল বলল, 'আমি তো ভূতই। সেইজন্যেই তো তোমাদের মত মানুষের সঙ্গে আমার বনে না।'

বাসন্তী বললেন, 'হ্যাঁ যত দোষ তো আমাদেরই। জোয়ান ছেলে। পড়াশুনো করলিনে, চাকরি বাকরির চেষ্টা দেখলিনে। পাড়াময় কেবল হৈ হৈ করে বেড়াবি। হ্যাঁরে এমনি করেই কি দিন যাবে? এই তো দাদার চাকরিটি গেল, কাকা যা করে তাতে তাদের নিজেদেরই কুলোয় না। সমস্ত ভার ওই একজন মানুষের ঘাড়ে। সংসারের জন্যে একটুও ভাবনা হয় না তোর?'

অতুল বলল, 'ভেবে কি করব।'

বাসন্তী বললেন, 'তা তো ঠিকই। বাড়ির সঙ্গে তোর কেবল খাওয়া আর শোওয়ার সম্পর্ক। আর তো কোন সম্পর্ক নেই। সারাদিনের মধ্যে তোর টিকিটিও দেখা যাবে না। রাত্রেও ফিরবি সেই বারোটা একটায়। কাল কখন ফিরেছিলি?'

অতুল বলল, 'সে খবরে তোমার দরকার কি?'

বাসন্তী বললেন, 'তা তো ঠিকই। সে খবরে আমার দরকার কিসের। আমি মা। তোমার চলা-ফেরার খবর আমি রাখব না, রাখবে পাড়া-পড়শী। তারাই তো রাখছে। তাদের কাছ থেকেই তো সব খবর কানে আসছে আমার। শোন অতুল, আজ থেকে তুমি ওপরে না শোও আমার ঘরে গিয়ে শোবে। আর সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে বাড়ি ফিরবে। অত রাত করতে পারবে না। কথা যদি না শোন অনর্থ হবে আমি বলে দিলুম।'

থলিতে করে নিজেদের বাজার নিয়ে বৈদ্যনাথ এসে ঢুকলেন। অন্দরে যাওয়ার পথ এই ঘরের ভিতর দিয়েই। দাদাকে দেখে বাসন্তী

তাড়াতাড়ি পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ালেন। কেউ কোন কথা বললেন না।
'বেগুন কত করে আনলেন মামা?'
অতুল একপাশে দাঁড়িয়ে পরম নিরীহভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল।
কিন্তু বৈদ্যনাথ একথার কোন জবাব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করলেন না। তিনি সোজা ভিতরে চলে গেলেন।
অতুল পিছন থেকে অস্ফুটস্বরে বলল, 'তোমার দাদার মুখ একেবারে—' বাকি কথাটুকু মুখে না বলে দুই হাতের ভঙ্গিতে একটি হাঁড়ির আকার মাকে দেখাল অতুল।
বাসন্তী হাসি চেপে বললেন, 'বাঁদর কোথাকার। তোর না মামা, গুরুজন না তোর!'
অতুল বলল, 'তাতে কি। তোমার না দাদা, গুরুজন না তোমার? আমি না হয় হাত দিয়ে ও'র হাঁড়ি-মুখের নকল করেছি। আর তুমি? তুমি তো নিজের মুখখানা শুদ্ধ হাঁড়ি বানিয়ে ও'কে ভ্যাংচাচ্ছ।'
অতুল এবার বিছানাটাকে গুটিয়ে জায়গামত রেখে দিল। তারপর হাত-মুখ ধোয়ার জন্যে চলে গেল ভিতরে।
বাসন্তী পিছন থেকে ওর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে নিজের মনেই আর একবার বললেন, 'বাঁদর।'
হাত মুখ ধুয়ে রান্নাঘরে ঢুকে অতুল হাঁক দিল, 'এই প্রীতি আমার জন্যে চা টা কিছু রেখেছিস না কি? রেখে থাকলে দে।'
কেটলীতে চা করাই ছিল, প্রীতি তার থেকে এক কাপ চা আর ছোট বাটিতে করে এক বাটি মুড়ি এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এই নাও দাদা।'
অতুল চায়ে চুমুক দিয়েই বলল, 'ঈস্ একেবারে সরবৎ করে রেখেছিস।'
প্রীতি অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'খুব জুড়িয়ে গেছে বুঝি? দাও আর একবার গরম করে দিচ্ছি।'
অতুল মাথা নেড়ে বলল, 'দিয়েছিস এই ঢের। আমার ওপর যা তোদের দরদ আর ভক্তি শ্রদ্ধা সবই আমার জানা আছে।'
বলে অতুল চা আর মুড়ির বাটি শেষ ক'রে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

ভুবনময়ী সদর দরজায় ওর পথ আটকে ধরলেন, 'বেরুচ্ছিস বুঝি।'
অতুল বলল, 'হ্যাঁ।'
ভুবনময়ী বললেন, 'সারা শহর ভরে তো টই টই করে ঘুরিস। সুবিমল যে চলে গেল তার একবার খোঁজ খবর নিবিনে তোরা।'
অতুল শুনিনে শুনিনে করে বেরিয়ে গেল।

শুধু অতুলকেই নয়, যার সঙ্গে দেখা হোল ভুবনময়ী তাকেই বললেন, 'তোমরা সুবিমলের কেউ একটা কোন খোঁজ করলে না? এটা কি উচিত হচ্ছে শত হলেও এ বাড়ির জামাই তো সে?'
বৈদ্যনাথকে ডেকে বললেন, 'হ্যাঁরে বৈদ্য, আর কারো না পুড়ুক, তোর তো পোড়ে, তুই এমন গা ছেড়ে দিয়ে বসে আছিস কেন? বেরিয়ে দেখ একটু চেষ্টা চরিত্র করে।'
বৈদ্যনাথ বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আঃ, তুমি একটু চুপ করো তো মা। যা করবার করা যাবে তুমি একটু থামো।'
ভুবনময়ী বললেন, 'আমি তো চুপ করেই আছি। কিন্তু কথা না বললেও চলে না দেখছি। তোমরা একটা না একটা অনাসৃষ্টি বাঁধাবেই বাঁধাবে।'
বৈদ্যনাথ বললেন, 'তুমি কথা বললেই কি অনাসৃষ্টি সব আটকে থাকবে?'
নিচ থেকে শ্যালক আর শাশুড়ীর আলাপ শুনে নিয়ে অবনীমোহন স্ত্রীকে ডেকে বললেন, 'শোন।'
বাসন্তী রান্নাঘরে যাচ্ছিলেন, স্বামীর ডাকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'কি বলছ।'
অবনীমোহন বললেন, 'সুবিমলের একটা খোঁজখবর করা সত্যিই তোমার উচিত ছিল।'
বাসন্তী রেগে উঠে বললেন, 'আমার উচিত ছিল? কেন সুবিমল কি আমার জন্যেই চলে গেছে? বাড়ি থেকে আমি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি

বলতে চাও। সংসারে আমার দোষ ছাড়া কি আর কারো দোষই চোখে পড়ে না?'

জামা কাপড় পরে অরুণ পাড়ায় বন্ধুবান্ধবদের খোঁজ খবর নিতে যাচ্ছিল, মা বাপের ঝগড়া শুনে থেকে দাঁড়িয়ে বলল, 'কি হয়েছে মা, আজ আবার কি চেঁচামেচি শুরু হোল তোমাদের।'

বাসন্তী বললেন, 'তোমরা তো কেবল আমার গলা, আমার চেঁচামেচিই শোন, সংসারে আর তো কেউ কোন কথাও বলে না, আর কারো কোন দোষও নেই।'

অরুণ বলল, 'হয়েছে কি শুনি।'

বাসন্তী বললেন, 'হবে আমার কি, সুবিমলকে আমি যেতে বলেছি, আমি তাড়িয়ে দিয়েছি। সব দোষ হল আমার। ঘরের লোকে যদি মিথ্যে এমন বদনাম দেয় নান্তু, বাইরের লোকে কি ভাবে বল তো। রাতদিন কথায় কথায় এই যন্ত্রণা আমার আর সয় না, তোরা এখন বাড়ি ঘরে এসেছিস, আমার একটা ব্যবস্থা টাবস্থা কর, আমি চলে যাই, উনি থাকুন ওঁর সংসার নিয়ে।'

অরুণ বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'মাকে মিছামিছি দোষ দিচ্ছেন কেন। সুবিমলবাবু নিজের ইচ্ছাতেই চলে গেছেন।'

অবনীমোহন শান্তভাবে বললেন, 'কেন যে গেছে তা সবাই জানে। কিন্তু গেছে এই কথাটা জেনেই কি তোমরা চুপ করে থাকবে? তাকে খুঁজে আনতে হবে না, তার কাছে একবার যেতে হবে না?'

অরুণ বলল, 'কি করে যাব। তিনি তো শুনেছি কাউকেই ঠিকানা দিয়ে যাননি।'

অবনীমোহন ভাববাচ্যে বললেন, 'ইচ্ছে থাকলে সবই করা যায়। কলকাতায় তার অন্য যে সব আত্মীয়-স্বজন আছে তাঁদের বাড়িতে গিয়ে খোঁজ করতে হয়। ইচ্ছে থাকলে কি একজন লোককে কলকাতা শহরে খুঁজে বের করা যায় না?'

বাসন্তী বললেন, 'হ্যাঁ, অন্য কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে চাকরি বাকরির চেষ্টা

না করে দিন রাত গুণ্টিশুদ্ধু লোক এখন তাকে খুঁজে বেড়াক, তাহলেই সকলের পেট ভরবে। তা ছাড়া সে কি আমাদের কথায় আসবে? আসতই যদি তাহলে অমন সামান্য কথায় চলে যেত না। সেধে ভজে যারা আনতে পারবে তারা গেলেই পারে। তারা গা ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ বসে বসে মজা দেখছে আর আমরা এদিকে মরছি ঝগড়া করে। আচ্ছা জ্বালা হয়েছে আমার।'

অরুণ মুহূর্তকাল চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। মায়ের এতখানি সঙ্কীর্ণতা যেমন সহ্য করা যায় না, বাবার অর্থহীন ঔদার্যও তেমন অসহনীয় মনে হয় অরুণের। বাবার মধ্যে কোথায় যেন একটা বাড়াবাড়ি আছে। পারিবারিক ছোট ছোট বিষয়গুলিকে তিনি বড় করে দেখেন, সেইজন্যেই বড় বিষয়গুলি ও'র চোখে পড়ে না। বাবা একান্ত করে পারিবারিক মানুষ হয়ে পড়েছেন। সুবিমল যদি চলে গিয়েই থাকে তা নিয়ে অত মাথা ঘামাবার কি আছে? সত্যিই তো এ বাড়িতে জায়গা হচ্ছে না, নানারকম অসুবিধে হচ্ছে, এ অবস্থায় শ্বশুর বাড়িতে পড়ে থাকা তার পক্ষেও তো তেমন মর্যাদাকর নয়। এই সব নানা দিক ভেবেই সে গেছে। কিন্তু বাবা সেসব মোটেই যেন ভাবতে চাইছেন না। তাঁর দুর্ভাবনা পাছে তাঁর শালা আর শালাবউ তাঁকে অনুদার সঙ্কীর্ণচিত্ত মনে করে। যার যেখানে দুর্বলতা, মনে মনে একটু হাসল অরুণ। তারপর নিজের কাজে বেরিয়ে গেল।

অবনীমোহন ব্যাপারটাকে অন্য দিক থেকে ভেবে দেখছিলেন। এইসব ছোট ছোট উপলক্ষেই মানুষের হৃদয়কে চেনা যায়। এ ধরনের ছোট-খাট পরিবারের মধ্যে যাদের চিত্ত উদার নয়, বৃহৎ পরিধিতেও তারা ছোটই থেকে যায়। ঝোঁকের মাথায় হয়ত এক একটা বড় বড় কাজ তারা করে ফেলে, কিন্তু তাতে তারা সত্যি বড় হয় না। ঝোঁকটা সরে গেলেই তাদের মহত্ত্ব ছেঁড়া বেলুনের মত চুপসে ছোট হয়ে যায়। জোয়ারের জল সরে যাওয়ার পর পাঁকটা তখন আরো বেশি করে চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সকলের ভাগ্যে তো মহত্ত্বর ক্ষেত্র জোটে

না। অল্পপরিসর চার দেয়াল ঘেরা পারিবারিক গণ্ডির মধ্যেই বেশির ভাগ জীবন কেটে যায়। তাই দৈনন্দিন পারিবারিক জীবনকে ছোট বলে তুচ্ছ করা চলে না। এরই মধ্যে মহত্ত্বের, বৃহত্ত্বের অনুশীলন করতে হয়।

অবনীমোহন তক্তাপোশ থেকে নামলেন, নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে আস্তে আস্তে ঢুকলেন বৈদ্যনাথের ঘরে। বাজার থেকে এসে বৈদ্যনাথ জমাখরচের খাতায় হিসাবটা সঙ্গে সঙ্গে লিখে ফেলেছিলেন আর পাশে দাঁড়ানো স্ত্রীকে খরচ কমাবার জন্য উপদেশ দিচ্ছিলেন। অবনী-মোহনকে দেখে দুজনেই একবার তাকালেন কিন্তু কেউ হঠাৎ কোন কথা বললেন না।

অবনীমোহন একটুকাল চুপ করে থেকে কনকলতার সঙ্গেই প্রথম কথা আরম্ভ করলেন, 'কি খুব ব্যস্ত নাকি?'

কনকলতা বললেন, 'না ব্যস্ত আর কি, বসুন।'

একখানা চেয়ার দেখিয়ে দিলেন কনকলতা।

অবনীমোহন একটু রসিকতা করে বললেন, 'তবু ভালো যে ভদ্রতা করে বসতে বললেন। আমি তো ভেবেছিলাম ঘরে ঢুকতেই দেবেন না, যা ঝগড়াঝাঁটি আপনাদের মধ্যে চলেছে আজকাল। বিপক্ষ শিবিরে ঢুকতেই ভয় হচ্ছিল।'

কনকলতাও একটু হাসলেন, 'আপনার সঙ্গে তো আর ঝগড়া হয়নি, তাছাড়া আপনি তো দূত, অবধ্য। বিপক্ষ শিবিরে আপনার ভয় কিসের?'

অবনীমোহন এলে, পরিহাস করে কথা বললে যত ঝগড়াঝাঁটিই থাকুক কনকলতা আজকালও হেসেই জবাব দেন, পরিহাসের সুরটা বজায় রাখতে চেষ্টা করেন। অবশ্য সব সময় যে প্রসন্নমনে করেন তা নয়, তবু অবনীমোহনের মত মানুষের সঙ্গে ভদ্রতাটা বজায় না রাখলে চলে না।

পরিহাস ছেড়ে এবার আসল কথায় এলেন অবনীমোহন, 'আচ্ছা,

সুবিমলের ঠিকানাটা কি, ওর একবার খোঁজ করতে হয় না? বাড়িশুদ্ধ সবাই যদি আপনারা এমন পাগল হয়ে ওঠেন, তাহলে চলে কি করে। ওর ঠিকানাটা বলুন, আর কেউ না যায়, ছুটির পর আমি গিয়ে ওর খোঁজ নিয়ে আসব।'

কনকলতার মুখ এবার গম্ভীর হোল, বললেন, 'ঠিকানা তো সে কাউকে জানিয়ে যায়নি। তাছাড়া অত হাঙ্গামায় আর দরকারই বা কি।'

খরচটা যোগ দিয়ে খাতা বন্ধ করলেন বৈদ্যনাথ, তারপর গামছা কাঁধে নিচে নেমে যেতে যেতে বললেন, 'হ্যাঁ, ওসব হাঙ্গামায় আর দরকার নেই অবনী। যে গেছে তাকে যেতে দাও। এখানে তো সে আর স্থায়ীভাবে থাকবার জন্যে আসেনি। চাকরি বাকরি পেলে দু'দিন পরে তো চলে যেত, না পেলেও যেত, না হয় দু'দিন আগেই গেছে।'

অবনীমোহন বললেন, 'তবু এভাবে যাওয়াটা তো মোটেই ভাল দেখায় না।'

এ কথার আর কোন উত্তর দিলেন না বৈদ্যনাথ, তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গেলেন তাঁর অপিসের বেলা হয়ে গেছে। অবনীমোহন কনকলতাকেই আর একবার জিজ্ঞেস করলেন, 'সত্যিই তার ঠিকানা জানেন না আপনি। সুবিমল কোন আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি গিয়ে উঠল নাকি?'

কনকলতা অবনীমোহনের দিকে তাকালেন, 'যা শিক্ষা হয়েছে, তাতে ফের কোন আত্মীয়স্বজনের বাড়ি উঠবে বলে তো মনে হয় না।' বলে একটু হাসতে চেষ্টা করলেন কনকলতা, 'যাই রান্না রয়েছে উনুনে।' তারপর তিনিও বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। অবনীমোহন ভালমানুষ সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি ভাল বলে তাঁর সংসারের মন্দ জিনিসগুলি তো আর আটকে থাকে না। অন্যায় অবিচার যা হবার তা হয়ই।

দুজনে চলে যাওয়ার পরেও একটুকাল বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন অবনীমোহন। যে আশা নিয়ে তিনি এসেছিলেন, তা সফল হয়নি। তিনি এগিয়ে এসেছেন, কিন্তু ওরা এগিয়ে এল না। এত সহজে যেন ওরা বিরোধের মীমাংসা করতে চায় না, মনোমালিন্যটা জীইয়ে রাখাই যেন ওদের ইচ্ছা। মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণ হলেন অবনী, একটু যেন অপমানও বোধ করলেন। কিন্তু তার পরক্ষণেই মনে মনে ভাবলেন, না এও ঠিক হচ্ছে না, এভাবেও তিনি অন্যের ওপর অবিচারই করেছেন। ওরাই আঘাত পেয়েছে বেশি, দুঃখ পেয়েছে বেশি। রাগ অভিমান ওদেরই তো হবার কথা। একবারের চেষ্টায় ওদের মনের রাগ যদি না মেটে, অবনীমোহন ওদের দোষ দিতে পারেন না।

অবনীমোহন কোন কথা বললেন না। এতদিন তাঁরও তাই ধারণা ছিল, জোর করে লাভ নেই। জবরদস্তীতে ফল খারাপ হয় বেশি। নিজের স্ত্রী-পুত্র সম্বন্ধেও এই ধারণা নিয়ে চলেন অবনীমোহন। ছেলেমেয়েদের তিনি যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়েছেন। লেখাপড়ার জন্যে যতটুকু লক্ষ্য রাখবার রেখেছেন। বেশি জোর খাটাননি। স্বাভাবিকভাবে ওরা গড়ে উঠুক। যে যা হতে পারে, তাই হোক। কিন্তু সবাই আশানুরূপ হচ্ছে কই। খুঁটিনাটি নিয়ে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে বাসন্তীর কলহ লেগেই আছে। স্বামী পুত্রের গণ্ডিঘেরা ছোট সংসারের বাইরে সে একটি পা বেশি ফেলতে অনিচ্ছুক। বড় ছেলে এম এ পাশ করেছে, কিন্তু ভালো রকম চাকরি বাকরি কিছু জোটাতে পারেনি। সবচেয়ে ভাবনার কথা, সে একটু বেশি রকম আত্মপরায়ণ। সংসারের সকলের সম্বন্ধে তার মমত্ব কই, অবনী যেমনটি চান, ঠিক তেমনি ঔদার্য কই তার মনে। মেজো অতুলের তো পড়াশুনো কিছুই হোল না। দিনরাত আড্ডা আর বন্ধুবান্ধব নিয়েই আছে। অনেকের ধারণা, অবনীমোহনের ঔদাসীন্যেই এমন হয়েছে। বাজে কথা। যে যেমন হবার তেমন সে

হবেই। অবনীমোহন কি গোড়ার দিকে কম যত্ন নিয়েছে, কম লক্ষ্য রেখেছেন ওর ওপর। তবু হোল না, পড়াশুনোর দিকে ওর মন গেল না। ওর অবাধ্যতার জন্যে মাঝে মাঝে অবনীমোহনের ধৈর্যচ্যুতি হয়েছে। নিজের হাতে ওকে বেত মেরেছেন, বেঁধে আটকে রেখেছেন ঘরে, তার ফল আরও খারাপ হয়েছে। সব দেখে শুনে অবনীমোহন ওর নিজের মতিগতির উপরই ছেড়ে দিয়েছেন ওকে। আর জোর করবেন না। ও যা হতে চায়, ও যা হয়ে ওঠে, তাই হোক। কিন্তু তাতেও সমালোচনার হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। নিন্দাটা শুনতে হয়েছে বেশির ভাগ স্ত্রীর কাছ থেকে। বাসন্তী বহুদিন বলেছেন, 'তোমার জন্যেই এমন হোল, তোমার জন্যেই ও এমন বিগড়ে গেল, তুমি ওকে মোটে শাসন করবে না।'

অবনীমোহন বলেছেন, 'যখন শাসন করেছি, তখন তো তুমি ঠিক উল্টোটাই বলেছ।'

বাসন্তী জবাব দিয়েছেন, 'বলব বই কি। তোমার সবটাই বেশি বেশি। যখন শাসন করেছ, তখন শুধু শাসনই করেছ, আবার আজকাল একেবারে নির্বিকার, খোঁজ খবর তত্ত্বতালাসই করছ না। এইভাবে কি আর ছেলেপুলে মানুষ হয়? দেখ না দাদা কি করে।'

তা ঠিক। বৈদ্যনাথের মত সংসারকে অমন আঁটসাঁট করে বাঁধতে পারেনি অবনীমোহন। বৈদ্যনাথ প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন। তাদের শাসনও করেন, স্নেহও করেন। বাপকে ছেলেমেয়েরা ভয়ও করে, শ্রদ্ধাও করে। সব বিষয়েই বৈদ্যনাথের একটা পরিমিতি বোধ আছে। নিজের পছন্দ অপছন্দটাকে জোর গলায় তিনি জাহির করতে পারেন, নিজের রীতিনীতি আদর্শকে তিনি ঠিক জায়গা মত প্রয়োগ করতে পারেন। সেই আদর্শ, সেই পদ্ধতি অবনীমোহন হয়তো বিশ্বাস করেন না। কিন্তু তবু নিজের মতে পথে চলতে পেরে বৈদ্যনাথ তো মোটামুটি সুখেই আছেন। স্ত্রী কি ছেলেপুলে নিয়ে তাঁর কোনরকম অশান্তি আছে বলে তো মনে

হয় না। শুধু অবনীমোহনেরই যেন নিজের ওপর তেমন আস্থা নেই, সুখী হবার মত জোর নেই মনের।

শুধু কি স্ত্রী-পুত্র সম্বন্ধে, নিজের ভাই সম্পর্কেও অবনী-মোহনের চিত্ত এমনি দ্বিধাগ্রস্ত। মৃগাঙ্ক তার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। তবু বাবা মারা যাওয়ার পর ছেলেবেলা থেকে ভাইকে তিনি যথেষ্ট স্নেহ করেছেন, সব রকম স্বাধীনতা দিয়েছেন, কোনদিন তেমন কোন কড়া কথা বলেন নি, কিন্তু সেই কি তার আশা পূর্ণ করেছে? মৃগাঙ্ক অবশ্য সংসারী। কিন্তু সে ব্যাপকভাবে সমস্ত পরিবারটির কথা ভাবতে চায় না, ভাবতে পারে না। বাইরে তার নিজের খেয়াল আছে, বন্ধুবান্ধব আছে, আর ঘরে অবসর যাপনের জন্য আছে নিজের স্ত্রী-পুত্র। কোন সাংসারিক পরামর্শে সে আসে না, কোন চিন্তাভাবনার ভাগ নেয় না। মাস অন্তে মাইনের সামান্য ভগ্নাংশ দাদার হতে পেঁছে দিয়েই খালাস। তাতে কি হয়।

অবনীমোহন একদিন জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আর টাকা কি করলি।'

মৃগাঙ্ক জবাব দিয়েছিল, 'আগের দেনাটেনা আছে, তাই শোধ করতে হচ্ছে।'

অবনীমোহন আর কোন কথা বলেননি। কিন্তু বাসন্তী পীড়াপীড়ি করতে ছাড়েন না। 'নিজে তুমি মুখ ফুটে বল, এমন করলে চলে নাকি, যা দেয় তাতে তো ওদেরই হয় না।'

অবনীমোহন বলেছেন, 'ছিঃ চুপ কর। একান্নবর্তী পরিবারে ওদের আর আমাদের বলে আলাদা কিছু নেই, সবই আমাদের। যতদিন পারব, চালিয়ে যাব।'

বাসন্তী বলেছেন, 'চালাতে আর পারছ কই, দেনাদায়ে ক্রমেই তো তলিয়ে যাচ্ছ। ওদের এবার বুঝিয়ে বল।'

অবনীমোহন একটু চুপ করে থেকে শেষে বলেছেন, 'বলবার আর কি আছে। যখন বুঝবে তখন না বললেও বুঝবে। আর যদি বুঝতে

না চায় আমি হাজার বললেও কি বোঝাতে পারব। মিছামিছি অশান্তির সৃষ্টি করে লাভ কি।'

বাসন্তী রাগ করে পাশ ফিরে শুয়েছেন, 'বেশ থাকো তুমি তোমার শান্তি নিয়ে।'

কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন শান্তি মনের মধ্যে পাচ্ছেন কই অবনীমোহন। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে এ-ও ঠিক হচ্ছে না, ও-ও ঠিক হচ্ছে না। ঠিক মত চলছেন না তিনি, ঠিকমত কর্তব্য পালন করছেন না। ছোটদের কর্তব্য নির্দেশও তাঁর কর্তব্য। ওদের একবার বলতে হবে। কিন্তু বলতে গিয়ে বলতে পারেননি অবনীমোহন, পিছিয়ে এসেছেন। যদি ওরা ভুল বোঝে, যদি ওরা তাকে ছোট মনে করে, কিংবা যদি তিনি সত্যিই ছোট হয়ে যান। একে তো এই ছোট পারিবারিক গণ্ডির মধ্যে আটকে আছেন। হৃদয়ের পরিধিকে আরো ছোট করলে বাঁচবেন কি করে।

'বাবা, অফিসের বেলা হল না আপনার? নাইতে যাচ্ছেন না যে!'

মেয়ের দিকে চোখ তুলে তাকালেন অবনীমোহন।

ভিজে চুলের রাশ পিঠময় ছড়ানো। পরণে হালকা চাঁপা রঙের শাড়ি। চমৎকার মানিয়েছে প্রীতিকে।

প্রীতি আবার বলল, 'তেল গামছা কি ওপরে এনে দেব?'

অবনীমোহন বললেন, 'না না আমিই নিচে যাচ্ছি চল।'

'অণিমা কইরে?'

'নিচে আছে। ডেকে দেব বাবা?'

অবনীমোহন বললেন, 'হ্যাঁ, আমি বেরুবার আগে আমার সঙ্গে যেন একবার দেখা করে। বলিস ওকে।'

খেয়ে দেয়ে সাদা খদ্দরের জামার পকেটে পানের ডিবেটা ভরে অবনীমোহন ঘর থেকে বেরুতে যাচ্ছেন অণিমা এসে নতমুখে দাঁড়াল, 'আমাকে ডেকেছেন পিসেমশাই?'

অবনীমোহন বলেন, 'হ্যাঁ', তারপর মৃদু একটু হাসলেন, 'বলতো কেন ডেকেছি।'

অণিমা বলল, 'বাঃ রে তা আমি কি করে বলব।'

অবনীমোহন বললেন, 'আচ্ছা তবে আমিই বলি। সুবিমলের ঠিকানাটা আমাকে দিয়ে দাও তো মা।'

অণিমা মুখ নিচু করে বলল, 'ঠিকানাটা তো দিয়ে যায়নি।'

অবনীমোহন বললেন, 'এই বুঝি, আমার কাছে বুঝি মিথ্যে কথা বলতে হয়! তাহলে কিন্তু এরপর থেকে কোন দিন আর মা বলব না, মাসী বলব।'

অণিমা বলল, 'কিন্তু সবাইকে জানাতে যে বারণ করেছে!'

অবনীমোহন বললেন, 'আমি তার মধ্যে নিশ্চয়ই বাদ আছি। ভয় নেই; ঠিকানাটা বলে ফেল। তোমার বাবা মা কেউ নেই ধারে কাছে।'

অণিমা মৃদু হেসে বলল, 'থাকলই বা।'

তারপর এদিকে ওদিকে তাকিয়ে সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের মেসের ঠিকানাটা দিয়ে দিল পিসেমশাইকে।

সন্ধ্যার পর আবার এসে অবনীমোহন গোপনে সাক্ষাৎ করলেন অণিমার সঙ্গে, বললেন, 'বাবাজীর ক্ষমতা আছে। মেসে একটি সীট সত্যিই ভাড়া করে নিয়েছে এরই মধ্যে। একটা চাকরির কথাবার্তাও নাকি চলছে। নিমন্ত্রণ করে এসেছি। রবিবার আসবে। আমার ওপর নাকি তার মোটেই রাগ নেই।'

অণিমা খুশি হয়ে বলল, 'নেই-ই তো। আপনাকে সে সব চেয়ে ভালোবাসে।'

'বল কি! সব চেয়ে!'

জামাটা খুলতে খুলতে মৃদু হাসলেন অবনীমোহন। অকর্তব্যের গ্লানি থেকে এতক্ষণে তিনি মুক্ত হতে পেরেছেন।

মাসখানেক বন্ধুমহলে ঘোরাঘুরি করেই কাটল অরুণের। সবাই

বলল, 'এসো এসো। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছ ভালোই হয়েছে। ওসব দিল্লী টিল্লী কি আমাদের পোষায়? এত জায়গা তো ঘুরলে, কিন্তু এমন কি কোথাও চোখে পড়েছে?'
অরুণকে স্বীকার করতে হোল তা পড়েনি। কিন্তু দু'বছর আগে ছেড়ে যাওয়া কলকাতার সঙ্গে এই কলকাতার যেন অনেক তফাৎ হয়ে গেছে। সে প্রভেদটা যতখানি মনে মনে টের পাওয়া যায়, ততটা অবশ্য চোখে দেখা যায় না। আবাল্যের পরিচিত এই পরিবেশের যেন ভিতরে ভিতরে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বাইরের দিক থেকে সে পরিবর্তন সামান্য। কোন বন্ধুর বিয়ে হয়েছে, কোন বিবাহিত বন্ধু হয়েছে সন্তানের জনক, কোন বেকার বন্ধু চাকরি পেয়েছে, কারো বা উন্নতি হয়েছে চাকরিতে। প্রায় প্রত্যেকের সঙ্গেই দেখা সাক্ষাৎ আলাপ টালাপ হোল, কেউ কেউ বাড়িতে ডেকে চা খাওয়াল, তাদের মা বোন কি স্ত্রী দু' একটা কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু ওই পর্যন্তই। আগের মত অন্তরঙ্গ সুর কারো আলাপ ব্যবহারেই ধরা পড়ল না। কিছুতে যেন এই বন্ধুব্যূহের ভিতরে গিয়ে ঢুকতে পারল না অরুণ। নিতান্তই বাইরের ঘরের অভ্যাগতের মত রয়ে গেল। অরুণ মনে মনে ভাবল একি বন্ধুচক্রেরই দোষ না তার নিজেরই অক্ষমতা। চাকরি না থাকায় নিজের মনের হীনতাবোধই তার পরিচিত মহলের মধ্যে এমন ব্যবধানের সৃষ্টি করেছে। তার চাকরি না থাকায় পরিবারের যত অসুবিধা তেমন তো আর কারোরই নয়। তবু অন্য পরিবারের লোকজন মৌখিক সহানুভূতি জানাতে ছাড়ে না, 'কি অরুণ কোন সুবিধে টুবিধে হোল? আর যা দিনকাল পড়েছে চাকরি বাকরির যা ব্যাপার, তাতে সুবিধে সুযোগ হবেই বা কি করে?'
অনুকম্পায় একটু কোমল শোনায় তাদের গলা। অরুণের ভারি অসহ্য লাগে। ইতিমধ্যে চাকরির জন্যে চেষ্টা-চরিত্রও শুরু করতে হয়েছে। ওয়ানটেড কলমের বিজ্ঞাপন দেখে দেখে আবেদন ছেড়েছে

কয়েকটা। দেখা-সাক্ষাৎ করেছে সরকারী বেসরকারী দু'একজন পদস্থ ব্যক্তির সঙ্গে। সকলেই মৌখিক আশ্বাস দিয়েছেন অরুণের জন্যে তাঁরা অবশ্যই চেষ্টা করবেন। কিন্তু চেষ্টার ফল এখন পর্যন্ত জানা যায়নি। অবশ্য এত অল্পেই অসহিষ্ণু হয়ে লাভ নেই। দ্বিতীয়বার তাগিদ দেয়ার সময় পর্যন্ত আসেনি। কিন্তু পারিবারিক অবস্থা সবুর করবার মত নয়। দারিদ্র্যটা ক্রমেই তার চোখের সামনে উদ্ঘাটিত হয়ে উঠছে। বাবা অবশ্য মুখ ফুটে কিছু বলেন না। কাকারাও প্রায় নির্বিকার। শুধু মা-ই মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করেন 'হ্যাঁরে, কোন ইন্টারভিউ-টিউর কলও পেলিনে?'

অরুণ বলে, 'না।'

'বাসন্তী একটুকাল চুপ করে থাকেন।' তারপর আস্তে আস্তে নিজের কাজে চলে যান।

পরিবারের খাওয়া-পরার কৃচ্ছ্রতাও ক্রমেই বেশ পরিস্ফুট হয়ে উঠছে। তেতলার চিলে-কোঠায় থেকেও একতালার চেঁচামেচি মাঝে মাঝে ভেসে আসে অরুণের।

ছোট ভাই রঙ্কু অনুনাসিক সুরে আবদার তুলেছে, 'আজ আমি মুড়ি খাব না মা। রোজ রোজ বাসি মুড়ি খাব নাকি আমি?'

বাসন্তী ধমক দেন, 'মুড়ি খাবি না, কি খাবি? কোন্ রাজভোগ তৈরী হয়েছে তোর জন্যে?'

রঙ্কু বলে, 'আমি বিস্কুট খাব। বড়দার মত আমিও চা আর বিস্কুট খাব মা।'

চিলেকোঠার ঘরে অরুণের জন্যে প্রীতি চায়ের কাপ আর দু'খানা বিস্কুট নিয়ে এসেছিল। বাড়ির বড় ছেলে বলে বেকার হলেও এই সম্মান আর মর্যাদাটুকু তার এখনও আছে। মুড়ি অরুণ পছন্দ করে না, খেতে পারে না। তাই চায়ের সঙ্গে কোনদিন বা দু'খানা বিস্কুট কোনদিন বা এক চিলতে পাঁউরুটি তার বরাদ্দে জোটে।

কিন্তু আজ বিস্কুট দু'খানা হাতে নিল না অরুণ, শুধু চায়ের কাপটি নিয়ে বলল, বিস্কুট তুই নিয়ে যা প্রীতি। আমার দরকার নেই।'

প্রীতি বলল, 'তুমি বুঝি রঞ্জুর কথা শুনে অমন করছ দাদা? রঞ্জুর ওই রকমই স্বভাব। খাওয়া নিয়ে ভারি কোন্দল করে। বিস্কুট দু'খানা নাও তুমি। সকালবেলা খালিপেটে চা খাওয়া তো ভালো না।'

অরুণ বিরক্ত হয়ে বলল, 'আঃ, কেন মিছিমিছি বক বক করছিস। বলছি যে খাব না। কথা গ্রাহ্য হচ্ছে না, না?'

প্রীতি আর কোন কথা না বলে চলে গেল। অরুণ মনে মনে লজ্জিত হোল। সত্যি ওকে অমন করে এই সকালবেলায় বকুনি না দিলেই হোত। ওর কি দোষ। মেজাজটা আজকাল তার বড়ই খিটখিটে হয়ে গেছে। কিন্তু এত অল্পেই অধীর হলে চলবে কেন। বেকার-জীবনের এই তো সবে শুরু। এর পর দুরবস্থা যখন আরো বাড়বে, তখন করবে কি?

তবু এই পারিবারিক পরিবেশ আর ভালো লাগছে না। এরই মধ্যে সব কিছু দুঃসহ হয়ে উঠছে। কোথাও বেরিয়ে পড়তে পারলে যেন বাঁচে।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আলনা থেকে পাঞ্জাবীটা পেড়ে গায়ে চড়াল অরুণ। তারপর স্যাণ্ডেল পায়ে বেরিয়ে পড়ল।

খানিকটা এগুতেই গলির মোড়ে অতুল আর গোবিন্দের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল অরুণের। দুজনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে আর গল্প করছে।

গোবিন্দ অতুলেরই সমবয়সী। বছর বাইশ তেইশ হবে বয়স। তবে অতুলের মত অমন স্বাস্থ্যবান নয়। ফর্সা, বেঁটেখাট চেহারা। দীর্ঘকায় বন্ধুর সঙ্গে কথা বলবার জন্যে গোবিন্দকে বার বার ঊর্ধ্বমুখ হতে হচ্ছিল।

অরুণ একটু দূর থেকে ওদের দুজনের দিকে ভ্রূ-কুঁচকে তাকাল। তারপর ভাইকে ডেকে বলল, 'অতুল, এদিকে আয়, শোন একবার।' গোবিন্দ অরুণের সামনেই আজকাল সিগারেট খায়, কিন্তু দাদাকে দেখে অতুল হাতের সিগারেটটা একটু আড়াল করে বলল, 'কি বলছ এইখানেই বল না।'

অরুণ বলল, 'না, এখানে বলা যাবে না। তুই আয় আমার সঙ্গে।' গোবিন্দ নিরীহভাবে বন্ধুকে সুপরামর্শ দিয়ে বলল, 'যা না অতুল, অরুণদার যখন বিশেষ দরকারী কথা আছে শুনে আয় না। আমিও যাচ্ছি এবার। পরে দেখা হবে।'

গোবিন্দ চলে গেলে অতুল ফের জিজ্ঞেস করল, 'কি বলছ?'

অরুণ বলল, 'চল কোন একটা জায়গায় গিয়ে বসি। চা খাবি?'

অতুল বলল, 'না, কি বলছিলে বল। আমার অন্য কাজ আছে।'

অরুণ এবার অসহিষ্ণু হয়ে বলল, 'কাজের মধ্যে তো দিনরাত কেবল আড্ডা দেওয়া। আর কি কাজ আছে তোর?'

অতুল স্থির দৃষ্টিতে দাদার দিকে একটুকাল তাকিয়ে রইল তারপর রাগ চেপে মুখে একটু হাসি টেনেই বলল, 'তাতে কার কি এসে যায়। তুমি তোমার বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে বেড়াও। আমি আমার বন্ধুদের কাছে যাই।'

বছর দুয়েকের বড় এই দাদাকে ছেলেবেলা থেকেই অতুল তেমন আমল দেয়নি। বাড়ির অন্য সকলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে অরুণও যখন তাকে শাসন করতে এসেছে অতুল ভারি অপমান বোধ করেছে। না হয় রাতদিন তোতাপাখীর মত বই মুখস্থ করে গোটা কয়েক পাশই করেছে, কিন্তু তাই বলে এমনকি অধিকার হয়ে গেছে ওর যে অতুলকে শাসন করতে আসবে? ওই তো চেহারা, ওই তো শক্তি সামর্থ্য। এক ঘুঁষি দিলে আর এক ঘুঁষির জায়গা যার দেহে নেই তার আবার অত বড়াই, আর দাদাগিরি ফলানো কেন। আগে আগে অতুলের এই ছিল মনোভাব। ভাবকে মাঝে মাঝে ভাষাতেও যে প্রকাশ না করেছে

তা নয়। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অতুলের প্রকাশভঙ্গি আজকাল কিছু কিছু বদলেছে। এখন সে সব সময় সবাইকে সোজাসুজি গালাগালি দেয় না, ঘুরিয়ে বাঁকিয়ে শ্লেষ ব্যঙ্গও করে। অরুণ একটুকাল চুপ করে থেকে বলল, 'আমি কি করছি না করছি তা তোর দেখতে আসতে হবে না।'

অতুল বলল, 'কেবল আমি কি করছি না করছি তাই বুঝি তুমি দেখে বেড়াবে? তুমি আমার পিছনে গোয়েন্দাগিরি করে বেড়াবে আর আমি কিছু বলতে গেলেই বুঝি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়?'

অরুণ মুহূর্তকাল জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ছোট ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সরে এল সেখান থেকে।

গলি থেকে বেড়িয়ে ঘুরতে ঘুরতে শ্রদ্ধানন্দ পার্কের ভিতরে ঢুকে পড়ল অরুণ। এই গাছপালা তৃণগুল্মহীন পার্কটি ছেলেবেলা থেকেই অরুণের খুব প্রিয়। স্কুল-কলেজের পরীক্ষার শেষে কত সকাল-সন্ধ্যা এই পার্কে তার কেটেছে। অতুল এখানে ব্যায়াম করেছে, কসরৎ দেখিয়েছে, অরুণ নিজের সহপাঠী বন্ধুকে নিয়ে একটি বেঞ্চ দখল করে তার সঙ্গে একটা গল্প করে চলেছে। সদ্য-পঠিত উপন্যাসের আলোচনা থেকে শুরু করে দর্শন, রাজনীতি কিছুই বাদ থাকেনি। সেসব বন্ধুরা এখন এখানে সেখানে ছিটকে পড়েছে। যারা কাছাকাছি আছে, তাদের সঙ্গে মনের যোগ নেই। এই মুহূর্তে হঠাৎ নিজেকে ভারি নিঃসহায় নির্বান্ধব মনে হোল অরুণের। পার্কটার উত্তর থেকে দক্ষিণে পায়চারী করতে করতে ভাবল অতুলের চালচলন নিয়ে কোন কথা বলতে না যাওয়াই তার উচিত ছিল। ওর সঙ্গে রক্তেরই সম্পর্ক আছে, আর কোন সম্পর্ক তো তার নেই। প্রাপ্তবয়সে ভাই বন্ধুর স্থান নেয়। সে হয় সুহৃদ। পরস্পরের মধ্যে সেই সৌহার্দ্যই যদি না জন্মাল, তাহলে রক্তের সম্বন্ধের দাবীটা খুব বেশিদিন টিকে থাকতে পারে না। অতুল যে শুধু কম লেখাপড়া জানে, তাই নয়, অল্প বিদ্যার জন্যে লজ্জা, সঙ্কোচ, বিনয়ের বালাইও

তার নেই। আর অরুণকে ছেলেবেলা থেকেই সে ঈর্ষা করে। অল্পবয়সে পিঠাপিঠি দুই ভাইয়ের মধ্যে হিংসা থাকাটা এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু বয়স বাড়ার পরেও সেই বিদ্বেষ ভাবটা অতুলের মোটেই কমেনি। শিক্ষিত বিদ্বান ছেলে হিসাবে পরিবারে, পাড়ায় অরুণের সম্মান বেশি, আদর-যত্ন বেশি, এটা অতুল এখনও ভালভাবে নিতে পারে না। তার ধারণা অরুণ অনেক জিনিস ফাঁকি দিয়ে আদায় করে। তার ধারণা, অরুণ অনেক বেশি পায় বলেই অতুল তার ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হয়। এই ধারণা যাতে ভাঙে, তার জন্যে অরুণ কম চেষ্টা করেনি। ছোট ভাইয়ের সঙ্গে মাঝে মাঝে ভালো ব্যবহারও সে করে দেখেছে। মাঝে মাঝে নিজের অল্প দিন ব্যবহার করা জামা-জুতো উপহার দিতে গেছে ভাইকে, কিন্তু অতুল কিছুতেই তা নেয়নি। পাড়ার বন্ধুদের কাছ থেকে চেয়ে আনা ছেঁড়া জামা আর পুরানো র‍্যাপারও তাকে গায়ে দিয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেছে, তবু অরুণের দেওয়া জিনিস সে ছোঁয়নি। মুখের ওপর বলেছে, 'ওসব কলেজী পোশাক আমার গায়ে মানাবে না দাদা ও তুমি নিজেই পর।'

অতুলের এই ব্যবহারে অরুণের মনও ক্রমে বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠেছে। তবু দিল্লী থেকে দু-একবার ভাইকে অরুণ চিঠি লিখেছিল। অতুল জবাব দেয়নি। ছুটি-ছাটায় বাড়ি এসে অরুণ জিজ্ঞেস করেছিল, 'আমার চিঠির জবাব দিলিনে যে।'

অতুল পরিষ্কার বলেছে, 'ওসব চিঠিপত্র আমার আসে না।' 'অত কাব্য করতেই যদি জানব, তাহলে তো তোমার মতই হতাম।'

না, তার কোন দাক্ষিণ্যকেই অতুল গ্রহণ করেনি। তাকে সে বাদ দিয়ে দিয়েই চলেছে। চলুক। ও যদি চলতে পারে, অরুণই বা পারবে না কেন? তাছাড়া সত্যি বলতে কি, ছোট ভাইয়ের সম্বন্ধে কর্তব্য-বোধই যা এক-আধটু আছে, মমত্ব বোধ তেমন নেই। অরুণকে অতুল যদি আমলই না দেয়, তার বিদ্যাবুদ্ধির গৌরবকে যদি স্বীকার না

করে, তাহলে অরুণই বা কি করে তাকে ভালবাসবে? মা এখনও মাঝে মাঝে বলেন, 'ছোট ভাইটাকে দেখিস ওকে ফেলে দিসনে নান্তু। হাজার হলেও তোরই তো ভাই।'

কিন্তু সেকথা কি কেবল একজনের মনে রাখলে চলে? দুজনেরই মনে রাখতে হয়।

সারাটি দিন বড় বিশ্রীভাবে কাটল অরুণের। খাওয়া দাওয়ার পর একটা গল্পের বই নিয়ে পড়তে চেষ্টা করল। মন লাগল না। খানিকক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকবার পর হঠাৎ এক সময় বেরিয়ে পড়ল। বিকেলের দিকে মনে হোল শাঁখারীপাড়া লেনের সেই ট্যুইশানের বিজ্ঞাপনের কথা। আজকের সকালের কাগজেই বিজ্ঞাপনটি দেখেছে অরুণ। ট্যুইশান এম এ পড়তে পড়তে দু একটা করেছে। চাকরি জোটবার আগেও করে দেখেছে কয়েকবার। কিন্তু এখন এই বয়সে ছাত্র পড়ানো কি ফের পোষাবে? তাও আবার স্কুলের ছাত্র। কেচে গণ্ডুষ করা কি ভালো লাগবে? কিন্তু ভালো না লাগলেও একটা কিছু না জোটালে আর চলবে না অরুণের। অন্তত নিজের হাত খরচা চালাবার জন্যেও কিছু একটা চাই। দিল্লী থেকে আসবার পর রাহা খরচ বাদে যা সামান্য দু চার টাকা ছিল তা নিঃশেষ হয়ে গেছে। এখন নিজের খরচের জন্যে মা কি কাকার কাছে হাতপাতা ছাড়া আর জো থাকবে না, তবু সে না হয় লজ্জাসরম ত্যাগ করে চাইল, হাত পাতলো কিন্তু সংসারের যা অবস্থা তাতে অন্য খরচ কুলিয়ে তার হাতে যে বাড়তি দু চারটে পয়সা পড়বে তেমন সম্ভাবনাই বা কই।

নম্বর মিলিয়ে মিলিয়ে কোল্যাপসিবল গেটওয়ালা একটি বড় দোতলা বাড়ির সামনে অরুণ যখন এসে থামল তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে আলো জ্বলে উঠেছে ভিতরে বাইরে; দরজাটা খোলাই ছিল। ঠেলে ঢুকে পড়ল অরুণ। ফতুয়া গায়ে ষাট পঁয়ষট্টি বছরের পাকাচুলওয়ালা এক

বৃদ্ধ উঠানের লনে অস্থিরভাবে পায়চারি করছিলেন, অরুণকে দেখে এগিয়ে এলেন, 'কি চাই আপনার?'

অরুণ বলল, 'আপনারাই কি টিউটরের জন্যে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন?'

ভদ্রলোক বললেন, 'হ্যাঁ, মশাই হ্যাঁ। দিয়ে ঝকমারী করেছিলাম। সকালে বিকালে এই নিয়ে জন বার তের হোল। যত সব বাজে টাইপের লোক। ছেলে পড়াবে কি নিজেদেরই জ্ঞানগম্যি কিছু নেই। যাকগে, আপনি পড়াতে চান নাকি?

অরুণ বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

ভদ্রলোক বললেন, 'আপনার নিজের পড়াশুনো কতদূর?'

অরুণ বলল, 'আজ্ঞে এম এ পাশ করেছি।'

ভদ্রলোক বললেন, 'কোন সাবজেকটে?'

'বাঙলায়!'

ভদ্রলোকের কথার ভঙ্গিতে নৈরাশ্য ব্যঞ্জিত হোল 'বাঙলায়! বাঙলা দিয়ে কি করব? আমার দরকার যে ইংরেজী আর অঙ্কের। ফার্স্ট-ক্লাসের ছেলেকে ইংরেজী অঙ্ক কষাতে পারবেন?'

অরুণ বলল, 'তা পারব না কেন? ইংরেজী অঙ্ক তো আমদেরও শিখতে হয়েছে।'

ভদ্রলোক অরুণের সর্বাঙ্গে একবার চোখ বুলিয়ে কি দেখে নিলেন তারপর বললেন, 'তা অবশ্য হয়েছে। আচ্ছা আসুন, ভিতরে আসুন আলাপ করি আপনার সঙ্গে।'

সোফা কৌচে সাজানো বড়লোকের ড্রয়িং রুম। গদি আঁটা একটা চেয়ার দেখিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'বসুন। দেখুন, এসব টিউটর-ঠরের হাতে ছেলে মানুষ হয় না। আমরা নিজেরা যখন পড়েছি কোন টিউটরের দরকার হয় নি। আজকাল হচ্ছে। কিন্তু হয়ে লাভ হচ্ছে কি? ও সব টিউটর-ফিউটর কিছুই লাগত না। নিজের ছেলেকে নিজেই পড়াতে পারতাম। কিন্তু দিনরাত রুগীপত্রই ঘাঁটব,

পেটের অন্নই জোগাব না ওই বাঁদরটার পিছনে টোটো করে বেড়াব বলুন তো?'
অরুণ বলল, 'তা তো ঠিকই। এইজন্যেই তো টিউটর রাখা পছন্দ না করলেও রাখতে হয়।'
ভদ্রলোক বললেন, 'ঠিক বলেছেন। পছন্দ না করলেও নিজের প্রিন্সিপলের বিরুদ্ধে গিয়েও অনেক জিনিস করতে হয় সংসারে। ছেলের মা দিনরাত যদি কানের কাছে টিউটর রাখ, টিউটর রাখ করে, তা হলে কে না রেখে পারে মশাই।'
অরুণ বলল, 'সেক্ষেত্রে অবশ্য টিউটর রাখাটাই নিরাপদ। স্ত্রীর কারটেন লেকচার শুনতে হয় না।'
ভদ্রলোক অরুণের দিকে তাকালেন, 'আপনার তো বেশ রসবোধ আছে। নিজে বিয়ে থা করেছেন?'
অরুণ বললে, 'আজ্ঞে না।'
ভদ্রলোক বললেন, 'বিয়ে করলে বুঝতেন ও লেকচারের বিষয়বস্তু নিত্য নতুন, একবার শুরু হলে ওর আর শেষ নেই। আচ্ছা, আপনি ছাত্রকে আমার সামনে একটু পড়ান তো দেখি। বেশি নয় দু চার মিনিট। পড়াবার ধরন দেখলেই আমি বুঝতে পারব। এই শঙ্কর! শঙ্কর এদিকে আয়তো আর একবার।'
কিন্তু ডাকাডাকি করেও শঙ্করের পাত্তা পাওয়া গেল না। চাকর এসে খবর দিল, 'ছোটবাবুকে বাড়িতে দেখা যাচ্ছে না তিনি বোধ হয় পিছনের দোর দিয়ে বেরিয়ে গেছেন।'
ভদ্রলোক বললেন, 'দেখুন, কাণ্ড দেখুন ছেলের। এর জন্যে টিউটর রেখে কোন লাভ আছে? আমি সামনে বসে আর পিছন দিয়ে ও কিনা পালিয়ে গেল। সাহসটা দেখুন একবার।'
ভদ্রলোক ফের অরুণের দিকে তাকালেন, 'থাকগে। ধরে নিচ্ছি আপনি ইংরেজী অঙ্ক দুই-ই পড়াতে পারবেন, কত দিতে হবে আপনাকে।'
অরুণ বলল, 'সে আপনি বিবেচনা করে দেখবেন।'

ভদ্রলোক বললেন, 'উ'হ্ন, কেবল একপক্ষের বিবেচনার কাজ তো নয়। আপনিও বিবেচনা করে বলুন।'

অরুণ একটু চিন্তা করে বলল, 'সব সাবজেক্ট পড়াতে হলে অন্তত টাকা চল্লিশেকের কমে হয় কি করে?'.

ভদ্রলোক যেন আকাশ থেকে পড়লেন, 'চল্লিশ টাকা সোজা কথা নাকি? চল্লিশ টাকা আপনাকে দিলে আমি খাব কি? উ'হ্ন অত পারব না। টাকা কুড়ির বেশি আমি কিছুতেই দিতে পারব না। আপনি আসুন তাহলে।'

অরুণ ভাবল কিছু কম-টম করে বললেও হোত। কিন্তু কুড়ি টাকায় সেই বা রাজি হয় কি করে। ট্রাম বাসের খরচ বাদ দিয়ে তা'হলে তার কিই বা থাকে। অরুণ বেরিয়ে আসছিল, ভদ্রলোক বললেন, 'আপনার ঠিকানাটা রেখে যান।'

'ঠিকানা রেখে আর কি হবে।'

'রেখে তো যান। ঠিকানা সবাই দিয়ে গেছেন। আপনিও ইচ্ছে করলে রেখে যেতে পারেন।'

অরুণ নিঃশব্দে একটুকরো কাগজে নিজের ঠিকানা লিখে দিয়ে ভদ্রলোককে নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে এল।

খানিকটা এগুতে হঠাৎ মনে পড়ল করবীর সঙ্গে দেখা করে গেলে কেমন হয়। এদিকে তো তার আসা হয় না, আজ যদি এসেছে একবার দেখা করলে ক্ষতি কি। চাকরি গেছে সেকথা গোপন করলেই হবে; বলবে ছেড়ে দিয়ে এসেছে। টুইশানের উমেদার হয়ে এ-পাড়ায় এসেছিল, তা না বললেই হবে। বলবে অন্য দরকার ছিল। বলবে বন্ধু হিরণ্ময়ের খবর নিতে এসেছে। দিল্লী থেকে এসে অবধি তার কোন খোঁজখবর পায়নি অরুণ, চিঠি দিয়ে জবাব পায়নি। আজ দিনটা বড়ই খারাপ হয়ে গেছে। সারাদিন ভরে চলেছে ক্লান্তি মনান্তর ব্যর্থতা নৈরাশ্যের পালা। এমন দিনে যদি একটি সুন্দরী সৌভাগ্যবতী

তরুণীর হাতে স্বাদ-গন্ধ-সৌরভময় এক কাপ চা জুটেই যায় অরুণের কপালে মন্দ কি। দিল্লীতে থাকতে করবী অনেক চা করে খাইয়েছে। দূরে কোন জায়গায় বেড়াতে যাওয়ার সময় ফ্লাস্কে করে নিয়ে গেছে চা। মেয়েটি ভারি বিলাসী। খেতে আর খাওয়াতে দুই-ই ভালবাসে।
নম্বরটা মনে ছিল। খুঁজে খুঁজে একটু ভিতরের দিকে ছোট একটি একতলা বাড়ির সামনে এসে অরুণ দাঁড়াল। কড়া নাড়বার আগে মনে পড়ল করবীর স্বামীর কথা। দিল্লীতে যখন গিয়েছিল স্বামী সঙ্গে যায়নি। তাঁর বর্ণনা দিয়ে করবী বলেছে ভদ্রলোক বড় অমিশুক, আলাপে অপটু। তার মানে নিশ্চয়ই লোকজন তেমন পছন্দ করেন না। এতদিন বাদে দিল্লীর সেই আলাপের সূত্র ধরে এক অপরিচিত যুবক তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে দেখে তিনি মনে মনে কি ভাববেন কে জানে। হয়তো ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করবেন, 'কি চাই।' অরুণ হিরণ্ময়ের প্রসঙ্গ তুললে দু' এক কথায় জবাব সেরে বিদায় নমস্কার জানাবেন, এমনও হতে পারে। এক কাপ চায়ের সঙ্গে এ ধরনের একরাশ আশঙ্কাও জড়িয়ে আছে। অরুণ একটু ইতস্তত করল কড়া না নেড়ে ফিরে যাবে কিনা। কিন্তু পরক্ষণেই অরুণ মত বদলে ফেলল। যা ভাগ্যে আছে হবে। কড়ায় যখন হাত দিয়েছে নাড়াও দেবে।
অরুণ আর দেরি করল না। আস্তে আস্তে বার দুই কড়া নাড়ল আর প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করতে লাগল একটি ভ্রূ-কুঞ্চিত গুরু-গম্ভীর পুরুষ মূর্তি কখন এসে দোর খুলে মুখ বাড়াবে।
কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করতে হোল অরুণকে। তার পরে আলো জ্বলল। খিল খোলার শব্দ হোল দরজার। অরুণ যা আশঙ্কা করেছিল, তা হয়নি। কোন অপরিচিত গৃহকর্তা তার সামনে এসে দাঁড়াননি। করবীই এসে দরজার পাল্লা খুলে ধরেছে।
'আপনি!'
অরুণ বলল, 'হ্যাঁ, আপনারা তো আর কোন খোঁজখবর নিলেন না।

আমিই এলাম শেষ পর্যন্ত খুঁজতে খুঁজতে। তারপর কেমন আছেন?'

করবী কোন জবাব না দিয়ে শুধু বলল, 'আসুন।'

অরুণ তার পিছনে পিছনে ভিতরে ঢুকল। ছোট্ট সরু প্যাসেজটুকু পার হতেই সামনে খানিকটা উঠান। উত্তর-পূব কোণে কল আর চৌবাচ্চা। সেখানে চৌদ্দ-পনর বছরের একটি ছেলে এঁটো হাত ধুচ্ছিল মুখ ফিরিয়ে প্রশ্ন করল, 'কে বউদি?'

করবী বলল, 'অরুণবাবু, আমার দাদার বন্ধু। আর এটি আমার দেওর দিলীপ। তোমার এরই মধ্যে খাওয়া হয়ে গেল দিলু? আর কিছু লাগল না?'

দিলীপ একবার ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'না বউদি।'

পশ্চিমের দিকে সারে সারে তিনখানা ঘর। বাঁ দিকের ঘরখানায় প্রথমে অরুণকে নিয়ে বসাল করবী। বেশ বোঝা যায়, মধ্যবিত্ত পরিবারের এটি একখানি ড্রয়িংরুম। দক্ষিণ দিকে একটি বইয়ের সেল্ফ। বেশির ভাগ বই-ই রবীন্দ্রনাথের। শান্তিনিকেতনের খান তিনেক বেতের চেয়ার-ঘেরা ছোট একটি টেবিল। দেয়ালে রবীন্দ্রনাথের বড় একখানা ফটো। ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তি আঁকা একখানি সুন্দর ক্যালেণ্ডার। তার নিচে কুলুঙ্গির মধ্যে ছোট একটি টাইম্‌পিস ঘড়ি। ছোট একটা টুলের ওপর বসানো রেডিও সেট। দু' দিকের দেয়ালের তিনটি জানলায় হাল্কা-নীল পর্দা টানা। উপকরণের কোন বাহুল্য নেই। কিন্তু প্রত্যেকটি জিনিসে আর তার রাখার ভঙ্গিতে বেশ একটি পরিচ্ছন্ন শোভন রুচির ছাপ আছে। অরুণ মনে মনে ভাবল, এমন একখানা ঘর যদি তার হোত। করবীর দিকে মুখ তুলে তাকাল অরুণ। বলল, 'বাঃ, ঘরখানা তো চমৎকার সাজিয়েছেন। তারপর খবর কি আপনার? কথাবার্তা বলছেন না যে? আপনার চেহারাও তো খুব খারাপ হয়ে গেছে। কোন অসুখ-বিসুখ করেছিল নাকি?'

করবী বলল, 'না'।

অরুণ বলল, 'তবে কি বাড়ির কর্তার ভয়ে এই বাক্‌সংযম? সত্যি আপনাকে দেখে যেন চেনাই যায় না।'

করবী কোন কথা বলল না।

অরুণ বলল, 'দেওরের সঙ্গে তো আলাপ করিয়ে দিলেন। এবার তার দাদাটিকে বার করুন। না কি, তাকে লুকিয়েই রাখবেন? পরেশবাবু কোথায়?'

করবী শান্তভাবে বলল, 'আপনি কি কিছুই জানেন না?'

'না।'

করবী বলল, 'তিনি আজ বাইশ দিন ধরে নেই।'

অরুণ বলল, 'কোথায় গেছেন?'

করবী বলল, 'মারা গেছেন।'

বলেই মুখ নিচু করল।

অরুণ বিস্মিত হয়ে শুধু বলতে পারল 'সে কি!'

মুহূর্তকাল দু'জনেই চুপ করে রইল। শান্ত স্তব্ধ ঘরখানায় শুধু ঘড়ির টিক টিক শব্দ শোনা যাচ্ছে। কেউ ঘড়িটাকে জোর করে বন্ধ করে দিলেই যেন ভালো হোত। অরুণ করবীর দিকে আর একবার তাকিয়ে নিল। সে তেমনি মুখখানা নিচু করে রয়েছে। মাথায় আঁচল নেই সিঁথি সিঁদুরহীন সাদা। কালো ফিতে পেড়ে একখানা শাড়ি পরনে। গলায় সরু এক চিলতে হার। হাতে দু'গাছা চুড়ি। আর কোন আভরণ নেই। সত্যি করবীর চেহারা এবং তার শুকনো মুখ দেখে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কথা আগেই অরুণের বোঝা উচিত ছিল। অনুমান করা উচিত ছিল তার দুরদৃষ্টকে, কিন্তু অরুণ তা পারেনি। মেয়েদের পোশাক পরিচ্ছদের দিকে ও বেশি তাকায় না। এসব ব্যাপারে ও ভারী অন্যমনস্ক। সারাদিন ধরে নানা অপ্রীতিকর ঘটনায় নিজের দুর্ভাগ্য নিয়ে অরুণ বিব্রত রয়েছে। কিন্তু করবীর যে দুর্ভাগ্য ঘটেছে তার সঙ্গে কিছুরই

তুলনা হয় না। এ শোকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা বৃথা। সহানুভূতি প্রকাশ নিরর্থক আনুষ্ঠানিক আচার মাত্র।

অরুণ সে চেষ্টা করল না, শুধু বলল, 'দাঁড়িয়ে রইলেন কেন। বসুন।' দাঁড়িয়ে থাকতে বোধ হয় করবীর নিজেরও কষ্ট হচ্ছিল। অরুণের সামনের বেতের চেয়ারটায় এবার ও বসে পড়ল।

ফের একটুকাল চুপ করে থাকবার পর অরুণ জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছিল ও'র?'

করবী বলল, 'ম্যালিগন্যাণ্ট ম্যালেরিয়া। দু'দিন মাত্র ভুগেছিলেন।' অরুণ ফের কি জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল দিলীপ এসে দাঁড়াল, 'বউদি। মা ডাকছেন তোমাকে। কে এসেছেন জিজ্ঞেস করছিলেন।'

অরুণ করবীর দিকে তাকাল। করবী বলল, 'আমার বিধবা শাশুড়ী ব্লাড প্রেসারে ভুগছেন। এই ঘটনার পরে একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছেন। কিন্তু কে এল গেল শুয়ে শুয়েই সব খবর রাখা চাই। আপনি কি যাবেন?'

করবী একটু ইতস্তত করল।

অরুণও মুহূর্তের জন্য দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে রইল। বাকপটু বলে বন্ধু মহলে তার খ্যাতি আছে। অল্প সময়ের মধ্যেই সে আলাপ জমাতে পারে। কিন্তু সদ্য পুত্রশোকাতুরা অপরিচিতা একটি মহিলার সঙ্গে সে কি আলাপ করবে। তবু তিনি যখন যেতেই বলছেন না যাওয়াটা ভালো দেখায় না, পালিয়ে যাওয়াটা অন্যায় হয়।

অরুণ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'চলুন।'

করবী তাকে সঙ্গে নিয়ে মাঝখানের ঘরটা বাদ দিয়ে সব চেয়ে শেষের ঘরখানার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে ডাকল, 'মা।'

ঘরের দু'দিকে দু'খানি তক্তাপোশ। তার একখানিতে পরেশের মা নিভাননী শুয়েছিলেন। অরুণদের দেখে তাড়াতাড়ি উঠে বসতে চেষ্টা করলেন।

করবী বলল, 'আপনি উঠছেন কেন শুয়েই থাকুন, দিলু ওঘর থেকে একখানা চেয়ার নিয়ে এসো তো।'
নিভাননী কিন্তু শুয়ে রইলেন না, উঠেই বসলেন। দিলু একটা চেয়ার এনে তাঁর বিছানার পাশে রাখল।
নিভাননী অরুণের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বোসো।' তারপর নিজেই একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন—
'কিছু মনে কোরো না। তুমি আমার ছেলের বয়সী। তুমিই বললাম তোমাকে।'

অরুণ বলল, 'তাতে কি।' নিভাননী তাকালেন তার দিকে, অরুণও একটুকাল চেয়ে রইল। পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ বছরের একটি বিধবা মহিলা।

একটু রোগাটে চেহারা। যৌবনে যে খুব সুন্দরী ছিলেন তা এখনো বোঝা যায়। সৌন্দর্যের সঙ্গে মুখভঙ্গিতে বেশ খানিকটা শিক্ষা আর ব্যক্তিত্বের ছাপও আছে বলে অরুণের মনে হোল।
নিভাননী বললেন, 'করবীর মুখে তোমার নাম এর আগেও শুনেছি। দিল্লীতে হিরন্ময়ের বাসায় বুঝি তোমাদের আলাপ হয়েছিল?'
অরুণ বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'
নিভাননী বললেন, 'দিল্লী থেকে কবে এসেছ। হিরন্ময়রা সব ভাল আছে?'
অরুণ বলল মাসখানেক আগেই সে এসেছে।
নিভাননী বললেন, 'এতদিনের ছুটি? আর হিরন্ময় তো এসে দু'দিনের বেশি রইল না।'
অরুণ বলল, 'ছুটি নয়। রিট্রেঞ্চমেণ্টে চাকরি গেছে।'
করবী বলল, 'চাকরি নেই আপনার?'
অরুণ তার দিকে চেয়ে বলল,—'না।'
প্রথমে ভেবেছিল এই চাকরি না থাকার কথাটা কি করেই বা বলবে। যদি এ প্রসঙ্গ না ওঠে তাহলে গোপনই করে যাবে কথাটা। কিন্তু

এখন অতি সহজেই বলে ফেলল। আর বলতে পেরে একটু যেন তৃপ্তিই বোধ করল অরুণ। করবী জানল দুর্ভাগ্য শুধু তার একারই ঘটেনি, অরুণও কিছুটা খারাপ অবস্থার মধ্যে পড়েছে। যদিও দুইয়ের মধ্যে মোটেই তুলনা হয় না, তবু অরুণ যে আগের মত সুখে নেই, বেকার জীবনের দুঃখ দুর্ভোগ ভোগ করছে তা করবীকে জানাতে পেরে খানিকটা স্বস্তিই যেন বোধ করল।

করবী বলল, 'টেলিগ্রাম পেয়েই দাদা চলে এসেছিলেন। আর কোন কথা জিজ্ঞেস করবার মত তখন অবস্থা ছিল না। মাত্র দুদিনই ছিলেন কলকাতায়।'

নিভাননী বললেন, 'হিরন্ময় নিয়ে যেতে চেয়েছিল করবীকে। আমিও বললাম যাও, ঘুরে এসো। কিন্তু এমন জেদী মেয়ে, কারো কথা শুনলো না।

করবী বলল, 'শুনলে কি পিপলুকে ছেড়ে আপনি থাকতে পারতেন? এই তো শ্যামবাজারে বাবার বাসায় গিয়ে দু'দিন ছিলাম তিনবার আপনি দিলুকে পাঠিয়েছেন খবর নিতে।'

একথার জবাব না দিয়ে নিভাননী বললেন, 'পিপলু কি না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ল না কি?'

করবী শাশুড়ীকে আশ্বাস দিয়ে বলল, 'না। খাইয়েই ঘুম পাড়িয়েছি। আপনি ভাববেন না। শুয়ে পড়ুন এবার।'

নিভাননী দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'না, আর ভাববার কি আছে আমার, সব ভাবনা চিন্তা তার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে গেছে। আমার সব শূন্য করে দিয়ে গেছে সে।' অরুণের দিকে ফিরে তাকালেন নিভাননী, 'এই শূন্যপুরীতে দিনরাত কি করে যে আমি কাটাব ভেবে পাইনে অরুণ। একবার ভাবি এখান থেকে বেরিয়ে কোথাও চলে যাই। কিন্তু যাব কি করে। সে আমার পায়ে শিকল পরিয়ে রেখে গেছে যে, শেল রেখে গেছে আমার সামনে। ওর এই মূর্তি চোখের ওপর আমি আর দেখতেও পারিনে আবার চোখের আড়াল করব

যে তারও জো নেই। যার জিনিস সে তো কত সহজে মায়া কাটিয়ে গেল অরুণ, কিন্তু আমি কাটাতে পারছি কই।'

এতক্ষণে নিভাননীর দুই চোখ জলে ভরে উঠল। আবেগে আটকে গেল গলা।

অরুণ বলল, 'আপনি এবার শোন। শুয়ে বিশ্রাম করুন।'

নিভাননী বললেন, 'আমি বিশ্রাম না করলে আর কে করবে।' আঁচল দিয়ে নিজের চোখের জল মুছলেন নিভাননী, তারপর বললেন, 'এসো মাঝে মাঝে। আমাদের আত্মীয় স্বজন বড় কেউ নেই। সময় পেলে এসে খোঁজখবর নিয়ো।'

অরুণ বলল, 'আসব বই কি। নিশ্চয়ই আসব।'

একটু বাদে নিভাননীর ঘর থেকে অরুণ আর করবী দু'জনেই বেরিয়ে এল।

দিলীপ চেয়ার দিয়েই সরে এসেছিল, ও ঘরে আর দাঁড়ায়নি।

অরুণ বলল, 'পিপলু ঘুমুচ্ছে বুঝি?'

করবী বলল, 'হ্যাঁ, এই ঘরে।' তারপর একটু ইতস্তত করে বলল, 'আসুন।'

ভেজানো দরজা ঠেলে মাঝখানের বড় ঘরটিতে দু'জনে ঢুকল। করবী-দের শোয়ার ঘর। পশ্চিমদিকের দেয়াল ঘেঁষে পাতা বেশ বড় একখানা খাট। এক পাশে ছোট্ট একটু কোলবালিশের ওপর পা তুলে দিয়ে বছর তিনেকের একটি সুন্দর স্বাস্থ্যবান ছেলে অঘোরে ঘুমুচ্ছে। শিয়রের কাছে দেয়ালে টাঙানো একটি যুবকের ফটো। অরুণ সেদিকে মুহূর্তকাল তাকিয়ে রইল। এ প্রতিকৃতি যে করবীর মৃত স্বামী পরেশের তা বলে দেওয়ার দরকার হোল না। অরুণ মনে মনে ভাবল বেশ সুপুরুষই ছিলেন ভদ্রলোক।

অরুণ বলল 'ফটো তো বেশ উঠেছে। কতদিন আগে তুলেছিলেন?'

করবী বলল, 'দু'বছর আগে। ওঁর জন্মদিনে তোলা হয়েছিল।'

ঘরের মাঝখানে বড় একটি কাঁচের আলমারি। ওপরের তাকে শৌখীন

জিনিসপত্র। নানারকম খেলনার মধ্যে শ্বেতপাথরের ছোট্ট একটি তাজমহলের প্রতিকৃতি। অরুণের মনে পড়ল মাস কয়েক আগে তিন দিনের ছুটি নিয়ে আগ্রায় যখন হিরন্ময় আর করবীর সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিল অরুণ, সে সময় সে-ই পছন্দ করে করবীকে কিনে দিয়েছিল জিনিসটি। করবী দাম সাধাসাধি করেছিল, অরুণ নেয়নি।

করবী বলেছিল, 'ও, আপনি উপহার দিচ্ছেন? সে কথা স্পষ্ট বললেই তো হয়। তার অত লুকোচুরির কি আছে? ভালোই হোল। এর পর সব সময় আপনাকে সঙ্গে করে দোকানে বেরোব। দেখি, আপনি কত উপহার দিয়ে উঠতে পারেন।'

এখন কিন্তু করবী সেই তাজমহলটার দিকে তাকাল না। একটু এগিয়ে পূব দিকের জানালা ঘেঁষে একটা টেবিলের ধারে গিয়ে বলল, 'এটা তাঁর লেখবার টেবিল।'

করবীর স্বামী যে কাস্টম অফিসের চাকরির ফাঁকে ফাঁকে নানা মাসিক সাপ্তাহিকে কবিতা আর প্রবন্ধ লিখত একথা দিল্লীতেই কথায় কথায় করবী অরুণকে বলেছিল। কিন্তু তার অনুপস্থিত স্বামীর সম্বন্ধে অরুণ তখন তেমন ঔৎসুক্য দেখায় নি। এখন আগ্রহের সঙ্গেই জিজ্ঞেস করল, 'তাই নাকি? ওঁর আগের লেখা টেখাগুলি সব আছে আপনার কাছে? বই টই কিছু বেরিয়েছিল?'

করবী জাব দিল, 'না, বেরোবার কথা হচ্ছিল। আর সময় হোল না।'

বলতে বলতে দু'জনেই টেবিলের ধারে এসে দাঁড়াল। করবীর নিজের হাতের এমব্রয়ডারি করা সুন্দর সাদা একখানি টেবিল ঢাকনি। ফটো স্ট্যাণ্ডে স্বামী-স্ত্রীর দু'খানি ফটো পাশাপাশি দাঁড় করানো। কালি-ভরা একটি পার্কার ফিফটি ওয়ান। এক পাশে সুদৃশ্য চামড়ায় বাঁধানো ফাইলে লিখবার কাগজ।

অরুণ বলল, 'সব সাজিয়ে রেখেছেন?'

করবী বলল, 'এই রকমই ছিল। আমি আর সরাইনি। মাঝে মাঝে মনে হয় লিখতে লিখতে উঠে গেছেন। ফের এসে বসবেন চেয়ারে।'

গদি আঁটা একখানা চেয়ার সামনেই পাতা ছিল। অরুণ লক্ষ্য করল সে চেয়ারে তাকে করবী বসতে বলল না। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ডাকল, 'দিলু, লক্ষ্মী ভাইটি, চেয়ারখানা ওঘর থেকে আর একবার এনে দাও তো।'
অরুণ ব্যস্ত হয়ে বলল, 'না না, আর চেয়ারে দরকার নেই। আমি এবার উঠব। রাত হয়েছে।'
করবী বলল, 'সে কি। একটু চাও খাবেন না?'
এতক্ষণে চায়ের কথা মনে পড়েছে করবীর। অরুণ বলল, 'না না। চা আজ থাক।'
করবী বলল, 'থাকবে কেন। আপনি বরং ওঘরে গিয়ে একটু বসুন, আমি এক্ষুণি চা করে আনছি। চা তো আপনি খুব ভালবাসেন খেতে।'
এত দুঃখ দুর্ভাগ্যের মধ্যেও করবী যে সেকথা মনে রেখেছে তা দেখে অরুণের বেশ একটু ভালো লাগল। আর কোন আপত্তি না করে বাইরের ঘরে একটা চেয়ারে বসে সে অপেক্ষা করতে লাগল।
একটু বাদে এক কাপ চা হাতে করবী এল ঘরে। বলল, 'নিন, শুধু চা-ই দিলাম।'

অরুণ বলল, 'শুধু চা-ই তো ভালো। কিন্তু আপনি নিলেন না যে।'
করবী বলল, 'আমি! আমি তো এ সময় চা খাইনে।'
অরুণ কোন কিছু না ভেবেই বলল, 'আগে তো খেতেন? আগে তো চায়ের বেলায় আপনার সময় অসময় ছিল না।'
করবী এ কথার কোন জবাব না দিয়ে একটুকাল চুপ করে থেকে অরুণকে বুঝিয়ে দিল আগের সঙ্গে এখনকার অবস্থার মোটেই আর মিল নেই।

একটু পরে করবী বলল, 'চা একদমই ছেড়ে দিয়েছিলাম। মা বকাবকি করতে লাগলেন। বললেন শরীর খারাপ করবে। তাই শুধু সকালে এক কাপ করে খাই। কিন্তু কোন স্বাদ পাইনে। আগে ঠিক সময়মত চায়ের কাপটি না হলে কি খারাপই না লাগত। কষ্ট হোত, মাথা ধরত

রীতিমত, আজকাল টেরও পাইনে। কেন এমন হয় বলতে পারেন?'
অরুণ চা শেষ করে কাপটি মাটিতে রাখতে যাচ্ছিল করবী তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে সেটি নিল। বলল, 'দিন আমার কাছে।'
অরুণ করবীর আগের কথার জবাবে বলল, 'দেখুন আজ পর্যন্ত কোন বড় রকমের শোকের অভিজ্ঞতা আমার হয়নি। কিন্তু আপনাকে দেখে জীবনে শোককে যেন আমি এই প্রথম প্রত্যক্ষ করলাম। আপনার মত চঞ্চল স্ফূর্তিবাজ ধরনের মেয়ে যে এমনভাবে বদলে যেতে পারে তা না দেখলে আমি বিশ্বাস করতুম না। কিন্তু এই শোকও তো আপনাকে কাটিয়ে উঠতে হবে, সংসারে আপনার অনেক কর্তব্য আছে, অনেক দায়িত্ব। আপনার সারা জীবন পড়ে আছে সামনে।'
'না না, অমন করে বলবেন না। আমি সে কথা, সারাজীবনের কথা ভাবতেও পারিনে। আমার আর কিছু নেই।'
করবীর চোখ সজল হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি সে অরুণের সামনে থেকে সরে গেল। প্রায় মিনিট দশেক কাটল সে আর ফিরে এল না।
অরুণ এবার আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল, ঘরের বাইরে এসে ডাকল, 'দিলীপ।'
দিলু এসে সামনে দাঁড়াল।
অরুণ বলল, 'তোমার বউদিকে বলো আমি চলে গেছি।'
দিলীপ বলল, 'বউদিকে ডেকে দেব?'
অরুণ বলল, 'না আর ডাকতে হবে না।'
দিলীপ সদর দরজা পর্যন্ত অরুণকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'আর একদিন আসবেন।'
অরুণ ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

ট্রামে পিছনের দিকে একটা নিরালা সীটে বসে সারাটা পথ অরুণ করবীর কথাই ভাবতে লাগল। স্বামীপুত্রে সৌভাগ্যবতী করবীকে দেখে একদিন সে মনে মনে ভেবেছিল মেয়েটির মধ্যে কোথায় যেন

একটু বেশি দেখানোপনা আছে। নিজের সম্পদভাগ্যে যেন বড় বেশি সুখী মেয়েটি, বেশি রকম পরিপূর্ণ। অতি পুষ্টাঙ্গী মেয়েকে যেমন অশোভন দেখায়, নিজের সুখ সম্বন্ধে অতি সচেতন মেয়েকেও তেমনি স্থূল মনে হয়। কিন্তু আজ শোকার্তা করবীকে দেখে অরুণের মনে হতে লাগল এর চেয়ে ওর সেই স্থূল সৌভাগ্যই বরং ভালো ছিল। ভালো ছিল ওর সুখানুভূতির আতিশয্য। পরণে চড়া রঙের শাড়ি সিঁথিতে পুরু সিঁদুরের দাগ, আর গা ভরা গয়না, এই রিক্ততার চেয়ে সেই সবই যেন বেশি মানিয়েছিল করবীকে। ওর উচ্ছলতা সয়ে গিয়েছিল কিন্তু শুষ্কতা শূন্যতা একেবারে দুঃসহ।

আজ পরেশের অনুপস্থিতিটা অরুণ মনে মনে কামনা করেছিল। কিন্তু এমন চিরকালের জন্য সংসার ছেড়ে যে চলে যাবে তাতো অরুণ ভাবেনি, চায়ওনি। পরেশ তো কেবল নিজেই সরে যায়নি, করবীকে ভিতরে ভিতরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। এতদিন আড়ালে থেকে পরেশই আলো ফেলছিল ওর মুখে। সেই আলো নিবে যাওয়ায় সব অন্ধকার হয়ে গেছে। করবীর সেই তনু সুন্দর দেহাধার তেমনি রয়েছে। কিন্তু রস নেই; রঙ নেই, প্রাণচাঞ্চল্য নেই, নদীর আকৃতি ঠিক তেমনই রয়েছে, শুধু পথে পথে বরফ হয়ে গেছে জল। না, অরুণ কোনদিন আর যাবে না করবীদের ওখানে। যেয়ে আর কি হবে।

কিন্তু পরক্ষণেই নিজের স্বার্থপরতার কথা ভেবে অরুণ লজ্জিত বোধ করল। ছিঃ একি ভাবছে সে। করবী তার সঙ্গে আজ হেসে কথা বলেনি, চটুল হাসি পরিহাসে যোগ দেয়নি, সেই জন্যেই নিজেকে সে বঞ্চিত মনে করছে, আর তারই ঘনিষ্ঠ পরিচিত বান্ধবীপ্রায় একটি মেয়ে যে চিরজীবনের জন্য বঞ্চিত হোল, সে কথা অরুণ একবার ভেবেও দেখছে না।

বেশ রাত হোল বাসায় ফিরতে। রান্না ঘরে ঠাঁই করে, ভাত বেড়ে দিতে দিতে বাসন্তী জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় ছিলি এতক্ষণ। কখনকার রান্নাভাত। যা গরম। নষ্ট হয়ে গেছে কিনা দেখ।'

অরুণ খেতে খেতে বলল, 'না, ঠিকই আছে। আজ একটি মেয়েকে দেখে বড় দুঃখ লাগল মা।'
বাসন্তী হাতায় করে ছেলের পাতে পাতলা ডাল তুলে দিতে দিতে বললেন, 'কেনরে। কোন মেয়েকে, কোথায় আবার দেখলি তুই।'
অরুণ করবীর পরিচয় দিয়ে স্বামীর মৃত্যুর পর তার অবস্থার কথা বর্ণনা করে বলল, 'মেয়েটি সম্পূর্ণ বদলে গেছে মা। মোটেই যেন আর চেনা যায় না।'
বাসন্তী সহানুভূতির সুরে বললেন, 'চেনা না যাওয়ারই তো কথা নান্তু। সিঁথির সিঁদুর মুছলে হিন্দুর মেয়ের আর থাকে কি। আহা বেচারা! ওই একটি বুঝি পোনা রেখে গেছে?'
অরুণ খেতে খেতে বলল, 'হ্যাঁ। ওই একটি ছেলে।'
বাসন্তী বললেন, 'এখন ওই সব আশা ভরসা। ওকে মানুষ করে তুলতে পারলে তবেই তো—ওকি আর একমুঠো ভাত নিলি নে নান্তু? এই পাখীর আহার খেয়ে তুই বাঁচবি কি করে, হ্যাঁরে।'
অরুণ হেসে বলল, 'এই সাতাশ বছর ধরে বেঁচে তো এলাম, আমি যদি এক-এক বেলায় একসের চালের ভাতও খাই, তাহলেও তো তোমার কাছে পাখীর আহারই থাকবে।'
বাসন্তী বললেন, 'হ্যাঁ, সেই ভাগ্যই করে এসেছি কিনা যে, রাশ রাশ ভাত তোমাদের সামনে ধরে দিতে পারব। কত কল কারসাজি করে যে রাত্রে এই ভাত ক'টি রাখি তোমার জন্যে তা শুধু আমিই জানি। রেশনে দু' বেলার যোগ্য চাল পাওয়া যায় না। কিছু কিছু ব্ল্যাক মার্কেটে কিনতে হয়। সব সপ্তাহে তা সম্ভব হয়ে ওঠে না, তাই রাত্রে একেবারে ছোট ছেলেমেয়ে ছাড়া সকলের জন্যেই রুটির ব্যবস্থা করতে হয় বাসন্তীকে। অরুণ রুটি খেতে পারে না। তাই ওর জন্যেও ভাতই রাখেন বাসন্তী। কথাটা অরুণের মনে পড়ে যাওয়ায় সে একটু অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে বলল, 'রোজ রোজ আমার জন্যে ভাত তোমাকে কে রাখতে বলে মা?

না রাখলেই পারো। আর পাঁচজনে যা খায়, আমিও তাই খাব।'
বাসন্তী কোন জবাব দিলেন না। শুধু মুখ টিপে একটু হাসলেন। আর পাঁচজনে যা পারে তাঁর নান্তু তা পারে না। সকলের ধাত তো আর সমান নয়। খাওয়া নিয়ে ছেলেবেলা থেকে এই ছেলে কি কম কেলেঙ্কারি করেছে. আজকাল আর তেমন কিছু করে না. কিন্তু একটু এদিক ওদিক হলেই খাওয়া ফেলে উঠে চলে যায়। পছন্দমত মাছ তরকারী না হলে আসতেই চায় না খেতে। বলে. 'আমার ক্ষিদে নেই।' এদিক থেকে তাঁর অতুলই বরং লক্ষ্মী। ক্ষিদের সময় যা পায়. তাই তার যথেষ্ট। শুধু পরিমাণে বেশি হলেই হোল। শাক হোক, মাছ হোক, কোন দিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। সবই তার মুখে রোচে। অনেক বিষয়েই অনেক রকমের গুণ আছে অতুলের। শুধু যদি পড়াশুনোটা হোত তাহলে আর দুঃখ ছিল না।
'আচ্ছা ওর একটা কাজকর্ম খুঁজে পেতে তোরাও তো জুটিয়ে দিতে পারিস।'
অরুণ বিস্মিত হয়ে বলল, 'কার কথা বলছ ?'
বাসন্তী বললেন, 'কার কথা আবার। ওই পোড়াকপালে হতভাগাটার কথা। অতুলের একটা ব্যবস্থা কি তোরা করবিনে ?'
সকাল বেলায় ছোট ভাইয়ের ব্যবহারের কথা মনে পড়ে গেল অরুণের. খানিকটা বিতৃষ্ণার ভঙ্গিতে সে বলল, 'ওর কথা আমার কাছে আর তুলো না মা।'
বাসন্তী অপ্রসন্ন স্বরে বললেন. 'তুই বলিস আমার কাছে তুলো না. উনি বলেন. আমার কাছে তুলো না। ওর কথা আমি তাহলে কার কাছে বলব বল দেখি। মহা জ্বালা আমার।'
অরুণ বললে, 'কারো কাছেই বলে দরকার নেই। পারো তো ওকেই বলো।'
বাসন্তী বললেন, 'আমি বুঝি বলিনে ভাবিস। দিনরাত রোজ

দুবেলা খাওয়ার সময় আমি তো ক্যাট ক্যাট করছিই। ও যদি না শোনে তো করব কি।'

অরুণ বলল, 'তেমন করে বলতে পারলে ও শোনে না ওর ঘাড় শোনে।'

আর কথা না বাড়িয়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল অরুণ।

মুখ ধুয়ে ওপরে উঠতে যাচ্ছিল, ভুবনময়ী পিছন থেকে ডেকে বললেন, 'ও নান্তু, এত রাত করলি যে আজ?'

অরুণ ফিরে এসে ভুবনময়ীর সামনে দাঁড়াল, 'এমনিই একটু রাত হোল দিদা, কি খাচ্ছ?'

দোরের সামনে বসে একটা বাটিতে করে কিছু সাদা খই আর একটু গুড় দিয়ে রাতের জল খাবার শেষ করছিলেন ভুবনময়ী, নান্তুর দিকে চেয়ে হেসে বললেন, 'দেখ এসে না কি খাচ্ছি। কত রাজভোগ, মোহনভোগ আছে হাঁড়িতে। খাওয়ার জিনিসের আমার অভাব আছে নাকি কিছু? আয় নিবি একগাল? দেব?'

অরুণ হেসে বলল, 'না দিদা। এই তো ভাত খেয়ে এলাম। তুমি খাও।'

জুতো ছেড়ে দিদিমার পাশে এসে উটকোভাবে একটু বসল অরুণ, তারপর ভুবনময়ীর খাওয়া দেখতে দেখতে হঠাৎ বলল, 'আচ্ছা দিদা?'

'উঁ।'

'বিধবা হওয়ার পর থেকেই তুমি কি রোজ রাত্রে এই খই খেতে শুরু করেছ? প্রায়ই দেখি তোমাকে খই খেতে।'

ভুবনময়ী বললেন, 'আর কোন্ পোড়া ছাই খাব।'

অরুণ বলল, 'মাঝে মাঝে লুচি-টুচিও তো খেতে পার।'

ভুবনময়ী বললেন, 'দূর। ওসব আমার পিরবিত্তি হয় না। বলে বয়সের কালেই খাইনি। এখন তো বুড়ো হয়ে মরতে চলেছি।'

করবীর কথা মনে পড়ল অরুণের। করবীও হয়ত এই রকম সামান্য কিছু খই-টই দিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করছে। অথচ মেয়েটি মাছ, মাংস,

পোলাও, কালিয়ার কি ভক্তই না ছিল। অবশ্য খাওয়ার চেয়ে রান্নাতেই বেশি সখ ছিল করবীর। বাবর রোডে হিরন্ময়ের বাড়িতে কোমরে আঁচল জড়ানো ওর সেই মাংস রান্নার ছবিটি চোখের সামনে ভেসে উঠল অর্ণের। রাঁধতে রাঁধতে খানিকটা মাংস ছোট একখানি প্লেটে করে এনে অর্ণের সামনে ধরেছিল করবী, 'নিন্, একটু চেখে দেখুন তো। ঠিক মত নুন ঝাল হয়েছে না কি। বুঝব জিভের তাক।'

অর্ণ ঝোলের একটু স্বাদ নিয়ে বলেছিল, 'ঠিকই আছে।'

করবী বলেছিল, 'অমন ওপর ওপর দেখতে হবে না ভালো করে চাখুন। একটু বেঠিক হলে কিন্তু সমস্ত দোষ আপনার ঘাড়ে চাপবে।'

অর্ণ বলেছিল, 'সব আমার ঘাড়ে? রাঁধুনীকে বুঝি কোন জবাব-দিহিই আর করতে হবে না।'

করবী বলেছিল, 'মোটেই না, সব জবাব-দিহির দায় তখন চাখুনীর জিভের।'

অর্ণ গম্ভীর হয়ে বলেছিল, 'বেশ, আপনার মাংসে আরো খানিকটা নুন লাগবে তাহলে।'

করবী একটু বাদে অর্ণের দিকে তাকিয়ে হেসে বলেছিল, 'এই বুঝি? আমার মাংসকে নুনে কাটা করবার মতলব? তোমার বন্ধুর কাণ্ড দেখেছ দাদা?'

একটু দূরে ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে হিরন্ময় নির্বিবাদে সিগারেট টেনে যাচ্ছিল। বোনের কথার জবাবে বলল, 'দেখছি বই কি। কিন্তু চাখুনী রাঁধুনীর লড়াইটা গরীবের মাংসের ওপর দিয়ে না চালালেই ভালো হয়।'

করবী অর্ণের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলেছিল, 'আমার গরীব দাদার আবেদনটা শুনলেন তো? তার মুখের দিকে চেয়ে এবার লক্ষ্মী

ছেলেটির মত ঠিক করে বলুন সত্যিই নুন ঝাল কিছু লাগবে কি না।'

নমিতা পিপলুকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এসে বলেছিল, 'এত সাধাসাধি কিসের জন্যে? রাঁধুনীর নিজের সঙ্গেও তো একটা জিভ আছে।'

অরুণ বলেছিল, 'থাকলে কি হবে। সে জিভের তাকের ওপর রাঁধুনীর বেশি ভরসা নেই। সাধে কি আর কাউকে সাধতে আসে?'

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত খাওয়া দাওয়া আর হৈ হুল্লোড় চলেছিল হিরন্ময়ের বাসায়।

অরুণ খেতে খেতে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিল, 'চমৎকার রান্না হয়েছে আপনার।'

করবী ছদ্ম কোপের ভঙ্গিতে বলেছিল, 'থামুন থামুন। আপনার জিভকে আর বিশ্বাস নেই। এমন চমৎকার মাংস নুনে পুড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন আপনি। আপনার উচিত শাস্তি কি জানেন? সারাজীবন মাংস বন্ধ করা।'

উল্টো শাস্তিটা অকারণে করবীকেই পেতে হোল। সারাজীবনের জন্যেই ওর মাছ মাংস খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। ভেবে ভারি খারাপ লাগল অরুণের।

'ওমা, ও কিভাবে বসলি নান্তু? বসবিই যদি ওই বিছানার ধারটায় বস না গিয়ে।'

দিদিমার কথায় চমক ভাঙল অরুণের। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'না দিদা, আর বসব না। যাই শুই গিয়ে।'

শুয়েও অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম এল না, বার বার করবীর কথা মনে পড়তে লাগল।

প্রীতি দিন দুই বাদে একটা পোস্ট কার্ড এগিয়ে অরুণের দিকে দিয়ে বলল, 'দাদা, তোমার চিঠি।'

অরুণ পড়ে দেখল শাঁখারীপাড়া লেন থেকে ডাক্তার বিনোদবিহারী মজুমদার ইংরেজীতে একটা চিঠি দিয়ে তাকে জানিয়েছেন, ছেলের

টিউটর হিসাবে অরুণকে রাখাই ঠিক করেছেন তিনি। তবে চল্লিশ টাকা নয় তিরিশ টাকা পর্যন্ত দিতে পারবেন। অরুণ যদি তাঁর প্রস্তাবে রাজী হয় তবে যেন অবিলম্বে তাঁর সঙ্গে দেখা করে।

প্রীতি চিঠিটা আগেই পড়ে ফেলেছিল, বলল, 'তিরিশ টাকার জন্যে অতদূরে গিয়ে টিউশানি করবে দাদা ?!

অরুণ বলল, 'উপায় কি। তিরিশের বেশি এখন আর জুটছে কই।'

প্রীতি বলল, 'কিন্তু পথেই যে তোমার সব খরচ হয়ে যাবে দাদা।'

অরুণ বলল, 'সব খরচ হবে না। দু'-চার টাকা অন্তত বাঁচবে। তোর স্নো সাবানের পয়সাটা তো অন্তত হয়ে যাবে। কি বলিস ?'

প্রীতি বলল, 'আহা-হা।'

সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই ছাত্রটি যে কি পদার্থ অরুণ তা বেশ ভাল-ভাবেই টের পেয়ে গেল। ছেলেটি ফার্স্ট ক্লাসে উঠেছে; কিন্তু ইংরেজী বাংলার জ্ঞান ফোর্থ ক্লাসের উপযোগীও নয়। খেলাধুলা সিনেমা, রাজনীতি সব বিষয়েই শ্যামলের উৎসাহ আছে। শুধু পড়াশুনোয় তেমন আগ্রহ নেই। আর প্রাইভেট টিউটর যে বেতনভুক কর্মচারী মাত্র সে বোধটা এরই মধ্যে শ্যামলের জন্মে গেছে। পড়তে পড়তে হঠাৎ শ্যামল এক সময় উঠে যায়, 'মাস্টার মশাই বসুন আমি একটু ওপর থেকে আসছি।'

'ওপরে আবার তোমার কি দরকার পড়ল ?'

'আছে একটু দরকার।'

তারপর মিনিট পনের কুড়ির মধ্যে আর শ্যামলের দেখা মেলে না। আর একদিন পাটীগণিত থেকে দু'টি স্কোয়ার মেজারের অঙ্ক দেখিয়ে দিয়ে শ্যামল বলল, 'করুন তো মাস্টার মশাই।'

অরুণ বলল, 'তুমি কর, ভুল হলে আমি দেখিয়ে দেব।'

শ্যামল বলল, 'সোজা দেখে আপনি দু'একটা আগে করে দিন তারপর বাকিগুলি আমি করব।'

দুর্ভাগ্যক্রমে প্রথম অঙ্কটার সঙ্গে ফলের মিল হল না।

অরুণ আবার চেষ্টা করে দেখছে, শ্যামল অঙ্কের বইটা হঠাৎ বন্ধ করে ফেলে বলল, 'যাকগে যেতে দিন মাস্টার মশাই। ও আমি অন্য কোন ছেলের খাতা দেখে টুকে নেব। আপনি বরং ইতিহাসই পড়ান আজ।'

শ্যামলের কথার ভঙ্গিতে একটু যেন বিদ্রুপের সুর ছিল। অরুণ তা লক্ষ্য করে বিরক্ত হয়ে বলল, 'ইতিহাস পরে পড়াচ্ছি। অঙ্কটা কেন মিলছে না আগে দেখা যাক।'

শ্যামল বলল, 'ও আর দেখবেন কি। কতকগুলি অঙ্ক অমন বেয়াড়া অমিল ধরনেরই হয়। ও নিয়ে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। একটা অঙ্ক যতক্ষণ বসে আপনি করবেন ততক্ষণে পাঁচটা অঙ্ক আমার টোকা হয়ে যাবে।'

অরুণ বলল, 'না বুঝে টুকে লাভ কি?'

শ্যামল কি বলতে যাচ্ছিল বিনোদবাবু ঘরে ঢুকলেন। স্টেথিস্কোপটা গলায় ঝুলানো। কলে বেরোচ্ছেন। যাওয়ার পথে একবার খোঁজ নিয়ে গেলেন, 'কি মাস্টার মশাই, পড়াশুনো কেমন চলছে?'

অরুণ বলল, 'ভালো।'

'ছাত্র কথা-টথা শুনছে তো?'

'হ্যাঁ।'

বিনোদবাবু এবার ছেলের দিকে তাকালেন, 'কিরে ভালো করে বুঝে শুনে নিচ্ছিস তো সব?'

শ্যামল সবিনয়ে বলল, 'হ্যাঁ বাবা।'

'অঙ্কটা?'

শ্যামল বলল, 'সব বুঝে নিচ্ছি। কোন অসুবিধে হচ্ছে না। আগের মাস্টার মশাইর চাইতেও ইনি বেশ—'

বিনোদবাবু ধমক দিয়ে বললেন,—'থাক থাক তোকে আর তুলনা

করতে হবে না। নিজে তো বিদ্যের বিশরাদ। আবার মাস্টার মশাইয়ের বিচার হচ্ছে।'

বাইরে গাড়ি দাঁড়ানো ছিল। বিনোদবাবু গিয়ে গাড়িতে উঠে বসলেন।

গাড়ির শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্যামলও উঠে দাঁড়াল. বলল, 'আজ থাক মাস্টার মশাই। মাথাটা বড্ড ধরেছে।'

অরুণ বলল, 'এরই মধ্যে তোমার মাথা ধরে গেল?'

শ্যামল বলল, 'হ্যাঁ, বাবা দূরেই বেরিয়েছেন শিগগির ফিরবেন না।' বলে বই খাতা গুছিয়ে রেখে বিদায় চাইল, 'যাই মাস্টার মশাই।'

বাবা বেরিয়ে গেলেও মা বেরোননি। শ্যামলের মার গলা শোনা গেল. 'ওকি এরই মধ্যে তোর পড়া হয়ে গেল খোকন?'

'হ্যাঁ মা, আজ আর পড়ব না। বড্ড মাথা ধরেছে।' সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে শ্যামল জবাব দিল।

শ্যামলের মা বললেন, 'আজ মাথা ধরা কাল পেটব্যথা। তোর একটা না একটা অজুহাত তো লেগেই আছে। আচ্ছা এ ফাঁকি তুই কাকে দিচ্ছিস খোকন? নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারছিস না? মাসের পর মাস এতগুলি টাকা জলে যাচ্ছে।' কিন্তু শ্যামলের আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। ভিতর থেকে বাইরের পড়বার ঘরে ঢুকলেন শ্যামলের মা হেমাঙ্গিনী। মাঝবয়সী মোটাসোটা মহিলা। অরুণ উঠে দাঁড়িয়েছিল। তিনি মাথায় আঁচলটা একটু টেনে দিয়ে বললেন, 'আপনি বসুন মাস্টার মশাই। ওকে রোজ রোজ অত সকাল সকাল ছেড়ে দেবেন না। আরও একটু বেশি সময় আটকে রাখবেন।'

অরুণ বলল, 'আজ্ঞে তাইতো রাখি। আজ মাথা ধরেছে বলে উঠে গেল।'

হেমাঙ্গিনী বললেন, 'ওর কোন কথা বিশ্বাস করবেন না। সব ফাঁকি। এমন ফাঁকিবাজ ছেলে পাড়ায় আর দুটি নেই।'

মা ছেলের যতই নিন্দা করুন না, প্রাইভেট টিউটরের পক্ষে অতখানি ছাত্র নিন্দা শোভা পায় না। তাই একটু রেখে ঢেকে ছাত্রের দোষ-ত্রুটির ওপর খানিকটা স্নেহের প্রলেপ বুলিয়ে অরুণ বলল, 'হ্যাঁ পড়াশুনোয় একটু যেন অন্যমনস্ক।'

হেমাঙ্গিনী বললেন, 'একটু কেন খুব। নিজের ছেলে বলে আমি যে তার দোষ দেখব না, কেবল মাস্টার মশাইদের দায়ী করবো তা নয়। অনর্থক পরকে দোষ দিয়ে লাভ কি? আপনি একটু ভালো করে চেষ্টা করে দেখবেন। গালমন্দ করে হোক, মেরে ধরে হোক যেভাবে পারেন। আমি কিছু বলব না।'

অরুণ হেসে বলল, 'আজ্ঞে মারধোর করবার বয়স তো তার নেই। তাতে বরং উল্টো ফলই হয়। আমার নিজের একটি ভাইও ঠিক এমনি হয়েছে। মনে হয় ছেলেবেলায় অতিরিক্ত শাসনের ফলেই তার কিছু হোল না।'

অতুলের সম্বন্ধে হঠাৎ কেমন একটু মমতা বোধ করল অরুণ।

হেমাঙ্গিনীও পারিবারিক কথা পাড়লেন। চার মেয়ের পর এই ছেলে। বাড়িতে একটু বেশি আদর যত্নই পেয়েছে। বিনোদবাবু নিজেও মানুষ বড় ভালো নন। আদর যখন করবেন তখন খুবই আদর করবেন ছেলেকে। আবার শাসনের সময়ও একেবারে সীমা ছাড়িয়ে যাবেন। ফলে ছেলেও হয়েছে একগুঁয়ে বদমেজাজী।

'কিন্তু হাল ছেড়ে দিলে তো চলবে না মাস্টার মশাই। বাপ মাকে চেষ্টা তো করতেই হবে।' একটু অনুনয়ের ভঙ্গিতে বললেন হেমাঙ্গিনী।

অরুণ বলল, 'তাতো নিশ্চয়ই: আপনি ভাববেন না। অল্প বয়সে অনেকেই এরকম থাকে। তারপর শুধরে যায়।'

হেমাঙ্গিনী খুশি হয়ে বললেন, 'দেখুন চেষ্টা চরিত্র করে।'

ধীরে ধীরে আরো অনেক তথ্য উদ্ঘাটিত হোল। অরুণের কথাবার্তা শুনে প্রথম দিনই হেমাঙ্গিনী তাকে পছন্দ করেছেন। বয়স্ক স্কুল-

মাস্টারের চাইতে অল্পবয়সী ছেলেরাই অনেক সময় ছাত্রদের ভালো পড়ায়। তারা ছাত্রের মন বুঝে তার সঙ্গে মিলে মিশে চলতে চেষ্টা করে তাতে ফল অনেক সময় ভালো হয়। হেমাঙ্গিনী লক্ষ্য করে দেখেছেন বুড়ো মাস্টাররা একেবারেই শ্যামলকে বাগে আনতে পারেন না। ওর যেটুকু যা হয় কমবয়সী ছেলে ছোকরাদের কাছেই হয়। কিন্তু বিনোদবাবুর মোটে ধৈর্য নেই। কেবলই মাস্টারদের পরখ করবেন, মাস্টার বদলাবেন। অত অধীর হলে কি চলে! অরুণ যেদিন প্রথম আসে হেমাঙ্গিনী আড়াল থেকে তাকে দেখেছিলেন, তার কথাবার্তা শুনেছিলেন। তিনিই স্বামীকে দিয়ে জোর করে চিঠি লিখিয়েছেন। 'পড়ানো আবার দেখবে কি, কথায় বার্তায় তো বেশ ভালো ভদ্রঘরের ছেলে বলে মনে হোল। একেই রাখ। আর কত টাকা কত দিকে বেরিয়ে যায়, যত হিসেব বুঝি তোমার ছেলের টিউটর রাখবার বেলায়। যা চেয়েছ তাই দিয়েই রাখ টিউটর। বেশি টাকা না দিলে কি ভালো লোক পাওয়া যায়, না কেউ মন দিয়ে পড়ায়?'

অরুণকে ভরসা দিলেন হেমাঙ্গিনী টার্মিনাল পরীক্ষায় শ্যামল একটু ফল করলেই তিনি তার মাইনে পুরোপুরি চল্লিশ করে দেবেন। অরুণ যেন তাঁর ছেলের দিকে একটু লক্ষ্য রাখে। ভালো করে মন দিয়ে যত্ন নিয়ে পড়ায়। অরুণ ছাত্রের মাকে আশ্বাস দিয়ে বলল তার চেষ্টার কোন ত্রুটি হবে না। হেমাঙ্গিনী খুশি হয়ে এতদিন বাদে ছেলের টিউটরের জন্যে চা-জলখাবার আনালেন। চাকরকে বললেন রোজ অরুণকে চা দিয়ে যেতে। ছাত্রের ডেপোমিতে অরুণ ভারি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল কিন্তু ছাত্রের মা'র ব্যবহারটুকু এবার তার ভালো লাগল। নিজের মা'র কথা মনে পড়ে গেল, তার মনে পড়ল অতুলের জন্যে তাঁর উদ্বেগ অশান্তির কথা।

হেমাঙ্গিনীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অরুণ বেরোচ্ছে পথে দেখা

হয়ে গেল দিলীপের সঙ্গে। তার হাতে একটা মিকশ্চারের শিশি। বৈঠকখানারই লাগা বিনোদবাবুর ডিসপেনসারি। কম্পাউন্ডারের কাছে ওষুধ নিতে এসেছিল দিলীপ।

অরুণ বলল, 'অসুখ কার? তোমার মা'র নাকি?'

দিলীপ বলল, 'না। বউদির।'

অরুণ বিস্মিত হয়ে বলল, 'সে কি তাঁর আবার কি হোল?'

দিলীপ বলল, 'জ্বর হয়েছে। আপনি যেদিন গেলেন না, তার পরদিন থেকেই জ্বর। আসবেন? দেখে যাবেন বউদিকে?'

ছাত্রের বাড়িতে আসা যাওয়ার পথে রোজই অরুণের মনে হয়েছে করবীর সঙ্গে আর একবার দেখা করলে হয়। কিন্তু পরক্ষণেই তার মন দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছে। একটি শোকার্তা বিধবার কাছে বার বার গিয়ে কি লাভ। লোকে যেমন সান্ত্বনা দেয় তেমন মামুলী মৌখিক সান্ত্বনা অরুণের আসে না। অরুণ জানে সময়ই সব শোকের বড় সান্ত্বনা। সময় সমস্ত শোকের ওপর বিস্মৃতির প্রলেপ বুলিয়ে দেয়। তার আগে মোহ-মুদ্গর আউড়ে কোন লাভ হয় না। কিন্তু শোকে যে অভিভূত তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা না করাও এক ধরনের অশোভন অসামাজিকতা। তাই অরুণ যতটা পারে এসব অবস্থায় দূরে থাকতে চেষ্টা করে। কিন্তু অন্য সকলের সম্বন্ধে যাই হোক, করবীর বেলায় দূরে সরে থাকাটা ঠিক যেন ভালো লাগছিল না অরুণের। প্রায় তার বাড়ির সামনে দিয়েই রোজ যাতায়াত করে; কিন্তু একবার খোঁজ নিয়ে যেতে পারে না। অথচ খোঁজ খবর নেওয়ার, দেখা করার ইচ্ছা হয়। নিজের মনের এই অকারণ দ্বিধায় তার নিজেরই ভারি খারাপ লাগছিল। দেখা করার ইচ্ছাটাকে নিজের মনেই সে বাতিল করে দিয়েছিল। কোন্ উপলক্ষে সে দেখা করবে। আর কোন নতুন ঘটনা, নতুন কারণ ঘটেছে যে, সেই সূত্র ধরে সে করবীর খবর নিতে যাবে। অর সঙ্গে তো এমন কোন আত্মীয়তা নেই, ঘনিষ্ঠ

বন্ধুত্ব নেই যে, যখন তখন ইচ্ছা করলেই যাওয়া যায়। তা'ছাড়া অরুণকে দেখে করবীর ভাব তেমন প্রীতিকর না-ও হতে পারে। দিল্লীর সেই চপল উচ্ছল দিনগুলির স্মৃতি করবীকে হয়তো এখন আর আনন্দ দেয় না। হয়তো করবী মনে মনে ভাবে সেই একটা মাস স্বামীর সঙ্গে কলকাতায় কাটালেই ভালো হোত। স্বামী-সান্নিধ্যের সুখ জীবনে আরও একটি মাস বাড়ত তাহলে।

কিন্তু অত হিসেব না করেও তো যাওয়া যায়। বলা যায় এই পথ দিয়েই যাচ্ছিলাম, একটু কাজ ছিল এদিকে আপনারা কেমন আছেন খোঁজ নিয়ে গেলাম। করবীর সঙ্গে তার যতটা পরিচয় তাতে যাতায়াতের পথে এমন মাঝে মাঝে দেখা সাক্ষাৎ নেহাৎ অশোভন হয় না, এমন খোঁজ-খবর নেওয়াটা সামাজিক আদব-কায়দার মধ্যেই পড়ে। কিন্তু করবী যদি জিজ্ঞেস করে, 'কি কাজ ছিল আপনার।' যদি মনে মনে ভাবে এতদিন অরুণের এদিকে কোন কাজ ছিল না, হঠাৎ কি কাজ পড়ল একথা যদি তার মনে ওঠে। তার মনের সংশয় দূর করবার জন্যেই অরুণকে সত্য কথাটাই বলতে হবে তাহলে। বলবে, এই রাস্তাতেই বিনোদবাবুর বাড়িতে একটা ট্যুইশন জুটেছে। সেইজন্যে রোজ আসতে হয়। কিন্তু যে অরুণ দিল্লীতে সরকারি চাকরি করত, সে শ্রীগোপাল মল্লিক লেন থেকে এতদূরে এই ভবানীপুরে একটি স্কুলের ছেলেকে সামান্য মাইনেয় রোজ পড়াতে আসে এ কথাটা শোনার সঙ্গে অরুণের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে করবীর মনের ভাবটা কি রকম হবে। অরুণের দারিদ্র্যের কথা বুঝতে কি কিছু আর বাকি থাকবে তার। কি দরকার একটি মেয়ের সামনে নিজের আর্থিক দৈন্যকে অমন করে উদ্ঘাটন করবার। তার চেয়ে আড়ালে থাকাই ভালো। নিজের অভাব অনটন দুঃখ দৈন্যকে আড়ালে রাখাই ভালো।

কিন্তু দিলীপ যখন করবীর অসুখের খবর জানিয়ে অরুণকে তাদের

বাসায় আসবার জন্য অনুরোধ করল তখন না যাওয়াটা ভারি অভদ্রতা হবে বলে মনে হোল অরুণের।

দিলীপের কথার জবাবে বলল, 'আচ্ছা চল।'

যেতে যেতে দিলীপ বলল, 'আপনি বুঝি এ বাড়িতে শ্যামলকে পড়ান? আপনাকে সেদিনও দেখলাম—'

অরুণ স্বীকার করে বলল, 'হ্যাঁ ওকে পড়াই আমি। শ্যামলের সঙ্গে আলাপ আছে নাকি তোমার?'

দিলীপ একটু হেসে বলল, 'বাঃ আলাপ থাকবে না? এক ক্লাসেই তো পড়ি আমরা। এক বছর ওপরে ছিল আমার। গত বছর ফেল করায়—'

বলতে বলতে দিলীপ থেমে গেল।

অরুণ লক্ষ্য করল এক ক্লাসে পড়লেও শ্যামলের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের ছেলে দিলীপ। বয়সের তুলনায় একটু যেন বেশি শান্ত আর গম্ভীর।

অরুণ কড়া নাড়তে আজ করবীর শাশুড়ী নিভাননীই এসে দোর খুলে দিলেন। অরুণকে দেখে তিনি বললেন, 'এই যে, এসো।'

দিলীপ আর তার মার সঙ্গে করবীর ঘরে ঢুকল অরুণ। খাটে শোয়নি করবী। মেঝেতেই রোগশয্যা পাতা হয়েছে। এই ক'দিনের জ্বরে বেশ একটু রোগা হয়ে গেছে চেহারা। অরুণকে দেখে করবী একটু মৃদু হাসল, বলল, 'আজ বুঝি দিলীপের হাত আর এড়াতে পারেন নি? ও জোর করে ধরে নিয়ে এসেছে?'

অরুণ বলল, 'বাঃ ধরে নিয়ে আসবে কেন?'

করবী এ কথার কোন জবাব না দিয়ে দিলীপের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দিলু, অরুণবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। বসতে দাও ওঁকে।'

দিলীপ তাড়াতাড়ি টেবিলের সামনে থেকে পরেশের সেই গদি-আঁটা ভালো চেয়ারটাই টেনে আনল।

করবী দিলীপের দিকে একবার তাকালো কিন্তু কোন কথা বলল না। বরং অরুণের দিকে চেয়েই অনুরোধ করল 'বসুন আপনি।'
অরুণ অবস্থাটা বুঝতে পারল। করবীর স্বামীর চেয়ারটা এগিয়ে দেওয়ার সময় দিলীপ তেমন খেয়াল করেনি। কিন্তু এগিয়ে যখন একবার দিয়েইছে তখন তো আর সরিয়ে নেওয়া যায় না। তখন বসতে বলতেই হয়। কিন্তু কেউ একটু মৌখিক ভদ্রতা করে কিছু অনুরোধ করলেই অরুণ তা রক্ষা করবে তেমন ছেলেই সে নয়। এগিয়ে দেওয়া চেয়ারটায় না বসে অরুণ মেঝের ওপরই বসে পড়ে বলল, 'না না চেয়ারে দরকার নেই, চেয়ার থাক।'

নিভাননী ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'ওকি তাই বলে মাটিতে বসলে কেন তুমি। অরুণকে একটা আসন টাসন এনে দে না দিলু।'

তাই হোল। একখানা আসন এনে দিলু করবীর বিছানার কাছে পেতে দিল। তারপর মেজার গ্লাসে শিশি থেকে ওষুধ ঢেলে দিয়ে করবীর মুখের সামনে এগিয়ে ধরে বলল, 'নাও বউদি।' করবী ওষুধটুকু খেয়ে ফেলে বলল, 'দেখেছেন? সামান্য একটু ইনফ্লুয়েঞ্জা না কি হয়েছে তাতে মা আর ছেলে দুজনে মিলে আমাকে ওষুধ খাওয়ার কি ধুম লাগিয়েছেন।'

নিভাননী বললেন, 'হুঁ, সামান্যই তো।' দু'দিন তো জ্বরের ঘোরে একেবারে অজ্ঞান হয়েছিলে।'

করবী মৃদু স্বরে বলল, 'বেশ ছিলুম।' জ্ঞান যদি একেবারে ফিরে না আসত তাহলেই বাঁচতুম।'

একথার কেউ কোন জবাব দিল না। একটু বাদে নিভাননী পাশের ঘরে চলে গেলেন।

একটি প্লেটে করে বেদানার দানা ছাড়িয়ে দিলু করবীর দিকে এগিয়ে ধরে বলল, 'খেয়ে নাও বউদি।'

করবী বলল, 'আঃ, আবার ওগুলি এনেছ কেন।'

দিলীপ বলল, 'খাও, এই তো তেতো ওষুধগুলি খেলে। মুখটা ভালো লাগবে।'
করবী সস্নেহে ছোট দেবরের দিকে একটু তাকিয়ে নিয়ে অরুণের দিকে চেয়ে বলল, 'ভারি ভালোবাসে আমাকে ও, অসুখের মধ্যে কি সেবাটাই না করছে। দিলু তোমার অরুণদাকে একটু চা করে খাওয়াতে পারো এবার?'
দিলীপ সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'যাচ্ছি বউদি।'
অরুণ বাধা দিয়ে বলল, 'না না চা এখন থাক, চা আমি এইমাত্র খেয়ে এলাম।'
করবী বলল, 'কোত্থেকে খেলেন? ছাত্রের বাড়ি থেকে?' ক্ষীণ একটু হাসল করবী। রোগশীর্ণ শুষ্ক ঠোঁটে সেই হাসিটুকু ভারি সুন্দর লাগল অরুণের চোখে।
অরুণ বলল, 'কি করে জানলেন আপনি।'
করবী বলল, 'আমি সব জানি। সব খবর রাখি। দিলুই সেদিন বলল আমাকে, বউদি অরুণদা রোজ আসেন এ পাড়ায়। ডাক্তারবাবুর ছেলে শ্যামলকে পড়ান।' বললুম, 'আসতে বলো আমাদের এখানে। তা ও যা লাজুক। বোধ হয় বলতেই পারেনি। কিন্তু বলতেই বা হবে কেন। আপনি রোজ এদিকে আসছেন। অথচ একবারও খোঁজ নেন না।' এই অভিযোগের উত্তরে অরুণ কি বলবে হঠাৎ ভেবে পেল না, করবী একটু চুপ করে থেকে বলল, 'সেদিন আমার ব্যবহারে আপনি বোধ হয় রাগ করেছিলেন, আপনাকে দাঁড় করিয়ে রেখে চলে এলাম। খানিকক্ষণের মধ্যে কিছুতেই আর যেতে পারলাম না। যাওয়ার মত শরীরের অবস্থা ছিল না। সারা শরীর কেবল কাঁপছিল। কিছুক্ষণ বাদে ফের যখন গেলাম ও ঘরে, দিলু বলল, আপনি চলে গেছেন। কিছু মনে করবেন না।'
রোগ শয্যায় শুয়েও করবী অনেক কথা বলছে। কিন্তু এ যেন আর এক করবী। সেই পরিহাসচপল উচ্ছল প্রগলভা করবীর সাক্ষাৎ যেন

আর কোনদিন মিলবে না। তবু এ করবীকে অরুণের ভালো লাগতে লাগল। ভারি কোমল আর করুণ ওর কথাগুলি। বলবার ভঙ্গিতে যেন ক্লান্তি আর বিষণ্ণতা মাখানো। অরুণ চেয়ে দেখল ওর মুখের স্বাভাবিক গৌরবর্ণ একটু যেন ফেকাশে হয়েছে। মাথায় আঁচল নেই। রুক্ষ কালো চুলের রাশের মধ্যে সিঁথির সাদা রেখা। ঠিক কুমারীর সিঁথির মত। করবীর দিকে তাকালে এখন আর বোঝা যায় না ওর কোনদিন বিয়ে হয়েছিল। অরুণের যেন মনে পড়তে চায় না দিল্লীতে মাসখানেক ধ'রে সিঁদুররঞ্জিত এই সিঁথিই সে দেখেছিল রোজ। কিন্তু করবীর এই সাদা সিঁথি এরই মধ্যে ওর চেহারার সঙ্গে বেশ মানিয়ে গেছে, বরং যেন বেশিই মানিয়েছে। কুমারী অবস্থায় করবীকে তো অরুণ কোনদিন দেখেনি, তখন সিঁথির শুভ্রতা কি এরও চেয়ে সুন্দর দেখাত? কিন্তু এখনও করবী ঢের সুন্দর। রূপবতীকে যে কোন বেশেই সুন্দর দেখায়। বাইরের রঙীন বসনভূষণ ছেড়ে রিক্ত হতে চাইলে কি হবে রূপের ঐশ্বর্য যে করবীর সর্বাঙ্গে জড়িয়ে আছে।

করবী অরুণের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি ভাবছেন?'

অরুণ বলল, 'কিছুই ভাবছি না। আপনি ভারি রোগা হয়ে গেছেন তাই দেখছিলাম।'

করবী একটু লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিল, তারপর বলল, 'ও রোগা! কিন্তু আপনি আসল কথা এড়িয়ে যাচ্ছেন। সেদিন আপনি রাগ করে চলে গিয়েছিলেন কিনা সত্যি করে বলুন তো।'

অরুণ বলল, 'আচ্ছা আপনি আমাকে কিরকম মানুষ বলে মনে করেন বলুন তো। আমি কি অতই হৃদয়হীন যে আপনার এই অবস্থাতেও আনুষ্ঠানিক ভদ্রতার ত্রুটি ধরব? আপনি কি ভাবে রিসিভ করলেন কি ভাবে বিদায় দিলেন তার খুঁটিনাটি বিচার করব। আমাকে কি আপনি সেই রকম বলে ভাবেন?'

করবী বলল, 'না তা ভাবিনে।'

দিলু ঘরে ঢুকল। এক কাপ চা করে নিয়ে এসেছে। অরুণের সামনে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'নিন অরুণদা। দেখুন তো খাওয়া যায় কি না।'

এতক্ষণে মৃদু একটু হাসল দিলীপ। অরুণ কাপে একবার চুমুক দিয়ে বলল, 'বাঃ চমৎকার হয়েছে। খাওয়া যাবে না কি বলছ। তোমার চায়ের হাত তোমার বউদির চেয়েও ভালো।'

করবী একটু হেসে বলল, 'নাও হোল তো? একেবারে চা রসিকের সার্টিফিকেট পেয়ে গেলে।'

দিলীপ লজ্জিত হয়ে বলল, 'না না, আমি অত ভালো করতে পারিনে। বউদি এবার কি পিপলুর দুধটা স্টোভে গরম করে নেব?'

করবী বলল, 'নাও। কিন্তু ও তো মাও করতে পারতেন। তুমি না হয় একটু পড় গিয়ে দিলু। তোমার পড়াশুনার কত ক্ষতি হচ্ছে। এবারই পরীক্ষা।'

দিলীপ এ কথার কোন জবাব না দিয়ে বোধ হয় দুধ গরমের জন্যেই পাশের ঘরে চলে গেল।

অরুণ বলল, 'পিপলু কোথায়?'

করবী জবাব দিল, 'মার কাছে ঘুমুচ্ছে। ক'দিন ধরে মার কাছেই থাকে।'

অরুণ বলল, 'ওর সঙ্গে আর দেখাই হোল না। যেদিন আসি সেদিনই শুনি ঘুমুচ্ছে।'

করবী বলল, 'ওর কথা আর বলবেন না। সন্ধ্যা হতে না হতেই ওর চোখ বুজে আসে। জ্বালায় বেশি রাত্রে। ওর সঙ্গে দেখা করতে হলে আপনাকে সন্ধ্যার আগে আসতে হবে। কাল তাই আসুন না। একটু সকাল ক'রে আসুন। টিউশনিতে যাওয়ার আগে এখানে হয়ে চা খেয়ে যাবেন।'

অরুণ ঘাড় নেড়ে বলল, 'আচ্ছা।'

আরো কিছুক্ষণ বাদে এ কথা ও কথার পর উঠে দাঁড়াল অরুণ।

দাঁড়াতেই পরেশের লিখবার টেবিলটা চোখে পড়ল! আজও সুন্দর করে গুছানো রয়েছে টেবিলে। দু' পাশে বই। ফটো স্ট্যাণ্ডে স্বামী-স্ত্রীর সেই দু'খানি ফটো। পরেশের ফটোতে একটি বেল-ফুলের মালা জড়ানো। এক পাশে ছোট একটি ফুলদানিতে কয়েকটি রজনীগন্ধা।

অরুণ বলল, 'রোজ এসব করেন বুঝি?'

করবী একটু লজ্জিত হয়ে বলল, 'যেদিন আমি না পারি দিলুই করে। দাদা-অন্ত প্রাণ ছিল ওর। তিনিও ওকে ভালবাসতেন খুব। দিলু কিন্তু একবারও মুখে তাঁর নাম করে না। তার কথা উঠলে সামনে থেকে সরে যায়। সইতে পারে না।'

অরুণ বলল, 'কলমটি কি হোল?'

করবী বলল, 'ও সবই আপনার চোখে পড়েছে?'

'কলমটি তুলে রেখেছি। পিপলু নষ্ট ক'রে ফেলছিল। দামী জিনিস।'

অরুণ করবীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'দামী তো নিশ্চয়ই।'

করবী এ কথার কোন জবাব না দিয়ে বলল, 'কাল আসছেন তাহলে।' বেরিয়ে এসে অরুণ মনে মনে ভাবল করবীর সবই ভালো কিন্তু এই ফটো পূজার মধ্যে যেন একটু বাড়াবাড়ি আছে। অরুণ নিজে এমন প্রকাশ্যভাবে মৃত প্রিয়জনের পূজো অর্চনা করতে পারত না। গভীর শোককে মনের গভীরে লালন করত।

অন্যের সামনে কোন বহিঃপ্রকাশ ঘটতে দিত না তার। কিন্তু পরক্ষণেই অরুণের মনে হোল সে হয়ত করবীর ওপর অবিচার করেছে। জীবন্ত স্বামীর পূজা করাই যে দেশের রীতি, মৃত স্বামীর উদ্দেশ্যে সে দেশে পুষ্পার্ঘ্য যদি করবী দেয়ই অরুণের তাতে আপত্তি করবার কি আছে।

পরদিন করবীর অনুরোধ রাখল অরুণ। টিউশানিতে যাওয়ার আগে

তাদের বাড়ি হয়ে গেল। করবীর জ্বর ছেড়ে গেছে। কিন্তু দুর্বলতা যায় নি। অরুণকে দেখে একটু হেসে বলল, 'এই যে আসুন।'
পিপলুর সঙ্গেও আজ দেখা হোল। ভারি দুরন্ত ছেলে। ঘরময় ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। অরুণ ওকে ধরে কাছে আনতে গেল কিন্তু কিছুতেই ও এল না। অরুণ বলল, 'আপনার ছেলে তো ভারি অকৃতজ্ঞ। ও আমাকে একেবারেই ভুলে গেছে।'
করবী হেসে বলল, 'তার জন্য দুঃখ করবেন না। দু' একদিন যান আসুন তখন ও আপনার পিছু ছাড়তে চাইবে না দেখবেন।'

দিনকয়েকের মধ্যে যাতায়াতটা বেশ সহজ হয়ে এল। কোনদিন ছাত্র পড়াবার আগেই আসে অরুণ, কোনদিন পড়িয়ে আসে। করবীর অসুখ সেরে গেছে। সুস্থ হয়ে চলাফেরা কাজকর্ম করছে ও। সবদিন অরুণের সঙ্গে বসে গল্প করবার করবীর সময় হয় না। শুধু একবার এসে দেখা দিয়ে খোঁজ নিয়ে যায়। কিংবা সংসারের কাজ করতে করতেই কথা বলে। যখন করবী থাকে না অরুণ দিলীপের মা'র সঙ্গে কি দিলীপের সঙ্গে আলাপ করে। তার পড়াশুনার খোঁজ খবর নেয়। অঙ্ক কষায় ট্রানশ্লেশন করতে দেয়। প্রথম প্রথম দিলীপের ভারি সঙ্কোচ ছিল। সে অরুণের কাছ থেকে কোন সাহায্য নিতে চাইত না। কিন্তু দিলীপকে সাহায্য করার, তার সঙ্গে ভাব জমাবার গরজ অরুণেরই যেন বেশি, কারণ অরুণ এটা লক্ষ্য করেছে করবী একে খুশী হয়। করবী চায় দিলীপ আর তার মধ্যে শ্রদ্ধা আর প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠুক। কিন্তু দিলীপ কথা বলে কম। যা বয়স সেই তুলনায় চাপল্য চাঞ্চল্য ওর প্রায় নেই বললেই চলে। ভারি গম্ভীর প্রকৃতির ছেলে। দিলুর স্বভাবের এই বৈশিষ্ট্য নিয়ে ওর অসাক্ষাতে করবী আর তার শাশুড়ীর সঙ্গেও মাঝে মাঝে আলাপ করে অরুণ।
'আপনার দেওরটি একেবারে জন্ম বুড়ো।' অরুণ মন্তব্য করে: 'এই

বয়সের এত গুরু গম্ভীর ছেলে আমি আর দেখি নি।'

করবী বলে, 'হ্যাঁ, ওই রকমই।'

নিভাননী বলেন, 'একেবারে এতটা গম্ভীর ছিল না আগে। দাদার শোকে ও যেন একেবারে পাষাণ হয়ে গেছে। প্রথম ক'দিন তো ওকে নাওয়াতে খাওয়াতেই পারি নি। ঘরের কোণে দেওয়ালে মাথা রেখে চুপ করে বসে থাকতো। কারো সামনে কাঁদত না, লুকিয়ে কাঁদত। ওর ভাবচরিত্র দেখে ওকে নিয়েই হোল আমার চিন্তা। যে গেছে সেতো গেছেই এখন ওকে বাঁচাতে পারলেই হয়। আজকালও দেখনা কি রকম ভাব। খেলানো বেড়ানো কিছু নেই, স্কুলে কারোর কাছে যায় আসে না। স্কুল থেকে ফিরে এসে বইপত্র নিয়ে বাড়িতেই থাকে। বাকি সময়টুকু সংসারের কাজকর্ম করে, রেশন বাজার সব তো এখন ওকেই দেখতে হয়।'

অরুণ উপদেশ দেওয়ার ভঙ্গিতে বলে, 'এ তো ঠিক নয়, ও যাতে একটু অন্যমনস্ক হয়, স্বাভাবিকভাবে খেলাধুলা হাসিগল্প করে সেই চেষ্টাই তো করা উচিত সকলের।'

নিভাননী বলেন 'দেখ না বাপু তুমি একটু চেষ্টা চরিত্র ক'রে। তবু তুমি যাও আস, পড়াশুনা নিয়ে আলাপ করো, গল্প করো আমার বেশ ভালো লাগে। যতক্ষণ তুমি থাকো ততক্ষণ বরং বাড়িতে একটু সাড়াশব্দ থাকে। অন্য সময় তো টেকাই যায় না।'

এ বাড়িতে তার প্রয়োজনীয়তা নিভাননীও যে অনুভব করছেন, সে কথা মুখ ফুটে স্বীকার করছেন তা দেখে অরুণের খুব ভালো লাগে। বেশ একটু নিশ্চিন্ত হয়। নিভাননী আলাপ ব্যবহারে বেশ ভালো। বাঙলা লেখাপড়া ভালোই জানেন। বয়স্কা হিন্দু বিধবা হওয়া সত্ত্বেও তেমন বিশেষ রক্ষণশীলতা নেই।

এক সময় ছেলেকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে ছিলেন। ও'র স্বামী সেখানে মাস্টারী করতেন। ছেলে স্কুলে পড়ত। সে গল্পও মাঝে মাঝে করেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ও'র ব্যক্তিগত আলাপ ছিল। বেশ

একটু আত্মপ্রসাদের ভঙ্গিতে যখন সেই পুরোন দিনের কথা বলতে থাকেন নিভাননী, তখন তাঁর মুখ দেখলে মনে হয় না এই কিছুদিন আগেও অতবড় একটা শোক তিনি পেয়েছেন।

বেশ লাগে অরুণের এই একটি নতুন পরিবারের সঙ্গে ক্রমে তাঁর প্রীতির আর বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠছে। কত পুরোন বন্ধু হারিয়ে গেছে, কত আত্মীয়তার ধারা শুকিয়ে এসেছে কিন্তু ভবানীপুরের এই গলিতে আর একটি পরিবারকে লোনা সমুদ্রে একটু নতুন সবুজ দ্বীপের মত আবিষ্কার করেছে অরুণ। ভারি অদ্ভুত এই জীবন। কোন দিক দিয়ে যে সে কি ভাবে ক্ষতিপূরণ ক'রে দেয় তা বলা যায় না।

আজকাল নিজের বাড়ির চেয়ে, বন্ধুবান্ধবের দলের আড্ডার চেয়ে করবীদের এই ছোট সংসারের পরিবেশই যেন বেশি ভালো লাগে অরুণের। এ বাড়িতে আসার জন্যে সমস্ত মন যেন ওর উন্মুখ হয়ে থাকে। সবদিন আসে না। মাঝে মাঝে ইচ্ছে করেই দু'একদিন বাদ দেয়। কিন্তু বাদ যে দিল—গেল যে না, সে কথাটা দিনের মধ্যে অনেকবার করে মনে পড়ে। পরদিন একটু আগে আগে গিয়েই উপস্থিত হয়। পকেটে করে লজেন্স্ কি বিস্কুট নিয়ে যায়, পিপলুর জন্যে। করবী অনুযোগ দেয় 'কেন রোজ রোজ ওসব আনেন।'

অরুণ বলে, 'দেখি পিপলুর সঙ্গে খাতিরটা ফিরিয়ে আনতে পারি কিনা।'

কিন্তু খাতিরটা কেন যেন ঠিক আগের মত ফিরে আসতে চায় না। পিপলু অরুণের দেওয়া জিনিসগুলি ঠিকই নেয়, কিন্তু তার কোলের মধ্যে বেশিক্ষণ থাকে না একটু বাদেই ছুটে চলে আসে।

অরুণ বলে, 'এসো এসো।'

পিপলু দূরে দাঁড়িয়ে মাথা নাড়ে, 'না যাব না। তুমি ভালো না।'

অরুণের মুখখানা একটু গম্ভীর দেখায়। করবী হাসে, ছেলের এই

অসৌজন্যে সস্নেহে বেশ একটু ধমকও দেয়, 'একথা বলে নাকি? অকৃতজ্ঞ নেমকহারাম ছেলে। এতক্ষণ ধরে লজেনস্‌গুলি খেলে কার? আর ফুরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বলছ উনি ভালো নয়। আর কক্ষণো ওকে কিছু এনে দেবেন না বুঝলেন?'

অরুণের দিকে তাকিয়ে করবী একটু হাসে।

কিন্তু এই শাস্তির ভয়ে পিপলুকে মোটেই দমতে দেখা যায় না। ও তার সুন্দর লাল টুকটুকে ঠোঁট দু'টি উল্টিয়ে বলে, 'আমার কাকা আনবে।'

হঠাৎ মা'র কাছে এগিয়ে আসে পিপলু, 'আমার বাবা কোথায় গেছে মা?'

করবী কোন জবাব দেয় না।

পিপলু নিজেই বলে, 'স্বর্গে গেছে না? ঠামা বলে।'

করবী সায় দেয় 'হুঁ।'

পিপলু আবার জিজ্ঞেস করে 'স্বর্গ থেকে বাবা কবে আসবে মা? কতদিন তো গেছে, আসে না কেন?' এ প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে করবী চুপ করে থাকে। অরুণ আবার ডাকে, 'পিপলু এদিকে এসো। শোন আর একটু, এসো আমার কাছে। আজ রাস্তায় কি হয়েছিল শোন। একটা ট্রাম আর একটা বাস বুঝলে—'

পিপলু এবার সত্যিই এগিয়ে আসে কিন্তু ট্রাম বাসের গল্প শোনার জন্যে অন্য দিনের মত তার তেমন আগ্রহ দেখা যায় না, অরুণকে ঠিক আগের প্রশ্নই করে পিপলু, 'বাবা কবে আসবে বল না।'

অরুণ বলে, 'আসবে একদিন।'

পিপলু বলে, 'কাল?'

অরুণ উত্তর দিতে না পেরে চুপ করে থাকে।

পিপলু আবার বলে, 'কাল আসবে না পরশু আসবে। পরশু ঠিক আসবে, তাই না?'

অরুণ মুখ তুলে তাকিয়ে দেখে করবী ঘর থেকে কখন চলে গেছে।

আচ্ছা মানুষ তো। একা একা অরুণকে পিপলুর এই সবচেয়ে কঠিন প্রশ্নের সামনে ফেলে রেখে পালিয়ে গেছে করবী।
পিপলুকে জানালার কাছে টেনে নিয়ে গেল অরুণ, 'দেখ দেখ একটা ঘোড়ার গাড়ি যাচ্ছে। কত বড় একটা ঘোড়া দেখেছ?'
পিপলু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে সত্যিই একটা ঘোড়ার গাড়ি চলেছে রাস্তা দিয়ে। মোটেই বড় নয়। হাড় বের-করা, রোগাটে চেহারার একটি ঘোড়া একখানি বোঝাই গাড়ি টেনে নিয়ে চলেছে। গাড়ির ভিতরে মানুষ, ওপরে মাল!
পিপলু বলে, 'ওই গাড়িতে করে বাবা আসবে না কাকু?'
অরুণ সায় দেয়, 'হুঁ।'
পিপলু পরক্ষণেই মাথা নেড়ে বলে, 'উঁহু, গাড়িতে নয়। ঘোড়ায় চড়ে আসবে, বাবা ঘোড়ায় চড়ে আসবে, কি মজা। কিন্তু বাবা তো ঘোড়ায় চড়তে জানে না, আসবে কি করে। তুমি ঘোড়ায় চড়তে জানো? বল না, জানো?'
একটু বাদে নিভাননী এসে উদ্ধার করেন অরুণকে। নাতিকে কোলে করে নিয়ে যেতে যেতে বলেন, 'পিপলু এসো, খাবে এসো।'
কিন্তু পিপলুর এ ধরনের শক্ত প্রশ্ন ছাড়াও সংসারে আরও প্রশ্ন আছে। তাও নেহাৎ কম কঠিন নয়। সে প্রশ্নের অস্তিত্ব অরুণ সেদিন টের পেল।
ছাত্র পড়াতে যাওয়ার আগে অরুণ সেদিনও করবীদের খোঁজ নিতে এসেছে।
নিভাননী দোর খুলে দিয়ে তাকে বাইরের ঘরে নিয়ে এসে বললেন, 'বসো।'
'করবী একটু বেরিয়েছে এক্ষুণি আসবে।'
'আর দিলীপ?'
নিভাননী বললেন, 'তাকেও তো দেখছিনে।'
এরপর পিপলুর কথা জিজ্ঞেস করল অরুণ।

নিভাননী বললেন, 'এতক্ষণ দুষ্টুমি করছিল অনেক কষ্টে ঘুম পাড়িয়েছি।'

তারপর আর কোন কথা জমল না। নিভাননী নিজের থেকেও আর কোন প্রসঙ্গ তুললেন না। তার মুখের ভাব গম্ভীর। একটু যেন চিন্তাক্লিষ্ট।

অরুণ জিজ্ঞেস করল, 'আপনার শরীর কি ফের খারাপ হয়েছে?'

নিভাননী বললেন, 'আর শরীর। না শরীর আমার ভালোই আছে। আসছি বোসো তুমি।'

বলে তিনি কি একটা কাজে ভিতরে চলে গেলেন।

একটু বাদেই সদরের কড়া নড়ে উঠল। অরুণ-ই উঠে গিয়ে দোর খুলে দিল। করবী।

অরুণ একটু হেসে বলল, 'অন্য দিন আপনি দোর খুলে দেন, আজ আপনার বাড়ির দোর আমি খুললাম। কি ব্যাপার, বেরিয়েছিলেন কোথায়? মুখটুক শুকনো, খুব হয়রান হয়েছেন বলে মনে হচ্ছে।'

করবী একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, 'হুঁ।'

ভিতরে এসে করবী বলল, 'কতক্ষণ এসেছেন?'

অরুণ বলল, 'এই খানিকক্ষণ আগে। কিন্তু আপনি আমার কথার জবাব তো দিলেন না।'

'দিচ্ছি বসুন।'

বলে একটা চেয়ার একটু দূরে সরিয়ে নিয়ে করবী জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা আপনি চাকরি-টাকরি পেয়েছেন?'

অরুণ একটু হেসে বলল, 'কেন আমায় দেখে কি সেইরকম কিছু মনে হচ্ছে। না পাইনি। চাকরি কোথায় যে পাব।'

করবী আস্তে আস্তে বলল, 'আমিও পেলাম না।'

অরুণ বিস্মিত হয়ে বলল, 'সে কি! আপনিও কি চাকরির খোঁজে বেরিয়েছিলেন নাকি?'

করবী একটু চুপ করে থেকে বলল, 'হ্যাঁ। না বেরোলে চলবে কি করে বলুন।'
একথার জবাবে অরুণ কি বলবে হঠাৎ কিছু ভেবে পেল না। করবীরও যে এ সমস্যা আছে একথা এতদিন তার মনেই হয় নি। আসবাবপত্রে এদের বেশ সাজানো গুছানো ঘরদোর আর জানালায় দরজায় রঙীন পর্দা দেখে অরুণের মনে হয়েছিল বাড়ির একমাত্র উপার্জনক্ষম পুরুষ মারা যাওয়ার পরেও যারা এভাবে গুছিয়ে-টুছিয়ে নির্বিবাদে থাকতে পারে, তাদের নিশ্চয়ই অন্য কোন সংস্থান আছে। হয় টাকা আছে ব্যাঙ্কে, না হয় শেয়ার টেয়ার থেকে অর্থাগমের অন্য কোন ব্যবস্থা রয়েছে। করবীদের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে মাঝে মাঝে এক একবার যে কৌতূহল অরুণের না হয়েছে তা নয়, কিন্তু এতদিনের আলাপেও কিছুতেই সে কথা মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করতে পারে নি। করবী নিজে থেকেও ওসব প্রসঙ্গ তোলেনি কোনদিন। এমন কি নিভাননীও নয়। তাই আজ যখন করবী বলল চাকরির চেষ্টা ছাড়া তাদের চলবে না অরুণ বেশ একটু বিস্মিতই হোল। খানিক বাদে বলল, 'আমি ভেবেছিলাম আপনাকে ওসব কষ্ট করতে হবে না।'
করবী একটু হাসল, 'কেন করতে হবে না? আমাদের খুব বড়লোক বলে ভেবেছিলেন?'
অরুণ বলল, 'না বড়লোক ঠিক নয় তবে ভেবেছিলাম পরেশবাবু কিছু রেখে-টেখে গেছেন।'
করবী বলল, 'কি আর রাখবেন বলুন, রাখবার সময় পেলেন কই। সব নিয়ে বছর পাঁচেকের তো চাকরি। তাও গোড়ার দিকে মাইনে তো খুবই কম ছিল। শেষে কিছু বাড়ল, সঙ্গে সঙ্গে খরচও বাড়তে লাগল।'
অরুণ বলল, 'তাহলে কিছুই জমত না?'
করবী মাথা নাড়ল, 'না। মোটেই হিসেবী ছিলেন না। আমার হাতে দু চার টাকা থাকলে তা চেয়ে নিয়ে খরচ করে ফেলতেন।

বছর দুই আগে এক বন্ধুর পাল্লায় পড়ে হাজার আড়াই টাকার ইনসিওরেন্স শুরু করে গেছেন। তাই কেবল সম্বল। সে টাকা ইনসিওরেন্স অফিসেই পড়ে আছে। তা যদি এখনই ভাঙি, পরে বিপদে আপদে—'

অরুণ বাধা দিয়ে বলল, 'না না, সে টাকা এখনই খরচ করবেন কেন। সে কোন কাজের কথা নয়।'

একটু বাদে বলল, 'আচ্ছা আপনাদের কোন আত্মীয় স্বজন নেই ?' এতদিন যা বলেনি, সে সব কথাও আজ ধীরে ধীরে বলতে লাগল করবী। আত্মীয় স্বজন থাকবে না কেন, আছেন। বাবা আছেন দাদা আছেন। কিন্তু প্রত্যেকেরই অল্প আয় সংসারে খাইয়ে বেশি। এই দুর্দিনে তাঁদের কারো গলগ্রহ হওয়ার ইচ্ছে নেই করবীর। শ্বশুরকুলে স্বামীর দূর সম্পর্কের কাকা একজন আছেন। কিন্তু তাঁরও ঠিক একই রকম অবস্থা। তাছাড়া অনেক দিন আগে থেকেই তাঁরা পৃথগন্ন। আজ দুর্দশায় পড়েছে বলেই করবীরা তিন চার জনে সেখানে গিয়ে উঠতে পারে না। ভিতরে ভিতরে শাশুড়ীরও তা ইচ্ছে নয়। তাই করবীকে নিজের পায়েই দাঁড়াতে হবে। নিজের রোজগারেই চালাতে হবে সংসার। শাশুড়ী প্রথম প্রথম আপত্তি করেছিলেন, কিন্তু এখন চার দিক দেখে শুনে মত দিয়েছেন। ভালো জায়গায় ভদ্র রকমের চাকরি টাকরি কিছু যদি পায় করবী তো করুক। কিন্তু শাশুড়ীর সম্মতি পেলে কি হবে, চাকরি যে পাওয়া যাচ্ছে না। কালীঘাটে একটি গার্লস স্কুলের হেডমিস্ট্রেসের সঙ্গে জানাশোনা আছে করবীদের। কলেজে এক সঙ্গে পড়ত। সেই রেবা সেনের কাছেই গিয়েছিল করবী। তার স্কুলে একজন টিচারের দরকার হতে পারে বলে রেবা জানিয়েছিল। কিন্তু করবীকে হতাশ হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে। রেবাদের স্কুলে এখন কোন টিচার নেওয়া হবে না। সেক্রেটারী পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন কম লোক নিয়েই এখনকার মত কাজ চালিয়ে নিতে হবে।

পরে নতুন বছরের শুরুতে দেখা যাবে চেষ্টা করে। কিন্তু তার তো আরও তিন চার মাস দেরি। ততদিন চলবে কি করে।
সব শুনে অরুণ বলল, 'আপনি এতদিন বলেন নি কেন।' করবী একটু হাসল, 'বললেই বা কি করতেন। আপনি নিজেই তো চাকরি খুঁজছেন।'
অরুণ বলল, 'সেই সঙ্গে আপনার চাকরিও খুঁজতুম।'
করবী বলল, 'সে খোঁজার সময় তো এখনও যায় নি।'
অরুণ বলল, 'তা ঠিক, আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞেস করি। কিছু মনে করবেন না। কতটা অবধি পড়াশুনো করেছিলেন?'
করবী একটু লজ্জিত হয়ে বলল, 'সে আর জিজ্ঞেস করবেন না। ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করেছিলাম। তার পর আর এগোয় নি। আমার খুবই ইচ্ছে ছিল। কিন্তু কেবল একজনের ইচ্ছেতেই তো হয় না।'
মৃত স্বামীর বিরুদ্ধে একটু অভিযোগের ইঙ্গিত দিয়ে করবী চুপ করল। অরুণ বিস্মিত হয়ে ভাবল করবীর সাহস তো কম নয়, এই বিদ্যায় আজকালকার দিনে চাকরি জোগাড় করে সে পরিবার প্রতিপালন করতে চায়। স্কুলে যদি চাকরি জোটেই তাহলেই বা কত টাকা মাইনে হবে। বড় জোর চল্লিশ, তাতে কি করে সংসার চালাবে করবী, নিজের ভাবনার চেয়ে মুহূর্তের জন্যে করবীর সমস্যাই যেন বেশি হয়ে উঠল অরুণের কাছে।
একটুকাল চুপ করে থেকে করবী বলল, 'দু' একটা অফিসেও এর মধ্যে ইণ্টারভিউ দিয়ে এসেছি। বলেছিল তো খবর দেবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন চিঠিপত্র পেলাম না। অন্তত আপনার মত একটি টিউশনি পেলেও হোত। তার জন্যেও খোঁজ খবর করছি, কিন্তু যখন জোটে না তখন কিছুই জুটতে চায় না।'
অরুণ বলল, 'তা ঠিক। আচ্ছা আপনি করবেন টিউশনি?'
করবী বলল, 'পেলে নিশ্চয়ই করব। আছে নাকি আপনার হাতে?'

অরুণ বলল, 'হাতে মাত্র একটি টিউশনিই আছে। ওইটিই আপনি করুন না। বলুন যদি রাজী থাকেন বলে কয়ে ঠিক করে দেই। বাড়ির কাছে আছে। তিরিশ টাকা করে পাবেন।'
করবী বলল, 'তা না হয় পেলাম। কিন্তু ছেলের জন্যে মেয়ে টিউটর ওরা রাখবেই বা কেন?'
অরুণ বলল, 'এতদিন পুরুষ টিউটরেরা তো ওকে একেবারে বিদ্যা দিগ্‌গজ করে ছেড়েছে, এবার আপনাদের একটা চান্স দেওয়া ভালো।'
করবী একটু হেসে বলল, 'তাই নাকি। কিন্তু খুব যে উদারতা দেখছি, আপনার নিজের টিউশনি আমাকে ছেড়ে দিতে চাইছেন।'
অরুণ বলল, 'আপনার প্রয়োজন আমার চাইতে বেশি সেইজন্যে।'
করবী বলল, 'সত্যিই কি তাই। না, তিরিশ টাকার একটি বাজে টিউশনি বলে ছাত্রকে ম্যানেজ করতে পারছেন না বলে ছেড়ে দিয়ে রেহাই পেতে চাইছেন? এই যদি তিনশ টাকার একটি মোটা চাকরি হোত তাহলে প্রাণ ধরে দিতে পারতেন আমাকে?'
করবীর কথার ভঙ্গিতে পরিহাসের সুর। অনেক দিন পরে, সেই উচ্ছল তারল্য যেন ফিরে এসেছে ওর ভাষায় ভঙ্গিতে। অরুণ বলল, 'নিশ্চয়ই পারতাম।'
পরিহাস-প্রিয় সেও বড় কম নয়। কিন্তু এই মুহূর্তে তার কথার ধরনটা মোটেই ঠাট্টার মত শোনাল না। সে যেন করবীকে সত্যিই নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে যে তেমন একটা দামী চাকরিও অরুণ করবীর জন্যে ছেড়ে দিতে পারে।
করবী অরুণের দিকে একবার চেয়ে তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিল। সে যেন এমন নিশ্চিত আশ্বাস আশা করে নি। পরিহাসের জবাবে অরুণের কাছ থেকে পরিহাস চেয়েছিল।
অমনভাবে একথাটা বলে ফেলে অরুণ নিজেও কম অপ্রস্তুত হয় নি। এবার যাওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'চলি।'

করবী বলল, 'সে কি চা-টা খেয়ে যাবেন না?'
অরুণ বলল, 'না, আজ আর সময় হবে না, আজ যাই।'
করবী আর তেমন অনুরোধ করল না, বলল, 'আচ্ছা।'
দুয়ার পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বলল, 'আসবেন তো আর একদিন?'
অরুণ সংক্ষেপে বলল, 'আসব।'

সকালবেলা চা খেয়ে অতুল এক পাশ দিয়ে বেরিয়ে পড়ছিল, বাসন্তী রেশনকার্ড আর রেশনব্যাগগুলি হাতে নিয়ে তাড়াতাড়ি এসে পথ আগলে দাঁড়ালেন, 'কোথায় যাচ্ছিস অতুল?'
অতুল বলল, 'আমার কাজ আছে মা।'
বাসন্তী কঠিন ভঙ্গিতে বললেন, 'তোমার কাজের মধ্যে তো সারা শহর টো টো করে ঘুরে বেড়ানো আর সব বদ জায়গায় আড্ডা দেওয়া। সে কাজ পরে করলেও চলবে। আজ রেশন না নিয়ে এলে এবেলা হাঁড়ি চড়বে না।'
অতুল বলল, 'না চড়ে তো আমি কি করব। আমি তো প্রত্যেক সপ্তাহেই রেশন আনি। আজ আর কাউকে বলো না।'
বাসন্তী বললেন, 'আর আবার কাকে বলব। মণীন্দ্র বাজার করে দিয়ে ওরই কি একটা দরকারী কাজে বেরিয়েছে। শঙ্কু-বঙ্কু পড়ছে, কে আনবে রেশন।'
অতুল বলল, 'কেন বড়বাবু তো তাঁর ঘরে বসে বসে কাগজ পড়ছেন, আর গল্প করছেন। তাঁকে বলো না।'
বাসন্তী বললেন, 'সে কোনদিন এ সব এনেছে যে আজ আনবে। আর কথায় কথায় তুই নান্তুর সঙ্গে তুলনা করিসনে অতুল। তোর মুখে তুলনাটা শোভা পায় না।'
মার দিকে স্থির দৃষ্টিতে একটুকাল তাকিয়ে থেকে অতুল বলল, 'শোভা পায় না?'
বাসন্তী কর্কশ কণ্ঠে বললেন, 'পায়ই তো না, হাজারবার পায় না।

পায় কি না পায়, তা তুই বুঝিসনে? বেয়াদপ বাঁদর ছেলে কোথাকার, আবার আমাকে চোখ রাঙাচ্ছিস, লজ্জা করে না তোর!'
বাড়ির আর সব ছেলেমেয়েরা অনেকেই ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল। অতুলের মনে হলো, সবাই তার এই অপমানে মজা দেখছে।
রাগে সে-ও চেঁচিয়ে উঠল, 'তুমি অমন যখন তখন সকলের সামনে আমাকে যা তা বলে গালাগাল কোরো না মা, করলে ভালো হবে না বলে দিচ্ছি।'
বাসন্তী বললেন, 'গালাগাল করব না! একশবার করব। গালাগালের কাজ করলেই গালাগাল খাবি।'
অবনীমোহন নেমে এলেন ওপর থেকে, 'কি ব্যাপার। সকাল থেকেই এমন চেঁচামেচি করছ কেন?'
বাসন্তী বললেন, 'করছি কি আর সাধে? রেশন আনা নিয়ে প্রত্যেক সপ্তাহে আমাকে এই হাঙ্গামা পোয়াতে হয়, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা ছিঁড়ে ফেলতে হয়। আমি আর পারব না। যেমন করে পারো রেশন আনাও।'
অবনীমোহন ছেলের দিকে তাকিয়ে গম্ভীরস্বরে বললেন, 'অতুল রেশন নিয়ে এসো। এ নিয়ে আর যেন কোনদিন কোন গোলমাল শুনতে না হয়।'
অতুল বলল, 'আমি পারব না, আমার কাজ আছে। দরকারী কাজ আছে।'

অবনীমোহন ছেলের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'এ কাজ তার চেয়ে অনেক বেশি দরকারী।'
অতুল উদ্ধতভাবে বলল, 'আমার কি দরকার না দরকার, তা আপনি কি করে বুঝবেন?'
এতক্ষণে অবনীমোহনেরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটল, বললেন, 'না, তা আমি বুঝিনে, বুঝতে চাইওনে। সংসারের দরকার যে না বুঝবে, এ

সংসারে তার জায়গা নেই, এ সংসারে তার খাওয়া-পরা জুটবে না, আমি স্পষ্ট বলে দিচ্ছি।'

অবনীমোহন ওপরে চলে গেলেন।

তাঁকে এমন অসহিষ্ণু হ'তে সহজে দেখা যায়নি। কিন্তু ইদানীং তিনিও বড় বিরক্ত হয়ে পড়ছেন। আর্থিক কৃচ্ছ্রতা যত বাড়ছে সকলেরই তত বেশি করে মেজাজ বিগড়াচ্ছে, অবনীমোহনও বাদ যাচ্ছেন না।

স্বামী চলে গেলে বাসন্তী ছেলের কাছে এগিয়ে এসে বললেন, 'দেখছিস তো উনি পর্যন্ত কি রকম রেগে গেছেন। যা ভালোয় ভালোয় রেশনটা এনে দিয়ে যে কাজ থাকে, তুই করগে।'

কিন্তু অতুল আর কোন কথা না বলে দোরের দিকে এগুতে লাগল। এতখানি অবজ্ঞা বাসন্তীর সহ্য হোল না, তিনি সদর পর্যন্ত এগিয়ে এসে বললেন, 'এ কিন্তু ভালো হোল না অতুল, মোটেই ভালো হোল না। তোমার বড় বাড়াবাড়ি হয়েছে। আজ আর খাওয়া জুটবে না এখানে বলে রাখছি।'

যেতে যেতে অতুল ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল, 'আচ্ছা আচ্ছা। না জোটে তো নাই জুটবে। না খেয়ে যদি উপোস করেও মরি, তোমাদের বাড়িতে আর পাত পাততে আসব না। তেমন কুকুর আমি নাই।' অতুল উত্তেজিতভাবে গলির ভিতর দিয়ে বেরিয়ে গেল। পথে নেমে একটা বিড়ি ধরিয়ে মনে মনে বলল, দূর শালার সংসার। মা বল, বাবা বল, ভাই বল, বোন বল, কেউ আপন নয় এখানে। সকলের সঙ্গে শুধু টাকার সম্পর্ক। টাকা থাকলে পরও আপন, না থাকলে আপনও পর।

আজ কিন্তু সত্যিই দরকারী কাজ ছিল অতুলের। আর্মেনিয়ান ঘাটে স্টীমার কোম্পানিতে কাজ করে সুরেন দাস। এক সময় একসঙ্গে পড়ত। কথায় কথায় সে-ই সেদিন বলেছিল, ভোরে উঠে আসিস

আমার শোভাবাজারের বাসায়। সঙ্গে করে মেসোমশাইর ওখানে নিয়ে যাব।

সুরেনের মেসোমশাই অফিসের হেড ক্লার্ক।

এর আগেও চাকরি দু' একবার যে অতুল না করেছে তা নয়, অফিসে কেরানীর কাজ জোটেনি। কারখানা,ফ্যাক্টরীতে কাজ জুটেছিল। কিন্তু জুটলে কি হবে, বেশি দিন কোন জায়গায় মন লাগিয়ে কাজ করতে পারেনি। ওপরওয়ালার সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করে কোনবার চাকরি ছেড়েছে, কোনবার চাকরি গেছে। একেকবার যে ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে ফের আর কোন কাজে যাওয়ার ওর ইচ্ছে হয়নি। বীতস্পৃহাটা কাটলে যখন ফের চেষ্টা শুরু করেছে, তখন আর শীগগির কিছু জোটেনি। বাড়িতে ইচ্ছে করেই এবারকার চেষ্টা চরিত্রের কথাটা কাউকে জানায়নি অতুল। তার ধারণা জানালে কেউ বিশ্বাস করবে না। সে যে কোন কিছু করবে কিংবা করতে পারবে এ বিশ্বাস বাড়ির ছেলে বুড়ো কারোরই আর নেই তার ওপর। তাই আগে থেকেই কথাটা ফাঁস করবার ইচ্ছে হয়নি অতুলের। ভেবেছে কোন একটা কাজকর্মে ঢুকে মাইনের টাকাটা মার হাতে তুলে দিয়ে কথাটা বলবে। তার আগে কাউকে কিছু জানাবে না। কিন্তু তার মন্ত্রগুপ্তির ফল একেবারে উল্টো হয়ে গেল। মা বকলেন, বাবা বকলেন, দু'জনেই খাওয়ার খোঁটা দিলেন। না, মাসে মাসে রোজগার করে টাকা না দেওয়া পর্যন্ত বাড়িতে আর খাবে না অতুল। ওদের সঙ্গে সম্পর্ক এই শেষ। ঘুরে ঘুরে শোভাবাজারে আনন্দ খাঁ লেনে সুরেনের বাসায় গিয়ে উপস্থিত হোল অতুল। সুরেন তখন সবে বেরোচ্ছে। খেয়ে-দেয়ে পান মুখে দিয়েছে একটা। সিগারেটও ধরিয়েছে।

অতুলকে দেখে বলল, 'কি করে, কি খবর?'

অতুল বলল, 'খবর তো তোরই কাছে।'

সুরেন বলল, 'হ্যাঁ, চল কিন্তু বড় দেরি করে ফেললি। মেসো-

মশাইর সঙ্গে এখন আর দেখা হবে না। তা ছাড়া আমাকেও আজ একটু সকাল সকাল বেরুতে হচ্ছে। তুই বেশ আছিস ভাই। চাকরির যা মজা। ঢুকে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি।'

হাঁটতে হাঁটতে দু'জনে ট্রাম লাইন পর্যন্ত এল।

অতুল বলল, 'তোর মেসোমশাইর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিবি বলেছিলি, চল না তোদের অফিসে। সেখানেই দেখা সাক্ষাৎ করব।'

সুরেন একটু এড়িয়ে যাওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'না না অফিসে এখন গিয়ে লাভ নেই। মেসোমশাইর সঙ্গে আমি তোর সম্বন্ধে আলাপ একটু করেও রেখেছি। কিন্তু এখন তো কিছু খালি নেই। খালি হলে তোকে খবর দেব।'

অতুল অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে বলল, 'তাহলে খেলার মাঠে তুই সেদিন নেহাৎই একটা বাজে কথা বলেছিলি। চাল মেরেছিলি বল।'

সুরেন মুহূর্তকাল বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'তুই বড় অভদ্র হয়েছিস অতুল। তোর সঙ্গে কথা বলাই মুশকিল। আচ্ছা আসিস আর এক দিন।'

বলতে বলতে একটা চলন্ত বাসে লাফিয়ে উঠল সুরেন, তার আর দাঁড়াবার সময় নেই।

বেলা বারটা পর্যন্ত এখানে ওখানে টো টো করে ঘুরে বেড়াল অতুল। ক্ষিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে। পকেটে মাত্র আনা দুই পয়সা ছিল সম্বল। চা আর বিড়ি খেতে তা শেষ করেছে। বার বার অতুলের ইচ্ছে করতে লাগল বাড়িতে ফিরে যায়। এতক্ষণে নিশ্চয়ই সকলের খাওয়া দাওয়া শেষ হয়নি। মা নিশ্চয়ই তার জন্যে ভাত বেড়ে রেখেছেন। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হোল, না। যে প্রতিজ্ঞা সে করে এসেছে তা আর সে ভাঙতে পারে না। বিশেষ করে বাবা ও কথা বলবার পর আজই এ বেলা গিয়ে আর খেতে বসা যায় না রান্নাঘরে। তাহলে কারো কাছেই আর তার মুখ থাকবে না। তার চেয়ে উপোস করা অনেক ভালো।

কিন্তু পেটটা বড় বেয়াড়া। মনের এত কঠোর সংকল্পকে কিছুতেই যেন সে আর রাখতে দেবে না। পা জোড়া নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাড়ির দিকে এগুতে লাগল অতুলের। আরপুলি লেন দিয়ে ঢুকে বাঁ দিকে মোড় ফিরতে গিয়ে সে ফের থমকে দাঁড়াল। আর একবার মনে পড়ল সকালের অপমানের কথা। ঘুরে দাঁড়াল অতুল। না. যাওয়া যায় না, কিছুতেই যাওয়া যায় না।

কাছেই মধু গুপ্ত লেনে গোবিন্দদের বাড়ি। অতুল ঠিক করল তাদের বাইরের ঘরে দুপুর বেলা কোন রকমে শুয়ে কাটিয়ে দেবে। রাস্তায় ঘুরে বেড়ালে ক্ষিদেটা আরো বাড়ে। তার চেয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকলে খানিকক্ষণ বোধহয় স্থির থাকা যাবে। তারপর বিকেলে যা হয় একটা ব্যবস্থা করে নেবে।

খানিকটা এগিয়ে পাটকেলে রংএর ছোট মত দোতলা একটা পুরান বাড়ির সামনে এসে কড়া নাড়ল অতুল, সঙ্গে সঙ্গে ডাকল, 'গোবিন্দ ও গোবিন্দ', কিছুক্ষণ কোন সাড়াশব্দ মিলল ন। তারপর একটু বাদে দরজার হুড়কো খোলার শব্দ হোল। পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের শ্যামবর্ণা স্বাস্থ্যবতী একটি তরুণী এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। পরনে খয়েরী রঙের শাড়ি। সদ্য স্নান সেরে এসেছে। একরাশ ভিজে চুল পিঠময় ছড়ানো। সিঁথির ফাঁকে সিঁদুরের দাগ। গোবিন্দের বড়দি রমা।

অতুলকে দেখে একটু হেসে বলল, 'ও তুমি। তা এই দুপুরের সময় কি মনে করে অতুল। এ কি চেহারা হয়েছে। এখনো বুঝি নাওয়া খাওয়া কিছু হয়নি?'

অতুল এত সব কথার জবাব না দিয়ে বলল, 'গোবিন্দ অফিসে বেরিয়ে গেছে নাকি রমাদি?'

রমা বলল. 'হ্যাঁ, সে তো সেই সকালে সাড়ে ন'টায় বেরিয়েছে। ভিতরে আসবে?'

অতুল একটু ইতস্তত করে বলল. 'হ্যাঁ, অনেক ঘোরাঘুরি হোল।

শরীরটা ভালো লাগছিল না ভাবলাম একটু জিরিয়ে যাই।'
রমা একটুকাল তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'আচ্ছা, ভিতরে এস।'

বাইরের ঘরে অতুলদের বাড়ির মতই একখানা তক্তাপোশ পাতা। একধারে গোবিন্দের বিছানাটা গুটানো রয়েছে। খুব বেশি রাত হয়ে গেলে বন্ধুর সঙ্গে অনেক দিন এই বাড়িতেই চলে আসে অতুল। গোবিন্দের বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে বাকি রাতটুকু কাটিয়ে দেয়। আজও কোন কথা না বলে বন্ধুর বিছানাটা পেতে নিতে যাচ্ছে অতুল, রমা বাধা দিয়ে বলল, 'ওকি হচ্ছে।'
অতুল বলল, 'শুয়ে একটু বিশ্রাম করে নিই রমাদি। তুমি তোমার কাজে যাও।'
গোবিন্দের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর থেকেই এ বাসায় অতুলের যাতায়াত আছে। শুধু যাতায়াত নয় বাসার প্রত্যেকটি লোকের সঙ্গেই বেশ ঘনিষ্ঠতা আছে অতুলের। এ প্রায় নিজেদের বাসার মতই। অতুলের মাকে সে মাসীমা বলে ডাকে, বাবাকে মেসোমশাই।
অতুলের কথার জবাবে রমা বলল, 'আমার কাজের কথা তোমাকে আর মনে করিয়ে দিতে হবে না অতুল। শুয়ে পড়লে চলবে না, ওঠো যা বলছি শোন।'
রমার গলায় আদেশের সুর।
অতুল রমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি বলছ।'
রমা বলল, 'এস, চান করে খেয়ে নেবে।'
অতুল বলল, 'বারে আমার তো কখন খাওয়া হয়ে গেছে।'
রমা বলল, 'হুঁ, খাওয়া যা হয়েছে তা মুখ দেখেই টের পাচ্ছি। আর দেরী না করে চলে এসো। যদি ভালোয় ভালোয় না আস, হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যাব বলে দিলুম।'

অতুল কৌতুক বোধ করে বলল, 'ঈস, খুব দেখি শক্তির বড়াই করছ। নাও তো হিড় হিড় করে টেনে কেমন গায়ের জোর দেখি তোমার।'

রমা অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হোল না, গম্ভীর-ভাবে বলল, 'হেয়েছে। এসো এবার।'

রমার বলবার ভঙ্গিতে ফের আদেশের সুর ফুটে উঠল। অতুল একটুকাল তাকিয়ে থেকে উঠে দাঁড়াল। সদর বন্ধ করে ভিতরের দিকে চলে গেল রমা। অতুল গেল পিছনে পিছনে।

তেলের বাটি আর গামছা অতুলকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'নাও। চৌবাচ্চায় জল রয়েছে। তাড়াতাড়ি দুঘটি ঢেলে নিয়ে চলে এসো। বাড়া ভাত ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

অতুল আর বেশি ভদ্রতা করল না। স্নান সেরে শুকিয়ে যাওয়া গোবিন্দের লুঙ্গিটা পরে রান্নাঘরে পিঁড়ি পেতে বসল। ভাত তরকারীর থালাটা ওর সামনে এগিয়ে দিল রমা।

অতুল খেতে খেতে বলল, 'আর সবাইর হয়ে গেছে? তুমি খেয়েছ? মাসীমা খেয়ে নিয়েছেন?'

রমা বলল, 'মার আজ বারের উপোস। সন্ধ্যা-টন্ধ্যা করে ওপরে ঘুমুচ্ছেন।'

অতুল বলল, 'আর তুমি?'

রমা বলল, 'আমার খবরে তোমার কি দরকার।' অতুল লজ্জিত হয়ে বলল, 'ঈস বড্ড ভুল হয়ে গেল রমাদি। তোমার নিজের ভাতই বোধ হয় আমাকে দিয়ে দিয়েছ। নিশ্চয়ই তাই।'

রমা কোন জবাব দিলনা।

অতুল বলল, 'ইয়ে, এক কাজ কর। তুমি এই থালা থেকে আলাদা করে তোমার জন্যে কিছু ভাত তুলে নাও। আমার সব লাগবে না। নাও আর একটা থালা নিয়ে এসো তাড়াতাড়ি।'

ভারি একটা আন্তরিক ব্যগ্রতা ফুটে উঠল অতুলের গলায়।

তার দিকে তাকিয়ে রমা বলল, 'তোমার স্পর্ধা তো কম নয় অতুল। আমি জাতে বামুন, বয়সে বড়। তুমি আমাকে পাতের প্রসাদ দিতে

চাইছ? আমি কি গোবিন্দ নাকি যে তোমার সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে খাব?'

বেশ একটু তিরস্কারের সুর রমার গলায়।

অতুল লজ্জিত হয়ে বলল, 'বড় ভুল হয়ে গেছে রমাদি।'

অতুলের অনুশোচনায় এবার একটু হাসল রমা, 'কোনটা ভুল হয়েছে অতুল? আমার ভাগের ভাত খাওয়াটা না আমাকে সঙ্গে খেতে ডাকাটা?'

অতুল বলল, 'সঙ্গে খেতে তো আমি ডাকিনি।'

রমা বলল, 'প্রসাদ খেতে ডেকেছ। ঈস. কি সম্মান!'

রমা হেঁসেলের কাজ সারতে লাগল।

অতুলের খেতে বেশি সময় লাগে না। তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে উঠে মুখ ধুতে গেল। ফিরে এসে বলল, 'আমি চললুম। তুমি এবার মন দিয়ে রান্নাঘর গুছাও।'

রমা বলল, 'এখনি যাবে?'

অতুল বলল, 'আবার কি, খাওয়ার সঙ্গে সম্পর্ক, খাওয়া তো হয়েই গেল।'

বলে অতুল আর দেরি করল না।

মিনিট দশেক বাদে রান্নাঘরের শিকল টেনে রমা বেরিয়ে আসছে, অতুল এসে সামনে দাঁড়াল। ওর এক হাতে দইয়ের ভাঁড়। আর এক হাতে মুড়কি আর মিষ্টির ঠোঙ্গা।

রমা বিস্মিত হয়ে বলল, 'ও আবার কি, পয়সা পেলে কোথায়?'

অতুল বলল, 'পয়সা আর কোথায় পাব। পরাণের কাছ থেকে বাকিতে নিয়ে এলুম। বললুম চাকরি বাকরি পেলে শোধ দেব। সে কটা দিন একটু সবুর করে থেক।'

রমা বলল, 'কিন্তু এই দুপুর বেলায় ওসব কে খাবে?'

অতুল বলল, 'কেন তোমারও কি বারের উপোস নাকি? খেয়ে দেখ ফলারটা ভাতের চেয়ে নেহাৎ মন্দ হবে না।'
রমা বলল, 'কিন্তু বাকিতে কেন আনতে গেলে। আমার কাছেই তো পয়সা ছিল।'
অতুল একথার কোন জবাব না দিয়ে বাইরের ঘরে চলে এল।
খানিকবাদে রমা এসে ঘরে ঢুকে বলল, 'ওকি, এরই মধ্যে বিছানা টিছানা পেতে ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?'
অতুল জবাব দিল, 'না ঘুমোব কেন, ভাবছি।'
রমা বলল, 'ওমা তোমার আবার ভাবনা চিন্তাও আছে নাকি? কি ভাবছ শুনি?'
অতুল বলল, 'ভাবছি হীরেন জামাইবাবুটা সত্যিই কি আহাম্মক, তোমার মত লক্ষ্মীমেয়ের মর্ম বুঝল না। ভলো প্লে করতে পারলে কি হবে, ভাল মেয়ে চিনবার তার ক্ষমতা নেই।'
রমা অতুলের দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে বলল, 'থাক ওসব পুরোন ভাবনা তোমার আর না ভাবলেও চলবে। পারো তো নিজের ভাবনাই শুয়ে শুয়ে ভাব আর ভাবতে ভাবতে ঘুমোও। এই রইল তোমার সুপুরি। আমি চললুম।'
অতুল বলল, 'একটু বসবে না?'
রমা যেতে যেতে জবাব দিল, 'না অনেক কাজ আছে।'
দোতলার সিঁড়িতে আস্তে আস্তে রমার পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল।
ঘরে ঢুকে রমা দেখল মা মেঝেয় বসে বালিশের ওয়াড় সেলাই করছেন।

রমা একটুকাল মা'র ক্ষয়ে যাওয়া নখগুলির দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'আচ্ছা মা উপোস-টুপোসের দিন একটু বিশ্রাম করলেও তো পারো, আমাকে বললে ওয়াড়টা কি আমি সেলাই করতাম না? না করিনে কোন দিন?'
কল্যাণী মেয়ের দিকে তাকালেন, 'আমি কি বলি যে তুই করিসনে?

তুই তো সবই করিস। নীচে কে এসেছে রে, অতুল বুঝি? তার গলা শুনলাম যেন।'
রমা একটু হাসল, 'হ্যাঁ অতুলই। বাড়ি থেকে আজ বুঝি রাগারাগি করে এসেছে। এখানে খেল।'
এমন আরো দু'একদিন হয়েছে। বাড়িতে ঝগড়া করে এ বাড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছে অতুল। ছেলের এই বন্ধুটির আবদার উৎপাত কল্যাণীকে প্রায়ই সহ্য করতে হয়। মেয়ের দিকে চেয়ে কল্যাণী বললেন, 'নিজের ভাত বুঝি ধরে দিলি তাকে। আর নিজে রইলি উপোস করে? দেখ কেমন লাগে। ব্রত-পার্বণের উপোস তো কোন দিন করিসনে—'
রমা বলল. 'ওসব ধর্ম-কর্ম আমার সহ্য হয় না মা, তোমার সয় তুমিই কর।'
কল্যাণী চটে উঠলেন, 'দেখ কোন কিছুরই বাড়াবাড়ি ভালো না। ধর্ম-কর্ম বাদ দিয়ে ম্লেচ্ছপনার ফল তো এই হোল। সব থাকতেও কিছু ভোগে এল না। সব দেখে-শুনেই তো দিয়েছিলাম। বি এ পাশ। দেখতে রাজপুত্রের মত চোহরা। ভালো চাকরি-বাকরি করত। কিন্তু সে যে এমন হবে তা কে জানত। সব আমার কপাল। নইলে এই বয়সে স্বামী-পুত্র নিয়ে নিজের ঘর-সংসার করবি, তা নয় এখানে পড়ে আছিস। দু'বেলা হাঁড়ি ঠেলছিস। হ্যাঁরে, চিঠিপত্র লিখে দেখবি নাকি আর একবার।'
রমা বিরক্ত হয়ে বলল, 'না মা। লেখালেখির আর কিছু নেই। তুমি চুপ কর। যা করছিলে তাই কর বসে বসে।' বলে নিজের ঘরে চলে এল রমা।
ছোট একটু ঘর। দেয়াল ঘেঁষে একখানা তক্তপোশ। তার উপর বিছানাটা গুটানো। মাথার কাছে একটি তাক। তার ওপর মোটা মোটা কয়েকখানা বই। রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবৎ, চৈতন্য চরিতামৃত। আর একখানা পকেট সংস্করণ গীতা। রমার বাবা

কেশব মুখুজ্যেই মেয়েকে বেছে বেছে এসব বই কিনে দিয়েছেন। বলেছেন, 'অবসর পেলেই এগুলি পড়বি। মন ভালো থাকবে, সব দুঃখের সান্ত্বনা পাবি।'

রমা বার দুই করে সব বই-ই শেষ করেছে। কিন্তু সান্ত্বনা কই। এখন আর পড়তে তার ইচ্ছা করে না। তার চেয়ে ঘরের কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকতেই তার ভালো লাগে। সংসারের প্রায় সমস্ত ভার তার হাতে ক্রমে ক্রমে ছেড়ে দিয়েছেন বাবা-মা। সংসারে কখন কি লাগবে, কোন্ জিনিস কখন আনতে হবে সব রমার কাছ থেকে শোনেন কেশববাবু। মাইনের টাকা এনে মেয়ের হাতেই তুলে দেন তিনি। স্ত্রীকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলেন, 'তোমার চেয়ে হিসেব-নিকেশ রমা অনেক ভালো বোঝে। ও সংসারের ভার নেওয়ার পর থেকে আমি নিশ্চিন্ত আছি।'

কেবল বাবাই নয়, এমন যে উড়ুনচণ্ডী গোবিন্দ সেও হাতখরচ বাদ দিয়ে মাইনের বেশির ভাগ টাকা তার কাছে জমা রাখে। এতদিন বেকার ছিল গোবিন্দ। মাসকয়েক হোল পোর্টকমিশনারে চাকরি পেয়েছে। সংসারের অবস্থাটা সচ্ছল না হোক, আগের চেয়ে বেশ একটু ভালো হয়েছে। খরচের টাকা সব রমার হাতে। বাপ-ভাইয়ের সংসারের সেই এখন সর্বময়ী কর্ত্রী। তবু কেমন যেন এক এক সময় ফাঁকা ফাঁকা লাগে। বিশেষ করে, অসহ্য লাগে বাবা-মা'র দীর্ঘশ্বাস আর মাঝে মাঝে সেই পুরোন ঘটনার উল্লেখ। সেসব কথা কেন ওঁরা তোলেন। তুলে আর লাভ কি।

দু' একদিনের কথা নয় আট বছর আগে শ্যামবাজারের চাটুজ্যে বাড়িতে রমার বিয়ে হয়েছিল। হীরেন সবে বি এ পাশ করে এম এ-তে ভর্তি হয়েছে; তার ঠাকুরমা জোর করে বিয়ে দিলেন। বললেন, 'কবে আছি, কবে নেই। তোর বউয়ের মুখ আমি দেখে যাব।'

দেখে শুনে রমাকেই পছন্দ হোল হীরেনের কাকার। তেমন সুন্দরী

নয়, কিন্তু লক্ষ্মীশ্রী আছে চেহারায়। তেমন লেখাপড়া জানা পাশটাশ করা নয়, স্কুলের সেকেণ্ড ক্লাস অবধি পড়েছে, কিন্তু কথায় বার্তায় বেশ বুদ্ধিমতী বলে মনে হয়। ঘর-সংসারের সব কাজকর্ম জানে। সাধারণ গৃহস্থ ঘরের পক্ষে এইরকম মেয়েই ভালো। দেখে হীরেনেরও তখন অপছন্দ হয়নি। বিয়ের পর বছর দুই দাম্পত্য-জীবন বেশ ভালোই কেটেছিল রমার। তার পরেই কপাল পুড়ল। তখন হীরেন সবে পাশ করে বেরিয়ে একটি মার্চেণ্ট অফিসে চাকরি নিয়েছে। মাইনেটা মনের মত নয়, তাই নিয়ে খুঁৎখুঁতি আছে। রমা তাকে আশা ভরসা দেওয়ার ত্রুটি করছে না।

এই সময় এক কাণ্ড ঘটল। নতুন জায়গা থেকে নতুন আশ্বাস পেল হীরেন। পাড়ার ক্লাবের বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে থিয়েটারের আয়োজন চলছে। ছেলেরা ধরে পড়ল 'হীরুদা, আপনাকে হিরোর পার্ট নিতে হবে।' চেহারায় চলন-বলনে হীরেনকে নায়কের ভূমিকায় সবচেয়ে বেশি মানায়। কলেজের সোস্যালে অভিনয় করার অভ্যাসও যে এক-আধটু না ছিল তা নয়। কিন্তু হীরেন ইতস্তত করতে লাগল, 'দূর, এই বয়সে কি রঙ কালি মেখে থিয়েটার করা সাজে।' রমা বলল, 'একেবারে ঠাকুরদার বয়সী হয়ে গেছ না? ওরা যখন এত করে বলছে প্লেতে তোমাকে নামতেই হবে। তোমার অভিনয় তো কোনদিন দেখিনি। এবার একটু দেখাও।'

দু' একটা মহড়া হীরেনদের বাড়িতেই হোল। রমার উৎসাহের অন্ত নেই। অন্দর থেকে চা পান জোগায়। কথা হোল রমার দু' একখানা ভালো শাড়িও দিতে হবে শম্ভুকে। শম্ভু নাটকের নায়িকা। রমা তাতেও রাজী। হীরেন বলল, 'হ্যাঁ, তাই দাও, তবু যদি ওকে দেখে খানিকটা তোমার আদল মনে আনতে পারি। ওই দাড়ি গোফ চাঁছা মুখের দিকে তাকিয়ে কি গলা দিয়ে প্রেমালাপ বেরোয়?' রমা বলল, 'কি সর্বনাশ। প্রেমালাপ করবার জন্যে তুমি কি সত্যি একজন মেয়ে চাও নাকি?'

প্রথমে অবশ্য সত্যিকারের মেয়ের দরকার হোল না। মেয়ে-বেশী শম্ভুর দিকে চেয়ে চেয়েই হীরেন দুশেন এমন চমৎকার প্রণয় নিবেদন করল যে, রমার মনে হোল তেমন ভালোবাসার আকুলতা হীরেন তার কাছেও কোনদিন দেখায় নি। শ্রোতারা বহুবার হাততালি দিল। প্রবীণ সিনেমা ডিরেক্টর শচীরঞ্জন চবর্তীও তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। হীরেনের অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে একটি সোনার মেডেল ঘোষণা করলেন আর হীরেনকে বললেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। দেখা করে এসে সুখবরটা স্ত্রীর কাছেই সবচেয়ে আগে বলল হীরেন। তার অভিনয় শচীরঞ্জনের খুবই পছন্দ হয়েছে। তিনি তাকে তাঁর নতুন ছবিতে উপনায়কের ভূমিকায় মনোনীত করেছেন।

রমা খুশি হয়ে বলল, 'সত্যি!'

মাস কয়েকের মধ্যেই ছবি রিলিজও হোল।

বক্সে স্বামীর পাশে বসে তার অভিনয়ের চিত্ররূপ উপভোগ করল রমা। এবার আর শম্ভুবেশী হিরোইন নয়, সত্যিকারের সুন্দরী তরুণী নায়িকা পেয়েছে হীরেন। হয়তো সেইজন্যেই তার অভিনয়-দক্ষতা আরো বেশি দেখাতে পেরেছে। সে ছবিতে নায়কের চেয়েও উপনায়কের নাম হোল বেশি বেশি। আর পরের ছবিতে নায়কের ভূমিকায় উত্তীর্ণ হোল হীরেন। শমিতাই রয়ে গেল নায়িকা। শুধু পর্দায় নয় জীবনেও। স্টুডিওর কাজ ছাড়া অন্য সময়েও হীরেন তার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে লাগল, তার বাড়িতে যাতায়াত চলল ঘন ঘন। কোন কোন রাত্রে এমনও হোল যে হীরেন আর বাড়ি ফিরল না। রমা উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কাল কোথায় ছিলে?' হীরেন বলল, 'স্টুডিওতে, শুটিং ছিল।'

রমা প্রতিবাদ করে বলল, 'মিথ্যে কথা। কাল কোন শুটিং ছিল না তোমার। আমি খবর নিয়েছি।'

হীরেন অম্লান মুখে বলল, 'তাহলে আর মিছামিছি জিজ্ঞেস করছ কেন।'

রমা বলল, 'আমার কপাল যে এমন করে পড়বে তা কোনদিন ভাবিনি। তুমি সিনেমা ছেড়ে দাও।'
হীরেন বলল, অসম্ভব। একমাত্র অভিনয়ের মধ্যেই যা কিছু দেওয়ার আমি দিতে পারব। এতদিনে নিজের পথ আমি খুঁজে পেয়েছি।'
কিন্তু সে পথের সঙ্গী রমা নয়, শমিতা। হীরেন অফিসের চাকরি আগেই ছেড়ে দিয়েছিল; এবার বাড়ি আসাও প্রায় ছাড়ল। মাসে দু একদিন যখন তার দেখা পাওয়া যায় না রমা বলল, 'তুমি মদও ধরেছ?'

হীরেন বলল, 'একে ঠিক ধরা বলে না, বলে ছোঁয়া। স্টুডিওতে কাজ করতে হলে এসব একটু আধটু ছুঁয়ে দেখতে হয়।'
দিদিশাশুড়ী এসব দেখবার জন্যে বেঁচে ছিলেন না। শাশুড়ী, খুড়-শ্বশুর রমাকেই গঞ্জনা দিতে লাগলেন। পুরুষের মন তেমন করে বেঁধে রাখবার ক্ষমতা রমার নেই বলেই হীরেনের মন অন্য দিকে গেছে। নইলে সে তো এর আগে এমন ছিল না।

রমা চুপ করে এই খোঁটা সহ্য করল। তারপর হীরেন যখন বাড়ি আসা একেবারে ছেড়েই দিল, খবর পাওয়া গেল শমিতাকে নিয়ে সে ভিন্ন সংসার পেতেছে তখন আর তার সহ্য হোল না, বাবাকে খবর দিয়ে আনিয়ে বলল, 'আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাও বাবা। আমি আর টিকতে পারছিনে।'

কেশববাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'চল, তুই আমার কাছেই থাকবি।'
রমার শাশুড়ী বাধা দিয়েছিলেন, 'এটা কি ভালো হোল বেয়াই। তবু এখানে থাকলে আমরা চেষ্টাচরিত্র করে দেখতে পারতাম।'
কেবশবাবু বললেন, 'চেষ্টা আপনারা তো যথেষ্টই করেছেন। আর কিছু করবার নেই।'

রমাও বলল, 'তুমি আমাকে নিয়ে যাও বাবা। নামমাত্র শ্বশুরবাড়িতে আমি আর থাকতে চাইনে।'

কেশববাবু বললেন, তাই চল। আমার যদি দু'মুঠো জোটে, তোরও জুটবে।'

বাড়িতে এনে সংসারের ভার কেশববাবু বড় মেয়ের ওপর ছেড়ে দিলেন। বললেন, 'আজ থেকে মনে করব আমি তোর বিয়ে দিইনি। মনে করব, আমার জামাই মরে গেছে। ওই দুশ্চরিত্র লোকটার হাতে আমি আর তোকে ছেড়ে দেব না। সে যদি পায়ে ধ'রে এসে সাধে তবুও না।'

কিন্তু সাধাসাধির লক্ষণ হীরেনদের পক্ষ থেকে দেখা গেল না। কুশলী অভিনেতা হিসাবে তার খ্যাতি প্রতিপত্তি ক্রমে বাড়তেই লাগল। রমার মা কল্যাণী আক্ষেপ করে বললেন, 'সংসারে ধর্মাধর্ম কিছু নেই, নাহলে এমন পাপীর নামও লোকের মুখে মুখে ঘোরে। তারও এত শ্রীবৃদ্ধি হয়।'

রমা একটু হাসল, 'অনর্থক পরকে হিংসে করে লাভ কি মা। শুধু কি শাপ দিয়ে তুমি কারো উন্নতি আটকাতে পারবে।'

শাশুড়ীর অসুখের সময় আরও একবার শ্বশুরবাড়িতে গিয়েছিল রমা। কল্যাণীই জোর ক'রে তাকে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু রমা বেশিদিন সেখানে থাকেনি। যেখানে আবাহনও নেই, বিসর্জনও নেই সেখানে কে ক'দিন টিকতে পারে। ফিরে এসে বাপের সংসারের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছে রমা। ছোট বোন ইলার বিয়ে দিয়েছে। আরো যারা ছোট ছোট বেণু, মনু, রুচি, রীতি তাদের সেবা, যত্ন, পড়া-শুনোর ভার নিয়েছে। বাকি জীবন এইভাবে এদের নিয়েই কাটিয়ে দেবে রমা। আগে অসহ্য লাগত। এখন ক্রমে ক্রমে সবই সয়ে যাচ্ছে। বিবাহিত জীবনের কথা, স্বামী সংসারের কথা এখন আর রমার মনেও পড়ে না। মনে করতেও সে চায় না। কিন্তু মনে করিয়ে দেওয়ার লোকের অভাব নেই। নিজের মা-বাবা আছেন, পাড়া-পড়শীরা আছে। তারা মাঝে মাঝে আফসোস করে, 'আহা এমন মেয়ের এমন পোড়া ভাগ্য।'

সামনে থাকলে রমা প্রতিবাদ করে, 'ভাগ্য আমার খারাপ দেখলেন

কোথায় মাসীমা। আমি তো বেশ আছি।' প্রতিবেশিনী মাসীমা আর কোন জবাব দেন না।

আশ্চর্য, এটা শুধু মুখের কথা নয় রমার। তার চালচলন আচার আচরণেও কোন রকম দুঃখ ক্ষোভ নৈরাশ্যের অভিব্যক্তি চোখে পড়ে না। সে সংসারের কাজকর্ম করে, পাড়াপড়শীর আনন্দে, আহ্লাদে বিয়ে চুড়োয় যোগ দেয়, অসুখ বিসুখে সময় পেলে সেবা-শুশ্রূষা করে।

পড়শীরা বলে, 'ধন্যি মেয়ে বাবা। আর কেউ হলে দুঃখে মরে যেত, ঘর থেকে বেরুত না।'

এসব মন্তব্য কানে গেলে রমা স্পষ্ট জবাব দেয়, 'কেন, না বোরোবার কি হয়েছে। আমার লজ্জা কিসের যে আমি ঘরের কোণে মুখ লুকিয়ে থাকব। স্বামী তো আমাকে ত্যাগ করেনি, আমিই দুশ্চরিত্র স্বামীকে ছেড়ে চলে এসেছি। আমি কেন লজ্জা করতে যাব।'

কথাটা ঠিক। তবুও এত তেজ, এত স্পর্ধা সকলের কানে ভালো শোনায় না। এমন কি কল্যাণীর কানেও মাঝে মাঝে বড় খারাপ লাগে। নিজের দুর্ভাগ্যে মেয়েটা যদি মুখ বুজে মৃতপ্রায় হয়ে থাকত, দিনের মধ্যে কয়েকবার সান্ত্বনা দিয়ে ওকে সকল ক'রে তুলতে হোত, এ অবস্থায় তাই যেন স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু রমা একেবারে উল্টো। বড় শক্ত ওর দেহের গড়ন, নিষ্ঠুর ওর প্রাণ। মেয়ে হয়েও যেন মেয়ে নয়, কিংবা আজকালকার মেয়েরা এই রকমই হয়। কল্যাণী মাঝে মাঝে ভাবেন ওর এই অতিরিক্ত তেজ আর সাহস, চড়া মেজাজ আর কড়া কথাই কি হীরেনকে বিমুখ করেছে। কিন্তু তাইবা বলেন কি করে। গোড়ায় এমন রুক্ষ, রুঠা প্রকৃতির মেয়ে তো ছিল না রমা। না কি ঘা খেয়ে খেয়েই ও এমন পাষাণ শক্ত হয়ে গেছে।

বিচিত্র নয়! নিজের ভাগ্যের সঙ্গে মোটামুটি একটা রফা করতে গিয়ে রমার মধ্যে এতটা কাঠিন্য এসেছে। কিংবা যতখানি কঠিন সে নয়, তার চেয়ে বেশি কাঠিন্যের ভাব দেখাতে তার ভালো লাগে। ছোট

ভাইবোনগুলিকে সে স্নেহ যেমন করে, দুষ্টামি করলে শাসনও কম করে না। শুধু মুখে নয়, মাঝে মাঝে কড়া রকমের চড়-চাপড়ও দেয়। তবু ভাইবোনগুলি ওর কাছ থেকে নড়তে চায় না। গোবিন্দ পর্যন্ত ওকে ভয় করে। আড়ালে আবডালে যাই করুক সামনে একেবারে পোষা বিড়ালের মত থাকে। গোবিন্দের অন্যান্য বন্ধুরাও তাই। কেবল অতুলের ধরন ধারন একটু আলাদা। গোবিন্দের এই গোঁয়ার বন্ধুটিকে কিছুতেই বাগ মানাতে পারেনি রমা। ওর ভয় ডর নেই। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাহস আর দুষ্টামি বুদ্ধিও বেড়েছে। এক আধটু ঠাট্টা তামাসা রমার সঙ্গেও করতে চায়। যখন তখন এসে খাওয়ার আবদার করে, মাঝে মাঝে দু' এক টাকা ধারও নিয়ে যায়। ওর ওপর আর এক ধরনের সস্নেহ প্রশ্রয়ের ভাব আছে রমার।

'তোমার ভাগের ভাত কেড়ে খেলাম বলে রাগ করে আর নিচেই গেলে না বুঝি। কি করছ বসে রমাদি। পান খাচ্ছ নাকি? আমাকে দাও একটা।' মেঝেয় বসে সত্যিই পান সাজছিল রমা, অতুলের গলার শব্দে মুখ ফিরিয়ে তাকাল, 'ঘুম হয়ে গেল?'

অতুল বলল, 'দূর, দিনে আমার কোনদিন ঘুম হয় না। চুপচাপ কতক্ষণ আর পড়ে থাকা যায়।'

রমা বলল, 'তাই বুঝি জ্বালাতে এলে?'

অতুল বলল, 'উহুঁ, জ্বালাবার মত সময় নেই আমার। পানটা পেলেই চলে যাব।'

রমা বলল, 'পুরুষ ছেলের পান খেতে নেই। আচ্ছা অতুল, তুমি কি এমনি করেই বখাটে ছেলের মত বেড়াবে? চাকরি বাকরি করবে না?'

অতুল বলল, 'চাকরি আমাকে কে দেবে যে করব। তুমি কিছু টাকা আমাকে ধার দাওনা, ব্যবসা করি।'

রমা একটু হাসল, 'হুঁ টাকার গাছ গজিয়েছে কিনা আমার কাছে। তা ছাড়া ধার দেওয়ার আর লোক পেলাম না।'

অতুল বলল, 'দাওনা। আমি কড়ায় গণ্ডায় শোধ করে দেব। ফাঁকি দেব না।'

রমা বলল, 'আচ্ছা দেখি, বিবেচনা করে। কিন্তু তার আগে তুমি আমার একটা কাজ করতো।'

অতুল বলল, 'কি কাজ?'

রমা বলল, 'রেশনটা এনে দাও। গোবিন্দ কখন ফেরে তার ঠিক নেই। অফিস থেকে বাবার ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে। তাছাড়া তাকে দিয়ে তো এসব কাজ হয় না। স্কুল থেকে মনু বেণু অবশ্য আসবে। কিন্তু ওদের খেলার সময়টা কাজ দিয়ে আটকে রাখতে ইচ্ছে করে না। তুমি যদি এনে দিতে—'

রমার গলায় একটু অনুনয়ের সুর ফুটে উঠল।

অতুল বলল, 'আমি আনব?'

'কেন তাতে তোমার মান যাবে নাকি?'

'না মান যাওয়া-টাওয়া কিছু নয়, কিন্তু জানো আজ সকালে রেশন আনা নিয়েই বাড়ির সকলের সঙ্গে ঝগড়া করে বেরিয়েছি।'

রমা বলল, 'ওমা তাই নাকি। ব্যাপারটা কি বলতো।'

অতুল সবিস্তারে সকালের ঘটনাটা বলতে লাগল। রমা সব শুনে বলল, 'তাহলে তো তোমাকে দিয়েই রেশনটা আনাতে হবে আমার। যেমন বেয়াদব অবাধ্য ছেলে, তেমনি তার শাস্তি হবে।'

অতুল বলল, 'আমাকে শাস্তি দিতে তোমার বুঝি খুব ভাল লাগে?'

'লাগেই তো।'

বলে উঠে গিয়ে রমা সত্যিই পাশের ঘর থেকে কার্ড আর ব্যাগগুলি নিয়ে এসে অতুলের সামনে ধরল।

অতুল রমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু কি দেখল তারপর বাধ্য ছেলের মত তার হাত থেকে ব্যাগ আর কার্ডগুলি গুছিয়ে নিয়ে তরতর ক'রে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল।

রমা মুখ বাড়িয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'তাড়াতাড়ি এসো কিন্তু অতুল। পারো তো পথে আবার কোন আড্ডায়-টাড্ডায় ভিড়ে যেয়ো।'
অতুল হাসিমুখে জবাব দিল, 'তাতো ভিড়বই, সে কথা কি তোমাকে বলে দিতে হবে।'
পকেট থেকে একটা বিড়ি বার করে ধরিয়ে নিল অতুল, তারপর চলল রেশনের দোকানে। কাজ করতে তার কোন আলস্য নেই, অনিচ্ছা নেই, একটু মুখের মিষ্টি পেলে সে সব করতে পারে। কিন্তু নিজের বাড়িতে কারো কাছ থেকে এমন একটা মিষ্টি কথার প্রত্যাশা যেন নেই অতুলের। রমাদিও তাকে হুকুম দেয়, তাকে দিয়ে নানারকম কাজ করিয়ে নেয়। কিন্তু যা বলে হাসিমুখে বলে, মিষ্টি করে বলে। সবাই বলে রমার রস কস নেই। কিন্তু অতুল মনে মনে জানে সে কথা সত্য নয়। এমন অনেক কাজ আছে যা অতুলকে দিয়ে রমার না করালেও চলে। তবু তার জন্যে বেছে বেছে সে অতুলকেই অনুরোধ উপরোধ করবে। অতুল বুঝতে পেরেছে তাকে অনুরোধ করতে রমার ভালো লাগে। রমা তাকে আর কিছু দিতে পারে না, তাই কাজ দেয়।
আজ নিয়ে এ বাসায় অতুলের তিন দিন তিন রাত কাটল। এক পাড়ায় হলেও পরেরই ত বাসা। কিন্তু অত সঙ্কোচের বালাই নেই অতুলের। পর মনে করলেই পর। ভোরবেলা ঘুম ভেঙে একটা কথা মনে পড়ায় অতুলের হঠাৎ হাসি পেল, আচ্ছা ওর অবস্থায় দাদা পড়লে কেমন হত? অবশ্য পরের বাসায় এমনভাবে অরুণের কোনদিন রাত কাটানোর কথাই ওঠে না, কিন্তু তবু যদি কোন দিন কোন কারণ ঘটত কি হত তাহলে? তার সেই বাড়ির পরিপাটি করা বিছানার শোকে ঘুম ত দূরের কথা শোয়াই হয়ে উঠত না। অতুলের সে বালাই নেই। পর মনে করলেই পর। একটু তলিয়ে ভেবে দেখলে অতুলের মনে হয় সবই এক, একই আকাঠার তক্তাপোশ এবাড়িতে-ওবাড়িতে। সাবেক কালের কেনা রং ওঠা সুতো বার হওয়া সতরঞ্চ পাতা। তাতে

তক্তাপোশের সবটা ঢাক্না পড়ে না কোন বাড়িরই। সকালে চায়ের বৈঠক, তার আয়োজন যতটা আড়ম্বর তার চেয়ে তিন গুণ। দু বাড়িতেই পাকা বাজার করিয়ের হুটপাট করে বাজারে ছোটা তারপর সাড়ে ন'টা একবার বাজলে হয় কে কোন দিক দিয়ে অফিসে ছুটবে দিশে পায় না। সময় ত এইটুকু, অথচ এরই মধ্যে শোরগোল কত। এটা হ'ল না, সেটা প'ড়ে রইল। অবশ্য তাদের বাড়ির তুলনায় এ বাড়িতে শোরগোলটা অনেকখানি কম। চারদিকে চোখ আছে রমাদির। কাজের একটা সিজিল-মিছিল আছে। টুকটাক্ কাজ কিছু কিছু এ ক'দিন অতুলকে করতে হচ্ছে বৈকি। কাল রমাদির কাছে কে বলে গেল এর মধ্যে কণ্ট্রোলের দোকানে কাপড় আসার কথা, অতুল দুপুরে গিয়ে খবর নিয়ে এসেছে আসেনি এখনও, কিন্তু এলে আর পড়তে পাবে না। না হয় রোজই গিয়ে একবার করে খবর নিয়ে এসে দেবে। অতুলের তাতে ক্লান্তি নেই।

হাত মুখ ধুয়ে এসে ঝোলান আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অতুল চুলটা ঠিক করে নিল। ছোট আয়না তা আবার নিচুতে টাঙান, কুঁজো হয়ে না দাঁড়ালে মুখ দেখা যায় না। গোবিন্দর ওজনে টাঙান, গোবিন্দটা বেশ একটু বেঁটে। ভাইবোন সবাই ওরা একটু বেঁটে ধরনের, এমন কি রমাদিও। কিন্তু আশ্চর্য হঠাৎ দেখলে কিন্তু রমাদিকে তা মনে হয় না। চেহারার সঙ্গে দৈর্ঘটা কিরকম মানিয়ে নেছে। মাথায় চিরুনি চালাতে চালাতে অতুল আড়চোখে চেয়ে দেখল গোবিন্দ এখনও ঘুমুচ্ছে। বেশ ভারি নিশ্বাস পড়ছে ওর। চিরুনি দিয়েই অতুল ওকে একটা খোঁচা মারল।

'নে ওঠ এবার, আর কত ঘুমুবি?'

খোঁচা খেয়ে ঘুম চটে গেল গোবিন্দর। জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, 'তুই দেখি বাবারও ওপর দিয়ে গেলি। সাতটাও ত বাজেনি বোধ হয়, এই ব্রাহ্মমুহূর্তে টেনে তুলে গঙ্গাস্নান করিয়ে আনার মতলবে আছিস নাকি?'

'গঙ্গাজল নয় গরম জল যে ওদিকে তৈরী হয়ে গেল।' অতুল রান্নাঘরের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল, 'নে উঠে পড়।'
চা তৈরী করে রমা একবার ওদের ডেকে গেছে। অতুলের ইচ্ছা ছিল ওদের দুজনের চা এ ঘরে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু গোবিন্দটা উঠতে দেরি করেই সব মাটি করল। অগত্যা রান্নাঘরেই যেতে হল। একটু উঁচু একটা মোড়ার ওপর বসে কেশববাবু চা খাচ্ছিলেন। অতুল ঘরে ঢুকতে মুখের কাপ না নামিয়েই বললেন, 'এস অতুল এস।'
মুখে অতুলকে অভ্যর্থনা করলেন বটে, কিন্তু তাঁর চোখ রয়েছে ছোট মেয়ে দুটির মুড়ির বাটির দিকে। কারো বাটি থেকে একটা মুড়ি মাটিতে পড়ছে কি ধমকে উঠবেন। কি জানি কেন লোকটিকে অতুলের মোটেই ভাল লাগে না। অতি সামান্য খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে অনর্থক চেঁচামেচি করেন। এদিকে দেখি সব ব্যবস্থাই রমাদির হাতে. অথচ মাঝখান থেকে কুট করে কি একটু বলেন আর অমনি গোলমাল লেগে যায়। লাগান অবশ্য মাসীমা, থামায় রমাদি। ধমকাতে তার বুঝি জুড়ি নেই। কোথায় লাগে অরুণের গলা, বাবা-মার মধ্যে কথা কাটাকাটি যখন হয় তখন অরুণও তো থামায়। কিন্তু রমাদির গলার তার আলাদা। চায়ের পেয়ালা অতুল হাতের তেলোর ওপর তুলে নিল। একটু পরে কেশববাবুই ফের কথা বললেন, 'শুনলাম কাল নাকি তোমাদের মণীন্দ্র এসেছিল তোমার খবর নিতে, গেলেই তো পারতে। বাপ-মার ওপর বেশি দিন রাগ করা কি ভাল?'
অতুল চট করে কোন জবাব দিল না। একবার রমার দিকে আবার মাসীমার দিকে চাইল শুধু। জবাব দিলেন মাসীমা, 'যাবেই বা কেন? মণীন্দ্রকে পাঠিয়েছে, কেন আর লোক ছিল না বাড়িতে? নাকি অন্য কেউ এলে মান যেত?'
কেশববাবু বললেন, 'তুমি চুপ কর, মান অপমানের কথা হচ্ছে না। বাড়ির ছেলে বাড়ি যাবে তার আবার মান অপমান কি? তোমার সব তাতেই বাড়াবাড়ি।'

অতুল হেসে বলল, 'আপনি থামুন মাসীমা, যেই আসুক বাড়ি আমি যেতাম না। বাড়ি আমি যাবও না।'

'তবে কোথায় যাবে ঠিক করেছ শুনি।' রমা হেসেই বলল কথাটা, কিন্তু ঢংটা অতুলের ভাল লাগল না।

অতুল যখনই গম্ভীরভাবে কোন কথা বলতে যায়, রমা তা হেসে উড়িয়ে দেয়। ওর কথা যেন কথাই নয়। রমার প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে অতুল বলল, 'গেলেই হল এক জায়গায়।'

'না হল না, তার চেয়ে লক্ষ্মী ছেলের মত বাড়িই যাও গিয়ে আজ।'

অতুল গুম হয়ে রইল।

কেশববাবু একবার ওর দিকে তাকালেন তারপর বললেন, 'আরে, আজ না যায় নাই গেল, এও তো নিজের বাড়ির মত। থাক না যে ক'দিন খুশি। তবে হ্যাঁ কাজকর্ম একটা দেখতে হবে বই কি।'

লোকটার কথাই এমনি উল্টো-পাল্টা, অতুল ভাবল। এক কথা বলে পরক্ষণেই সেটা সামলানর চেষ্টা। অতুলের আর সহ্য হল না, সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'দিন না একটা জুটিয়ে। আপনারও ত কত অফিস টফিসে জানাশুনা আছে।'

কেশববাবু মুখ নিচু করে হাসলেন। চেষ্টা চরিত্র করলে কোথাও কি আর জুটিয়ে দেয়া যায় না। কিন্তু তারপর সে ঝক্কি সামলাবে কে। যা মেজাজ, কোন দিন কাকে দু' ঘা বসিয়ে দেবে তার ঠিক কি? মুখে বললেন, 'দেব বই কি, খোঁজ পেলে কি আর এমন বসে থাকতে হবে? আমার কাছে গোবিন্দও যা তুমিও তাই।'

এতদিন অতুলেরও সেই ধারণাই ছিল। কিন্তু দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়ার পর অতুলের মনে কেমন যেন একটু খটকা লাগল। একটু আগে বাপের পিঠ পিঠ গোবিন্দও অফিসে বেরিয়ে গেছে। রমার রান্নাঘরের কাজ এখনও শেষ হয়নি, থালাবাসন নাড়ার শব্দ আসছে। তক্তাপোষের ওপর উঠে বসে অতুল একটা বিড়ি ধরাল। তবে কি ওর সকালবেলার ভাবনা ভুল? মেসোমশায় তাহলে খরচের দিকটা ভাবছে

না ত? ভাবলেও ত দোষ দেয়া যায় না। সে বাজার নেই, বোঝার ওপর শাকের আঁটিও আজকাল সয় না কোন সংসারে।

আঁচলে হাত মুছতে মুছতে রমা এসে সামনে দাঁড়াল। এতক্ষণে ওর খাওয়া শেষ হল, যে কাপড়ের আঁচলে হাত মুছছে রমা তার পাড়ের রং উঠে গেছে। কাপড়টা বেশ পুরোন হয়েছে বোঝা যায়। অতুল ওর হাতের দিকে চেয়ে রইল। কাজ করে করে আঙুলের ডগাগুলো কেমন ক্ষয়ে গেছে। নাঃ, সংসারের পিছনে খাটুনি আছে রমাদির। অতুল সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। আবার কোন ফরমায়েস করে বসবে কে জানে। কাজ করে দেয়, করে দিতে পারে বলে কি কেবল ফুট-ফরমাস খাটা যায়, না তা খাটতে ভাল লাগে? মেয়েলী কাজ অতুলের আসে না। গলির মুখে বেরিয়েই আবার পকেটে হাত পড়ল, বিড়ি নেই। বিড়ির আর দোষ কি? দু' আনার বিড়ি আর কতক্ষণ থাকে পকেটে। অতুলের ঐ আরেক রোগ, মন মেজাজ বিগড়ে গেলে ঝক্কি পড়ে বিড়ির ওপর। তখন হয়ত পাঁচ মিনিটেই দুটো টেনে শেষ করল। মোড়েই গোলোক দাসের বিড়ির দোকান। চেনা দোকানদার বিড়ি বাকিতেই কেনে। হিসেব গোলোকই রাখে, অতুলকে রাখতে হয় না। বেশ কিছু জমে গেলে দু'চার আনা দিলেই আবার চুপ করে থাকে কিছুদিন।

গোলোকের দোকানে এসে অতুল বিড়ি চাইল। 'গোলোকদা বিড়ি দাও তো চার পয়সার।'

চার পয়সার বিড়ি গুণে অতুলের হাতে দিয়ে গোলোক বলল, 'এই চার পয়সা নিয়ে কিন্তু টাকা পুরল।'

'পুরল তো কি হয়েছে। নিও দু' একদিন বাদে।'

কিন্তু ধমকে আজ আর দমল না গোলোক, অতুলকে ধমক দিয়ে উঠল. বিরক্ত হয়ে বলল, 'বাদে বাদে করেই ত দু' হপ্তা চালালে; তবু যদি আগের ছ' আনা পড়ে না থাকত।'

অতুল আজ কোন জবাব দিল না। এর জবাব তো মুখে নয়, হাতে

দিতে হয়। ওর দোকানের দড়ি থেকে অতুলের আর বিড়ি ধরানোর প্রবৃত্তি হল না। আরেকটু এগুতেই আমহার্স্ট স্ট্রীটে গিয়ে পড়ল। সামনের একটা বিড়ির দোকান থেকে বাঁ হাতে দড়ি তুলতেই শরিক দাঁড়াল আরেকজন, মাথায় অতুলের চেয়ে খাটই হবে। বয়সও কম। রেডিমেড্ ফ্রক, প্যাণ্ট, ইজেরের দোকান নিয়ে ফুটপাতে দাঁড়িয়েছে। ছোকরাকে অতুল চিনতে পারল না। বোধ হয় নতুন এসেছে। কথায় কথায় আলাপ করল ওর সাথে এ ব্যবসা মন্দ না, সম্বল বলতে বিশেষ কিছুই নেই। তবু ক'রে তো খাচ্ছে!

দমদমে ফুরন করা দর্জি আছে। বড়বাজার থেকে নানা রকম ছিটের থান যায় সেখানে; আর রেডিমেড্ হাফ্ প্যাণ্ট, ইজের তৈরী হয়ে আসে। থান পেঁাছে দিয়ে তৈরী মাল নিয়ে আসার জন্যে অবশ্য আলাদা লোক আছে। অতুল বলল, 'সে তো বুঝলাম কিন্তু কাপড় কেনার তো টাকা চাই।'

ছেলেটি বলল, 'দু' একটা কিস্তি চালিয়ে নিতে পারলে তারপর বাকিও পাবেন। শেষে ত মাছের তেলে মাছ ভাজা আর কি।'

'কিন্তু রেডিমেড্ কটাই বা বিক্রী হবে।'

'কি যে বলেন' ছেলেটি হেসে বলল, 'ছাট-কাট যদি ভাল হয়, দোকানে দোকানে টেনে নেবে না আপনার মাল? তখন আর আপনাকে খুচরো বিক্রির আশায় বসে থাকতে হবে না।'

ছাটকাট ভালই হবে, ওদের ফ্রক প্যাণ্ট কাটে রমাদি। হ্যাঁ অনেক পাকা দর্জির চেয়েও ভাল হবে। অতুল ভাবল, রমাদির হাতের কাজ সে দেখেছে, বাসায় ভাই বোনদের ফ্রক্, প্যাণ্ট সবই তো রমাদি কাটে, তার হাতে সেলাই হয়। অতুল মনে মনে প্ল্যান ঠিক করে ফেলল। তাই করবে সে। চাকরির চেষ্টা তার দ্বারা হবে না। সুরেনের সেদিনকার ব্যবহারের কথা অতুলের মনে পড়ল। ঐ তো চাকরি তার ঠাঁট দেখলে গায়ে জ্বালা ধরে। এতক্ষণে অতুলের মনটা বেশ হাল্কা হয়ে উঠল। কাছেপিঠের দু' একজন বন্ধুর খোঁজ খবর

নিয়ে বিকেল হওয়ার আগেই অতুল ফের রমাদের বাসায় ফিরে এল। কড়া নাড়তে রমা এসে দোর খুলে দাঁড়াল। চোখ মুখ দেখে মনে হ'ল এইমাত্র ঘুম ভেঙে উঠে এসেছে। দোর খুলে দিয়েই রমা আর দেরি করল না, সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগল। পিছনে পিছনে অতুলও উপরে উঠে এসেছে। দোরের ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে অতুল বলল, 'ঠিক করে এলাম।'

রমা ফিরে তাকাল, বলল, 'কি চাকরি নাকি?'

'না তার চেয়ে ঢের ভাল জিনিস।'

'জিনিসটা কি শুনিই না আগে।'

'কিন্তু তাতে তোমাকে চাই' অতুল হেসে বলল।

অতুল তার প্ল্যান সমস্ত খুলে বলল রমাকে। রমার বিছানার শিয়রের দিকে ওদের হাতে চালানো সেলাই কলটা ঢাকনি মোড়া রয়েছে। শিগগির কোন কিছু করাও হয়নি। ওতে হাতও পড়েনি। সেদিকে চেয়ে রমা বলল, 'হ্যাঁ, এখন বসে বসে তোমার অর্ডারের প্যাণ্ট সেলাই করি। আর ত কোন কাজ নেই আমার।'

অতুল বলল, 'আরম্ভ করেই দেখ না। দেখবে এ কাজ তোমার ঐ পাঠ-টাটের চেয়ে খারাপ নয়।'

রমা হেসে বলল, 'আচ্ছা সে দেখা যাবে। এক্ষুণি তো আর কিছু হচ্ছে না। যাও নিচে যাও। একটু ঘুমুতে দাও দেখি।'

'যাচ্ছি, কিন্তু আমার কথাটা ভেবে দেখ।' বলে অতুল আর দাঁড়াল না। ভাববার সময় রমাকে মোটেই দিল না অতুল। পরদিনই এক থান ছিট কাপড় এনে রমার সামনে ফেলে দিয়ে বলল, 'নাও। গোটা কয়েক শার্ট তৈরি করো তো বসে বসে। কিছু প্রমাণ সাইজের আর কিছু আট-দশ বছরের ছেলেদের গায়ের মাপের।'

রমা অবাক হয়ে বলল, 'কাপড় কেনার টাকা কোথায় পেলে?'

অতুল বলল, 'ডাকাতি করেছি। কেন, এক থান কাপড়ের টাকা দেবার বন্ধুও কি আমার সারা শহরে নেই?'

তারপরে ব্যাপারটা খুলেই বলল অতুল। বউবাজার স্ট্রীটে রেডিমেড জামা আর ফ্রক-প্যাণ্টের দোকান আছে নিশানাথ নন্দীর, তার সঙ্গে অতুলের বহুদিনের বন্ধুত্ব। সে-ই এক থান কাপড় অতুলকে জোগাড় করে দিয়েছে। ভালো কাট-ছাঁট হলে বিক্রির ব্যবস্থা সেই করবে।

রমা বলল, 'আর যদি ভালো না হয়?'

অতুল বলল, 'তাহলে আমি ঘাড়ে করে সেগুলিকে শহরের পথে বিক্রি করে বেড়াব। কিন্তু ভালো হবেই-বা না কেন। তোমার হাত তো খারাপ নয়।'

রমা বলল, 'যত তোষামোদই কর, আমার দ্বারা ওসব হবে না। তুমি অন্য লোক দেখ। আমার আর খেয়ে না খেয়ে কাজ নেই, বসে বসে তোমার খামখেয়াল মেটাই। নিয়ে যাও তোমার থান কাপড়। যার জিনিস তাকে ফেরৎ দিয়ে এসো গিয়ে।'

কিন্তু অতুল সেকথা কানেই নিল না। যেন শুনতেই পায়নি, তেমনি ভঙ্গিতে বেরিয়ে গেল।

পুরো একটা দিন পড়ে রইল সে কাপড়। রমা হাত দিয়ে ছুঁয়েও দেখল না। কিন্তু অতুল নির্বিকার। ওর ভঙ্গি দেখে রমা চটে উঠে বলল, 'তোমার জিনিস আমার ঘর থেকে সরিয়ে নেবে তো নাও, নাহলে আমি জানালা দিয়ে ফেলে দেব বলে দিচ্ছি।'

অতুল বলল, 'বেশ! দিতে যদি পারো দাও।'

রমা বলল, 'আমি যেন হাত-পা গুটিয়ে বসে আছি। সংসারের কোন কাজকর্ম নেই। ওর মত বেকার হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াই। উনি আমাকে কাজ জুটিয়ে দিলেন।'

অতুল বলল, 'দিলামই তো। আমি রাস্তায় বেকার, তুমি ঘরে বেকার। তোমারই বা নিজের বলে কোন্ কাজ আছে। কিন্তু যদি কাজটা করতে পারো, তাহলে এক একটা শার্টে এক একটি করে টাকা। তোমার আট আনা থাকবে আমার আট আনা।'

রমা এবার ঠোঁট টিপে হাসল, 'ঈস ভাগাভাগির বেলায় তো জ্ঞানের

নাড়ি খুব টনটনে দেখছি। আমি খাটব, আমি তৈরি করব,'আর তুমি বুঝি আট আনা ভাগ পাবে?'

অতুলও হাসল, 'বেশ, কত দিতে চাও বল?'

রমা বলল, 'কত আবার কিছুই না।'

অতুল বলল, সর্বনাশ। একেবারেই বঞ্চিত করতে চাও নাকি।'

রমা অতুলের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে একটুকাল তাকিয়ে রইল। তারপর ধমকের সুরে বলল, 'এর আবার বঞ্চনা-অবঞ্চনার কি আছে। নেহাৎই যদি দিতে হয়, মুটে ভাড়ার এক আনা তুমি পাবে।'

অতুল বলল, 'বেশ তাই দিয়ো। যা দিয়ে তুমি খুশি থাক, তাই ভালো।'

রমা ভ্রূ কুঞ্চিত করে বলল, 'তাছাড়া আবার কি, কিন্তু তুমি যা ভেবেছ, তা হবে না। ওসব সেলাই-ফোঁড়াই কিছুতেই পারব না আমি।'

বলে রমা রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু দুপুর বেলায় খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে নিজের ঘরে ফিরে এসে ও অন্য দিনের মত বই নিয়ে শুয়ে পড়ল না। কাঁচি আর সেই ছিট কাপড়ের থান নিয়ে এসে বসল হ্যান্ড মেসিনের কাছে।

মেসিনের শব্দে বিরক্ত হয়ে কল্যাণী উঠে দোরের কাছে এসে দাঁড়ালেন, 'বলি তুই নিজেও একটুকাল ঘুমুবিনে, আর মানুষকেও ঘুমুতে দিবিনে, ভাবলি কি তুই?'

মেশিন চালাতে চালাতে রমা বলল, 'কেন, ঘুমোও গিয়ে। ঘুমোতে তো তোমাকে কেউ বাধা দিচ্ছে না।'

কল্যাণী মেয়ের শেষ কথাটির পুনরাবৃত্তি করে বললেন, 'বাধা দিচ্ছে না। পাশের ঘরে কানের কাছে কেউ অমন ঘট ঘট করতে থাকলে অন্য লোকে ঘুমোতে পারে! ছোট মেয়েটাকে অত করে ঘুম পাড়িয়েছি। সেও উঠে পড়ল বলে। তা পড়ুক। কিন্তু রমা, তোর নিজেরও তো দেহ বলে একটা বস্তু আছে। এত যদি দিনরাত খাটিস, এক মুহূর্তও একটু বিশ্রাম না দিস, দেহ টিকবে কি করে।'

রমা মার দিকে না তাকিয়ে মেশিন চালাতে চালাতে জবাব দিল, 'এ দেহ টিকিয়েই আর কি হবে মা।'
কল্যাণী একটুকাল চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। এই রুক্ষ, কঠোর স্বভাবের মেয়েটির গলা থেকে অমন করুণ আর কোমল সুর শুনে তাঁর মনটা অনেকদিন বাদে আবার যেন কেমন করে উঠল। সত্যি, কোন সুখ আছে ওর মনে যে, ও দেহের দিকে নজর দেবে, দেহের যত্ন নেবে। দিন ভর খাটে। কাজ-কর্মের ভিতর দিয়ে নিজের দুর্ভাগ্যকে ভুলে থাকতে চায়। এই বয়সে কোন সাধ নেই, আহ্লাদ নেই; সব থেকেও কিছুই নেই মেয়েটার। আস্তে আস্তে একটা নিঃশ্বাস ছাড়লেন কল্যাণী। করুক ওর যা খুশি, ও যেভাবে থেকে শান্তি পায়, থাকুক।
কল্যাণী নিজের ঘরে ফিরে গেলেন।

খানিক বাদে পা টিপে টিপে অতুল এসে দাঁড়াল; হেসে ললল, 'কি হচ্ছে। তবে নাকি কাপড়ে হাত দেবে না'
রমা ফিরে তাকাল, 'তুমি যা ভেবেছ তা নয়। নিজের জন্য একটা শেমিজ করে নিচ্ছি।'

অতুল বলল, 'তোমার জন্যে একটা সেমিজ কর, আমার আর গোবিন্দের জন্যে গোটা কয়েক শার্ট ব্যস। ওসব বেচাকেনার হাঙ্গামায় আর কাজ নেই রমাদি।'

রমা বিরক্ত হয়ে বলল, 'এরই মধ্যে শখ মিটল। ব্যবসা-বাণিজ্য করবার লোকই তুমি বটে। আজ এ-বুদ্ধি কাল সে-বুদ্ধি, দুনিয়ার কোন কাজ যদি তোমাকে দিয়ে হয়। যাও আমার চোখের সামনে থেকে সরে যাও তুমি। যা দেখতে পারিনে তাই।' বলে রমা ফের নিজের কাজে মন দিল।

অতুল সকৌতুকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ রমার রাগ আর বিরক্তিটা উপভোগ করল, তারপর এক সময় নিচে নেমে গেল। কাজের সময়

ওকে বাধা দিলে ও ভারি চটবে। কিন্তু এখন চটাতে চায় না অতুল। এগোক, তাই চায়। তাতে তারও দু'পয়সা হবে।

দিন কয়েকের মধ্যে গোটা কয়েক ছোট-বড় জামা তৈরি করে ফেলল রমা।
অতুল সেগুলি নিয়ে তার সেই বন্ধুর দোকানে জমা রেখে এল। রমা বলল, 'টাকা কই।'
অতুল বলল, 'বিক্রি হোক, তবে তো টাকা।'
টাকা যেদিনই পাক, রমা কিন্তু কাজে বেশ উৎসাহ পেয়ে গেছে। অবসর পেলেই ও মেশিনের কাছে গিয়ে বসে। সেখান থেকে নড়তে চায় না। এক থান কাপড় শেষ হোল তো এল আরো এক থান। এ থানের রঙ আর ছিটের নমুনা ভালো করে বুঝিয়ে দিল অতুলকে। একটানা একঘেয়ে জীবনে যেন বৈচিত্র্য এসেছে। বেঁচে থাকায় হঠাৎ যেন নতুন স্বাদ পেয়েছে রমা। কাটা কাপড়ের ব্যবসা চালান নিয়ে অতুলের সঙ্গে তার পরামর্শ চলে। দেখা যায়, অনেক বিষয়েই অতুলের চেয়ে তার বুদ্ধি বেশি। নিশাকান্ত পর্যন্ত তার হাতের কাজের তারিফ করে। মজুরি হিসাবে সপ্তাহে সপ্তাহে চার-পাঁচ টাকা করে দেয়ও।
টাকার অঙ্ক সামান্য। কিন্তু রমা যা স্ফূর্তি পেল, যা উৎসাহ জোগাতে লাগল অতুলকে, তা খুব সামান্য নয়। ক্রমে গোবিন্দ এসেও দলে ভিড়ল। বলল, 'এরকম ছেলেখেলা করে লাভ কি। ব্যবসা যদি করতে হয়, ভালো করেই কর। বাইরের ঘরটা তো পড়েই আছে। ওটিকে ব্যবহার কর তোরা। তুই নিজেও ছাঁটকাটের কাজটা শিখে নে। একটা ফুট মেশিন আনা, বসতে হলে ভালো করে জাঁকিয়ে বস।'
কিন্তু গোবিন্দ উৎসাহ দিলে কি হবে, তার বাবা কেশববাবু আপত্তি করতে লাগলেন। স্ত্রীকে ডেকে বললেন, 'হ্যাঁ বাকি আছে এখন ওই। বাড়ির মধ্যে কত কিইতো ঢুকিয়েছ, এবার একটা দোকান এনে ঢোকাও।'

কল্যাণী বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তোমার কথাবার্তার ধরনই আলাদা। তোমার বাড়িতে আমি আবার কি ঢোকালাম, যা করবার তোমার ছেলেমেয়েরাই করছে। আমাকে কেন দোষ দিচ্ছ।'

কেশববাবু বললেন, 'ভিতরে ভিতরে তোমার সায় না থাকলে কি কেবল ওরা কিছু করতে পারে। দিন নেই, রাত নেই, মেশিনের ঘট-ঘটানিতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। খেটেখুটে এসে বাড়িতে যে একটু সুস্থ-মত থাকব, তার জো নেই। আর ওই অতুলটাই বা ভেবেছে কি। ওকি চিরকালের জন্যে বাসা বাঁধল এখানে?'

কল্যাণী বললেন, 'পরের ছেলেকে দোষ দিচ্ছ কেন। ওতো কবে থেকেই যাই-যাই করছে। বলছে কোন হোটেলে মেসে গিয়ে থাকবে। কিন্তু গোবিন্দই তো যেতে দিচ্ছে না।'

কেশববাবু বললেন, 'কেবল গোবিন্দ কেন, তলে তলে তোমার মেয়েরও আস্কারা আছে।'

রমা কি একটা জিনিস নেওয়ার জন্যে এসেছিল, বাবা-মার কথাবার্তা কানে যেতেই দোরের আড়ালে সরে দাঁড়িয়েছিল। সব কথাই ওর কানে গেল।

একটু বাদে গম্ভীর মুখে এসে ঘরে ঢুকে বলল, 'কি হয়েছে বাবা।'

কেশববাবুর অমনিই সুর পাল্টে গেল, 'না-না, কিচ্ছু হয়নি। কি আবার হবে। আজ কি রান্না হচ্ছে মা।'

কল্যাণী মনে মনে হাসলেন। ছেলেমেয়ে দু'জনকেই ভয় করেন উনি। আড়ালে যতই হৈ-চৈ করুন সামনে কিছুই বলতে চান না।

রমা বলল, 'অন্য দিন যা হয় তাই হচ্ছে।' তারপর নিজের কাজ সেরে সোজা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কেশববাবু গলা নামিয়ে বললেন, 'শুনতে পেয়েছে নাকি?'

কল্যাণী হেসে বললেন, 'কি জানি?'

কেশববাবু বললেন, 'শুনতে পেলে আর রক্ষা রাখবে না। যা একখানা মা মনসা তোমার মেয়ে, তবে যাই বল, অতুলের কিন্তু চলে যাওয়াই

ভালো। শত হলেও বয়সের ছেলে। ঘরের মধ্যে সব সময় নড়া-চড়াটা আর যেন ভালো দেখায় না। লোকেই বা কি বলে।'

কল্যাণী বললেন, 'চুপ কর।'

তারপর ঈশারায় সামনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেখালেন। রমা যায় নি। বারান্দায় পিণ্টু-মিণ্টুর ভিজে ফ্রক্‌প্যাণ্টগুলি মেলে দিচ্ছে।

কেশববাবু তাড়াতাড়ি কথা পাল্টে বললেন, 'ঈস, কত বেলা হয়ে গেল। আজ লেট হতে হবে অফিসে, যাও তেল গামছা নিয়ে এসো।'

দুপুরের সময় অতুল খেতে এলে রমা মুখ গম্ভীর করে রইল। ব্যবসা সংক্রান্ত আলোচনাটা অন্য দিনের মত আর জমল না।

অতুল খেতে খেতে বার দুই জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কি হয়েছে রমাদি। জামা সেলাই করতে ঠোঁট দুটোও সেলাই করে রেখেছ নাকি, মোটেই কথাবার্তা নেই যে। নাকি খুব ক্ষিদে পেয়ে গেছে।'

রমা ধমকের ভঙ্গিতে বলল, 'চুপ করে খেয়ে নাও তো। সব সময় ইয়ার্কি ভালো লাগে না মানুষের।'

অতুল আর কোন কথা বলল না।

খাওয়া-দাওয়ার পর অতুল রমার ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল, রমা বলল, 'আমাকে জ্বালাতন কোরো না অতুল। আজ আমার শরীর ভালো না। আমি এখন ঘুমুবো। নিচের ঘরে সুপুরি রেখে এসেছি যাও খাও গিয়ে।'

অতুল মনে মনে হাসল। এই বদরাগী মেয়েটির মেজাজ দিনের মধ্যে কতবার যে বিগড়ায় তার হিসেব রাখা মুশকিল। হয়তো মা-বাবার সঙ্গে কথান্তর হয়েছে। তার শোধ নিচ্ছে অতুলের ওপর। কিন্তু এ সময় ওকে বেশি না চটানোই বুদ্ধিমানের কাজ। অতুল আর কোন কথা না বলে রমার সামনে থেকে সরে গেল। কিন্তু মেয়ের ঘরে দোর দেওয়ার শব্দ শুনে কল্যাণী এসে দাঁড়ালেন, 'ওকি, না খেয়েই তুই শুয়ে পড়লি যে।'

রমা ঘরের ভিতর থেকে জবাব দিল, 'আমি খাব না মা।'

কল্যাণী বললেন, 'কেন, এই দুপুর বেলায় না খেয়ে থাকার কি হয়েছে।'

রমা বিরক্তির ভঙ্গিতে জবাব দিল, 'খাওয়ার ইচ্ছে নেই তাই খাব না। তুমি যাও, খেয়ে নাও গিয়ে।'

কল্যাণী বললেন, 'তোদের ধরন দেখলে আমার গা জ্বলে যায় বাপু। পান থেকে চুন খসলে আর কথা নেই। অমনিই রাগ। কেন তোকে কে কি বলেছে যে তুই রাগ করে না খেয়ে থাকবি। কথাটা অন্যায় হয়েছে কি। সত্যিই তো পরের ছেলের দায়িত্ব আর কতদিন মানুষ নিতে পারে। সেজন্যে গোবিন্দকেই উনি দোষ দিচ্ছিলেন, তোকে তো কিছু বলেন নি। আয় উঠে আয় বলছি।'

রমা বলল, 'না আমি খাব না'।

'বেশ করো তোমাদের যা ইচ্ছে। যন্ত্রণা আমার আর সয় না।' বলে কল্যাণী নিজের ঘরে গিয়ে দোর ভেজিয়ে দিলেন। রমা যদি না খেয়ে রাগ করে থাকে তিনিও খেতে যাবেন না।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে দোর খুলে বেরিয়ে এল রমা তারপর রান্না ঘরে গিয়ে মার আর নিজের ভাত বেড়ে নিল।

কল্যাণী খেতে বসে বললেন, 'কেন কথায় কথায় অত রাগ করিস বল তো, উনি যদি কিছু বলে থাকেন, তোর ভালোর জন্যেই বলেছেন।'

রমা গম্ভীরভাবে বলল, 'হুঁ।'

খাওয়া দাওয়া সেরে সোজা নিজের ঘরে চলে গেল রমা। খানিকক্ষণ চুপ করে শুয়ে রইল। কিন্তু স্থির থাকতে পারল না। বাবার ওই ধরনের কথাবার্তার পর অতুলকে স্পষ্ট ক'রে তারই যেতে বলা উচিত। কিন্তু সেই বা কেন বলতে যাবে। বাবা নিজে বলতে পারেন না? অতুলের থাকা তিনি অপছন্দ করছেন সে কথা ওকে তিনি বলে দিলেই তো পারেন। সে সাহস বাবার নেই। গোবিন্দকে তিনি ভয় করেন। এই নিয়ে কোন কথা তুললেই গোবিন্দ হৈ চৈ করবে, সংসারে হঠাৎ

খরচপত্র দেওয়া বন্ধ করে দেবে। সেই ভয় আছে ওঁর মনে। কিন্তু
খরচপত্র দেওয়া বন্ধ করে দেবে। সেই ভয় আছে ওঁর মনে। কিন্তু
রমাকে তাঁর কোন ভয় নেই। কারণ তিনি জানেন রমাকে যত দোষারোপই করা হোক সে ঘর সংসারের কাজ বন্ধ করে থাকতে পারবে না। কারণ বাপ-ভাইর ভাতই তাকে খেতে হবে। তার আর কোথাও নড়বার উপায় নেই সে কথা তিনি জানেন বলেই মেয়ের ওপর মিছামিছি দোষারোপ করতে তাঁর বাধে না, কিন্তু রমাও এসব আর সহ্য করবে না, সেও এবার থেকে স্বাধীনভাবে থাকবার চেষ্টা করবে। খোঁটা শুনেই যদি ভাত খেতে হয় সে তো শ্বশুর বাড়িতে থেকেও তা খেতে পারত। দু'বেলা খাটলে, শাশুড়ীর খুড় শ্বশুরের যত্ন পরিচর্যা করলে সেখানেও তো ভাত কাপড়ের তার অভাব হোত না। কিন্তু তেমনভাবে থাকতে তার প্রবৃত্তি হয়নি বলেই সে বাপের বাড়িতে চলে এসেছে। বাপ-মা অবশ্য ঘর-সংসারের সব ভারই তার উপর তুলে দিয়েছে। কিন্তু একেক সময় রমার মনে হয় এ দান যেন বড়ই অনুগ্রহের দান। কোথায় যেন একটা লোক দেখান ভদ্রতার ভাব আছে এর মধ্যে। সন্তান স্নেহের চেয়ে সেইটাই বড়। কিন্তু সারাজীবন অন্যের এই সৌজন্যের বোঝা রমা বয়ে বেড়াবে কি করে? এখন বাপ যে সৌজন্য দেখাচ্ছেন, পরে ভাই সে সৌজন্য দেখাবে। কিন্তু একটু ত্রুটি বিচ্যুতি হলেই সেই সৌজন্যের মুখোশ মুখ থেকে খসে পড়বে সকলের। তখন এই কথাই স্পষ্ট হয়ে উঠবে স্বামী পরিত্যক্তা রমা ঐ বাড়ির আশ্রিত ছাড়া আর কেউ নয়। সে যতই খাটুক, সংসারের জন্যে যতই দিন রাত পরিশ্রম করুক, এ বাড়িতে তার সত্যিকারের কোন স্থান নেই। একবার যখন গোত্রান্তরিত হয়ে গেছে এ কুলে সে আর ফিরে আসতে পারে না।

হঠাৎ সেলাইর কল আর স্তুপীকৃত কাটা কাপড়গুলির ওপর ভারি রাগ হোল রমার। বাবা তার মুখের সামনে কিছু বলেন নি, কিন্তু আড়ালে এই নিয়ে রোজই বিরক্তি প্রকাশ করছেন। অথচ দু' চার টাকা যদি

এর থেকে হয়ই রমা তো আর তা সঙ্গে করে অন্য কোথাও নিয়ে যাবে না। তা এই সংসারের কাজেই লাগবে। কিন্তু দরকার নেই তা দিয়ে। দরকার নেই রমার কোন সাধ আহ্লাদে। নিজের পায়ে না দাঁড়ান পর্যন্ত নিজের ব্যবস্থা নিজে না করা পর্যন্ত সে এদের মর্জি মতই চলবে। নিজের পছন্দ থেকে নিজের ইচ্ছা থেকে কিছুই করবে না। জামার জন্যে কেটে রাখা কাপড়গুলি গুছিয়ে নিয়ে নিচে নেমে এল রমা। অতুল শুয়ে শুয়ে বিড়ি টানছিল, তার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'নাও, আমি আর পারব না, তোমার জিনিস তুমি নিয়ে চলে যাও।' অতুল বিস্মিত হয়ে বলল, 'সেকি কোনটা আধখানা সেলাই করে রেখেছ, কোনটার হাতই দাও নি। এগুলি নিয়ে কি করব, ওতো বিক্রি হবে না।' রমা বলল, 'না হয় রাস্তায় ফেলে দিয়ো। আমি আর কিছু করতে পারব না। তাছাড়া এ বাড়িতে তোমার আর থাকা হবে না। তুমি অন্য ব্যবস্থা করো।'

অতুল খানিকক্ষণ রমার দিকে তাকিয়ে কি দেখল তারপর বলল, 'ব্যবস্থা তো আমি কবেই করতাম। গোবিন্দই তো যেতে দিচ্ছে না।' রমা কঠিন স্বরে বলল, 'না যেতে দিচ্ছে না, ওঁকে কেউ জোর করে ধরে রেখেছে এখানে। হাত পা বেঁধে রেখেছে। দিনের পর দিন অন্যের বাড়িতে পড়ে রয়েছ তোমার নিজেরই তো লজ্জা করা উচিত ছিল।' অতুল বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াল, 'না লজ্জার কিছু নেই। আমি বিনা পয়সায় তোমাদের এখানে খাচ্ছিনে। যে কদিন খাবো খোরাকী দিয়ে খাব। মাস অন্তে পাই ফার্দিং পর্যন্ত হিসেব করে মিটিয়ে দেব। সে বোঝাপড়া আমার গোবিন্দের সঙ্গে হয়ে রয়েছে।' রমা জবাব দিল, 'কিন্তু গোবিন্দের সঙ্গে হলেই তো হবে না। গোবিন্দই তো এ বাড়ির কর্তা নয়। তাছাড়া খোরাকী দিয়ে খেতে হয় হোটেলে গেলেই তো পারো। এখানে কেন।'

অতুল বলল, 'বেশ তাই যাচ্ছি।'

গোবিন্দের একখানা লুঙ্গি পরা ছিল সেখানা ছেড়ে নিজের কাপড়

পরে নিল অতুল। আলনা থেকে পেড়ে জামাটা গায়ে চড়াল। সবগুলি বোতাম লাগাবার সবুর সইল না, বলল, 'আমি চললুম। গোবিন্দ এলে তাকে বলো। আর খোরাকীর টাকা আমি যেভাবেই পারি দু' একদিনের মধ্যেই পাঠিয়ে দেব।'
অতুল বেরিয়ে যাচ্ছে, রমা পিছন থেকে ডেকে বলল, 'জামায় কাপড়-গুলি রেখে যাচ্ছ কার জন্যে? এগুলি নিয়ে যাও। এগুলি দিয়ে কি করব?'

অতুল বলল, 'নর্দমায় ফেলে দিয়ো।'
তারপর সদর দরজার হুড়কো খুলে হন হন করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল।

এই অহেতুক অপমানে তার সর্বাঙ্গ রাগে জ্বলে যেতে লাগল। নেহাতই গোবিন্দের বড়দিদি। জাতে মেয়েমানুষ। অন্য কেউ হলে এমন কি গোবিন্দ হলেও অতুল কিছুতেই এসব সহ্য করত না। দু' চার ঘা লাগিয়ে দিত। কিন্তু রমা নেহাৎ মেয়ে বলেই বেঁচে গেল।

গলির ভিতর দিয়ে হন হন করে ছুটে চলল অতুল। না, তার আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কিচ্ছু নেই। কারোই সাহায্যের দরকার নেই তার। সবাইকে ছেড়েই চলতে পারে কিনা অতুল দেখে নেবে।
'এই যে কালাচাঁদ, এবার তো দেখা পেয়েছি তোমার। এবার কোথায় তুমি পালাও তাই দেখব।'

দিদিমা ভুবনময়ী। দু' হাত দু' দিকে বাড়িয়ে তিনি পথ আটকে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর এক বাল্য সখী আছেন ছুতোর পাড়া লেনে। তাঁর অসুখের খবর পেয়ে দেখতে এসেছিলেন। সঙ্গে আছে সাত বছরের নাতনী টুলু।

ভুবনময়ী বললেন, 'কোথায় যাচ্ছিস আবার, বাড়ি আয়।'
অতুল বলল, 'তুমি যাও দিদা, আমি যাব না। তোমদের বাড়ি আমি

জন্মের মত ছেড়ে এসেছি। আর ঢুকব না ওখানে। হাত ছাড়, যেতে দাও আমাকে।'

ভুবনময়ী হাসলেন, 'ঈস্, যেতে দাও বললেই যেন যেতে দিলাম। যেতে হয় একা যেতে পারবিনে আমাকেও নিয়ে যা। লক্ষ্মী ছেলের মত কথা শুনবি তো শোন, নইলে আমি কিন্তু চেঁচিয়ে রাস্তায় লোক জড়ো করব।'

অতুল বলল, 'জড়ো করে কি বলবে।'

ভুবনময়ী বললেন, 'কি আবার বলব। লোককে ডেকে ডেকে শোনাব আমার মানুষ আমাকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে এসে এখন পথে ফেলে যাচ্ছে তোমরা সবাই বিচার কর। এই বলে যদি চেঁচাতে শুরু করি মজাটা টের পাবি। রাস্তার লোকের কিল চড় কি রকম পড়ে পিঠের ওপর দেখবি একবার।'

পরিচিত দু' চারটি ছেলে এরই মধ্যে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। প্রকাশ্য পথের ওপর দিদিমার এই অসঙ্কোচ প্রণয় নিবেদনে সবাই হাসছে মুখ টিপে।

অতুল লজ্জিত হয়ে বলল, 'চল যাচ্ছি। হাত ছেড়ে দাও।'

ভুবনময়ী বললেন, 'আর কি তোমাকে ছাড়ি কালোমানিক। ছাড়া তো ভালো এখন একেবারে আঁচলে বেঁধে রাখব।'

নাতির হাত ধরে ভুবনময়ী বাড়ির দিকে এগুতে এগুতে বললেন, 'গোবিন্দের বাড়িতে তো আমার যাতায়াত নেই। হুট করে গিয়ে উঠতে লজ্জা করে, কিন্তু সবাইকে বলেছি ছেলেটা রাগ করে পরের বাড়িতে রয়েছে তোমরা ওকে ডেকে আন। তা যেমন বাপ তেমনি মা। এত বয়স হোল কিন্তু অভিমানের পালাই ফুরলো না তাদের। আর তোকেও বলি অতুল, বাপ-মা কি এক কথা এক সময় বলে না? তাই বলে অন্যের বাড়িতে থাকে নাকি গিয়ে বাড়ির ছেলে। এমন সৃষ্টিছাড়া কথা শুনেছিস কোথায়।'

দিদিমার এই পুরনো স্নেহ আদর যেন সম্পূর্ণ নূতন লাগতে লাগল

অতুলের কাছে। খানিক আগেও রমার নিষ্ঠুর অপমানে তার মনে হয়েছিল পৃথিবীতে তার কেউ নেই। সে একেবারে নির্বান্ধব আত্মীয়-স্বজনহীন। কিন্তু দিদিমার এই স্নেহস্পর্শে একমুহূর্তের মধ্যে সে যেন আবার সব পেয়েছে।

এই কয়েকদিন যে অতুল রাগ করে অন্য জায়গায় গিয়ে ছিল তার জন্যে লজ্জা বোধ করবার অবসর দিলেন না ভুবনময়ী। হাসি-ঠাট্টায় সব ভাসিয়ে দিলেন, ভুলিয়ে দিলেন। বাড়ির অন্য কেউও তেমনি কোন মন্তব্য করবার সুযোগ পেল না। মা'র কাণ্ড দেখে বাসন্তীও মুখ টিপে হাসতে লাগলেন।

ভুবনময়ী বললেন, 'আজ থেকে তোমার ছেলেকে আমার ঘরে থাকতে দিয়ো বাসন্তী, একেবারে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখব।'

ক্লাবে গোবিন্দের সঙ্গে দেখা হোল অতুলের। গোবিন্দ এগিয়ে এসে বলল, 'কি রে তুই নাকি রাগারাগি করে চলে এসেছিস?'

অতুল এবার সত্যিই রাগ করল, 'আমি রাগারাগি করেছি? কে বলেছে বল তো? তোর বড়দি নিশ্চয়ই। না'হক সে-ই তো কতকগুলো কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিল আমাকে। উল্টে আমার নামেই নালিশ?'

গোবিন্দ বলল, 'বড়দির কথা আর বলিসনে। মাঝে মাঝে ওর মাথার ঠিক থাকে না। সামান্য কিছু হলেই মেজাজ বিগড়ে যায়। আমাকেই কি এক এক সময় কম গালাগাল করে নাকি? কিন্তু আমি কিছু মনে করিনে, জবাব পর্যন্ত দিইনে। ওর মুখের দিকে চেয়ে সব সহ্য করে যাই। তুইও সহ্য করিস। আহা বড় দুঃখের জীবন ওর।'

অতুল বলল, 'দুঃখের আছে তো আছে। তাই বলে সময় নেই অসময় নেই, যাকে যা মুখে আসে বলে যাবে?'

গোবিন্দ অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলল, 'ওর কথায় রাগ করিসনে অতুল, জানিস তো ও ওই রকমই।'

অতুল বলল, 'তা যে রকমই হোক আমার কিছু এসে যায় না। তোর বড়দির দুঃখ তুই-ই বোঝ। আমার কিছু শুনে দরকার নেই।'

কিন্তু একেবারে অতখানি নির্লিপ্ত থাকা অতুলের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠল না। দিন কয়েক বাদে পিণ্টু এক বাণ্ডিল সেলাই করা জামা নিয়ে এসে অতুলের দিকে এগিয়ে দিল।
অতুল বলল, 'এ কি!'
পিণ্টু বলল, 'বড়দি পাঠিয়ে দিল। আর এই নিন।' বলে পেনসিলে লেখা একটুকরো কাগজ অতুলের হাতে দিল পিণ্টু।
না চিঠি-পিঠি কিছু নয়। ছুঁচ সুতো কি কি লাগবে তার ফর্দ। গোটা গোটা সুন্দর অক্ষরে লেখা। একটু আগেও জিনিসগুলি ফিরিয়ে দেবে ভেবেছিল অতুল। কিন্তু সেই অক্ষরগুলির দিকে তাকিয়ে থেকে থেকে বলল, 'আচ্ছা তুই যা।'
পিণ্টু তখনকার মত চলে গেল। কিন্তু ওর যাতায়াত একেবারে বন্ধ হোল না। জামা ফ্রকের ব্যবসাটা পিণ্টুর মারফতই চলতে লাগল অতুলদের।
উনানে ডাল চড়িয়ে দিয়ে বঁটি পেতে আলু কুটতে বসেছিলেন বাসন্তী, ছোট মত একটা ইস্ত্রি হাতে প্রীতি এসে ঘরে ঢুকল, 'মা কড়াটা একটু নামাবে? আমি ইস্ত্রিটা একবার গরম করে নিয়েই চলে যাব।'
বাসন্তী বিরক্তির ভঙ্গিতে বললেন, 'ইস্ত্রি গরম করার তোমাদের আর সময় অসময় নেই বাপু। এখন তোমাদের ইস্ত্রি গরম করতে বসলে আমি অফিসের রান্না নামাব কখন? রান্না-টান্না হয়ে গেলে তারপরে এসো।'
প্রীতি কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।
বাসন্তী আবার বললেন, 'কেন, কার জামা ইস্ত্রি করবি, অরুণের? কাল না লণ্ড্রী থেকে জামা-কাপড় এসেছে?'
প্রীতি বলল, 'না, তার না, বিজুদার জামাটা একটু টেনে দিতে হবে মা। সে আবার এই পরে কলেজে বেরোবে। তাদের কি একটা ফাংশনও নাকি আছে বিকেলে।'

পশ্চিম দিকের উনানের কাছে কনকলতাও রান্না নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, নিজের বড় ছেলের নামের উল্লেখে মুখ তুলে বললেন, 'তার ফাংশন তো মাসের মধ্যে তের দিন লেগে আছে। নবাব! নিজের জামাটা নিজে ইস্ত্রি করে নিতে পারে না বুঝি। আবার তোকে পাঠিয়েছে। আয়, আমার এখান থেকে গরম করে নিয়ে যা তোর ইস্ত্রি।'
বলে নিজের কড়াটা কনকলতা নামাতে যাচ্ছিলেন, বাসন্তী বাধা দিয়ে বললেন, 'থাক থাক, এখান থেকেই নিয়ে যা। ওর বিজুদা যখন বলেছে তখন কি আর জামা ইস্ত্রি না করে দিয়ে রক্ষে আছে প্রীতির?'
হেসে এবার ডালের কড়াটা নামিয়ে ইস্ত্রিটা মেয়েকে গরম করতে দিলেন বাসন্তী। কনকলতাও হাসলেন, 'যা বলেছ, বিজুর মুখের কথাটি ফেলবার জো নেই। বোন একটি পেয়েছে বটে।'
বাসন্তী বললেন, 'দাদায় দাদা, মাস্টারে মাস্টার। হুকুম মানবে না কেন।'
প্রীতিও মায়ের দিকে চেয়ে হাসল, 'আহা।'
তারপর ইস্ত্রি গরম করে নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। বাসন্তী কড়াটা উনানের ওপর তুলে দিয়ে ফের তরকারী কুটতে লাগলেন। দুটিতে খুব ভাব। তাঁর মেয়ে আর দাদার ছেলের এই ঘনিষ্ঠতা দেখে নিজেদের কৈশোর যৌবনের কথা মনে পড়ে যায় বাসন্তীর। তখন তিনিও ছিলেন দাদা-অন্ত প্রাণ। মায়ের হাতের পরিচর্যার চেয়ে বোনের পরিচর্যায় বৈদ্যনাথ প্রসন্ন হতেন বেশি, বাসন্তীও এমনি দাদার জামায় বোতাম পরিয়ে দিতেন, বেরোবার সময় রুমাল দিতেন পকেটে গুঁজে। বইয়ের সেলফ, টেবিলের দেরাজ গুছাবার ভার ছিল বাসন্তীর উপর। বাপ-মায়ের বিরুদ্ধে কতদিন যে দুই ভাই-বোনে একজোট হয়েছেন তার ঠিক নেই। এখন সেই অন্তরঙ্গতার কথা ভাবাই যায় না। শুধু বিজু আর প্রীতিকে দেখলে তাঁর সেই সব দিনগুলির কথা মনে পড়ে। বিজুও নিজের ভাইবোনের চেয়ে প্রীতিকে বেশি ভালবাসে, বেশি পছন্দ করে। ওর পছন্দমত টুক-টাক শৌখীন জিনিসপত্র কিনে দেয়, পাড়ার লাইব্রেরী থেকে ওর

জন্যে গল্পের বই জোগাড় করে আনে। বিজু ভারি ভালোবাসে প্রীতিকে। প্রীতিও তেমনি; নিজের দাদাদের চেয়ে মামাতো ভাই বিজুর ওপরই তার পক্ষপাতিত্ব বেশি। বিজুর জামাটা কোথায় ছিঁড়ে গেল গেঞ্জিটা কখন ময়লা হোল সেদিকে প্রীতির যেমন নজর, বাড়ির আর কারো বেলায় তেমন নয়। ওদের ব্যবহার, ওদের ভাবভঙ্গি দেখলে মনে হয় না তারা আলাদা হয়ে আছেন। দাদার সঙ্গে বাসন্তীর যখন ঝগড়া লাগে, তখন বিজু আর প্রীতির মুখের দিকে যেন তাকানো যায় না। বেশ বোঝা যায় ওরা বিব্রত বোধ করছে, ভারি কষ্ট পাচ্ছে। ওরা এসব ঝগড়াঝাটি বিবাদ-বিরোধ চায় না। ঝগড়া লাগলেই প্রীতি এসে মাকে বুঝায়। বিজু নিজের মাকে থামাতে চেষ্টা করে। ঝগড়ার সময় ওদের এই শালিসীপনায় বাসন্তী খুবই বিরক্ত হন। কিন্তু অন্য সময় ওদের এই স্নেহ-ভালবাসা তিনি খুব উপভোগ করেন। দু'জনের স্বভাবের মধ্যে মিল আছে। দু'জনেই শান্ত, শান্তিপ্রিয়। বইপত্র ভালোবাসে, গান-বাজনার দিকে ঝোঁক আছে।

বিজু অনেকদিন বলেছে, 'পিসীমা, প্রীতিকে একটা গানের স্কুলে ভর্তি করে দিন। ওর চমৎকার গলা।'

বাসন্তী বলেছেন, 'তোমাদের বোন তোমরা দিলেই পারো।'

প্রীতি প্রতিবাদ করেছে, 'হুঁ, গানের স্কুল না আরো কিছু। আসলে নিজেরই ভর্তি হওয়ার ইচ্ছা, বুঝলে মা। মামার ভয়ে পেরে ওঠে না। আমি তোমার হয়ে মামার কাছে একটু ওকালতি করব নাকি বিজুদা।'

বিজু বলেছিল, 'ওরে বাবা, তাহলে কি রক্ষা আছে?'

বাবাকে ভারি ভয় করে বিজু। তাঁর পছন্দ অপছন্দ সব সময় মেনে চলে। ওর নিজের ইচ্ছা ছিল আর্টস পড়ার। কিন্তু বৈদ্যনাথ ওকে জোর করে কমার্স ক্লাসে ভর্তি করে দিয়েছেন। তাঁর এক ব্যাঙ্কার বন্ধু ভরসা দিয়ে বলেছেন, বি-কম পাশ করলেই তিনি ভালো মাইনেয় বিজুকে তাঁর ব্যাঙ্কে নিয়ে নেবেন। আর্টস পড়ে কি হবে। তাতে কি আজকাল কোন চাকরি বাকরি মেলে। কমার্সটা বিজুর কাছে ভারি

নিরস লাগছে। তবু বাবার কথা অমান্য করতে পারেনি। আড়ালে আবডালে পিসীমা আর পিসতুত বোনের কাছে তাই নিয়ে বিজু আক্ষেপ অভিযোগ করে।

বাসন্তী তাকে ভরসা দিয়ে বলেন, 'মন দিয়ে পড়লেই পাস করে যাবি। অত ভয় পাচ্ছিস কেন।'

বিজু বলে, 'উৎসাহই পাচ্ছিনে পিসীমা, সেইটাই আসল কথা। না হলে ভয় আমি পাইনে।'

প্রীতি ঠাট্টার সুরে বলে, 'না ভয় আবার পান না। বিজুদার মত এমন জন্মভীরু মানুষ আমি আর দুটি দেখিনি মা।'

কি ভেবে প্রীতি যে এমন ঠাট্টা করে, বোঝা যায় না। বাসন্তী তা বুঝতে চেষ্টাও করেন না। দুজনের এই ছদ্ম কলহ বেশ উপভোগ করেন। তাঁর আর বৈদ্যনাথের মধ্যেও আগেকার দিনে এমন লোক-দেখানো ঝগড়া হতো। আজকালকার ঝগড়াগুলি লোক-দেখানো নয়, তবু লোকে দেখে। সেই দিন আর নেই। কিন্তু বিজু আর প্রীতির দিকে তাকালে সেই সব দিনের যেন খানিকটা আভাস মেলে। মামা-মামী আর মামাত ভাইবোনদের ওপর প্রীতির পক্ষপাতিত্ব তাই বাসন্তী উপভোগ করেন। কারণ তাঁদের দিকে বিজুর পক্ষপাতও তো কম নয়: নিজের ছেলেদের হাজার অনুরোধ করলেও যা না করাতে পারেন, মুখের কথাটি বললে বিজু তৎক্ষণাৎ তা করে দেয়। এমন ধীর, স্থির, ভদ্রস্বভাবের ছেলে আজকাল বড় একটা হয় না।

শার্টটা কড়া ইস্ত্রি করে প্রীতি বিজুদের দোতলার ঘরে গিয়ে বলল, 'দেখ পছন্দমত হয়েছে নাকি? তোমাদের ফ্রেন্ডস লন্ড্রীর চেয়ে ভালো ছাড়া খারাপ হয়নি, এটুকু বাজি রেখে বলতে পারি।'

বিজু মেঝের ওপর আয়নার সামনে বসে সেফটি রেজরে দাড়ি কামাচ্ছিল, প্রীতির কথায় তার দিকে ফিরে তাকাল, 'খুব যে আত্ম-বিশ্বাস দেখছি।'

প্রীতি বলল, 'বাঃ রে, এটুকু বিশ্বাস থাকবে না।'

বিজয় বলল, 'থাকলেই ভালো। কিন্তু ক' জায়গায় পুড়িয়েছ তাই বলো।'
প্রীতি ছদ্ম কোপের ভঙ্গিতে বলল, 'অমন করলে কিন্তু সত্যি সত্যিই একদিন পোড়াব, বুঝবে মজা।'
বিজু ধমকের ভঙ্গিতে বলল, 'এই ওসব, কি হচ্ছে। আমি কেবল গুরুজন না, গুরুও। আমার কৃপায় সেবার ম্যাট্রিকুলেশনটা তরে গেছ। মন দিয়ে পড়াশুনা করলে ইণ্টারমিডিয়েটটাও আমিই তরাব। আমাকে অমন অশ্রদ্ধা করলে নিজেই পস্তাবে।'
কিছুদিন চুপচাপ থেকে বিজুর উদ্যোগেই ফের পড়াশুনা আরম্ভ করেছে প্রীতি। বাবার অমতে কলেজে ভর্তি হতে পারেনি। বাড়িতে থেকেই প্রাইভেটে আই-এ দেওয়ার জন্যে তৈরী হচ্ছে। কিছু জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করতে হলে বিজুর কাছে এসেই করে। প্রীতির নিজের দাদা অরুণের মত বিজু কথায় কথায় মুখঝামটা দেয় না। খুব ধৈর্যের সঙ্গে পড়ায়, পড়া বুঝিয়ে দেয়। এই অধ্যয়ন অধ্যাপনাটা বৈদ্যনাথ বেশি পছন্দ করেন না। চোখে পড়লেই ছেলেকে ধমক দিয়ে বলেন, 'তুই তোর নিজের পড়া পড় বিজু। পরীক্ষার কয়েকটা মাস তোর আর পণ্ডিতী না করলেও চলবে।'
বাপের মুখের ওপর বিজু কোন জবাব দেয় না। প্রীতির মুখের দিকে তাকিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে মিটমিট করে হাসে। কিন্তু মামার ভয়ে প্রীতি আর বেশি দেরি করে না। সঙ্গে সঙ্গে বইপত্র নিয়ে উঠে যায়। পারতপক্ষে মামার সাক্ষাতে বিজুর কাছে পড়া জিজ্ঞেস করতে আসে না। বৈদ্যনাথ যখন বাড়ি থাকেন না, যখন তাঁর হঠাৎ এসে পড়বার আশঙ্কা থাকে না, তখন যায়। বিজুও এই গোপনীয়তাটুকু পছন্দ করে। সাধ্যমত বাবাকে এড়িয়েই চলতে চায়।
গালে সেফটি-রেজর বুলাতে বুলাতে বিজু বলল, 'আজকের ফাংশনটা সত্যিই কিন্তু খুব ভালো হবে। নামকরা আর্টিস্টরা আসবেন। চমৎকার গানবাজনার আয়োজন হয়েছে।'

প্রীতি মুখ ভার করে বলল, 'ভালো হলেই বা আমার কি। বেল পাকলে কাকের কি লাভ।'

বিজু হেসে বলল, 'ব্যস্, খুব যে আফসোস দেখছি। চেহারার দিক থেকে অবশ্য পাকা বেল বললে লোকে তোমাকেই বলবে, আর আমাকে দাঁড়কাক।'

প্রীতি বিজুর দিকে তাকাল, 'থাক থাক, আর ফাজলামো করতে হবে না। আমাকে দিয়ে জুতো পালিশ আর জামা ইস্ত্রিই করিয়ে নিলে। একদিন যে গান-টান শোনাতে নেবে, তার নামে দেখা নেই।'

বিজু চুপ করে রইল। প্রীতির আবদারটি বড় সহজ নয়। মেয়েদের সম্বন্ধে তাদের বাড়ির রক্ষণশীলতা বড় বেশি। এ বাড়ির মেয়েরা বাড়ির ছাদে কিংবা উঠানে দাঁড়িয়ে চন্দ্র-সূর্যের মুখ হয়তো দেখে, কিন্তু বাড়ির বাইরে যাওয়ার নিয়ম কারোরই নেই। তাতে অন্য পুরুষের মুখ দেখবার আশঙ্কা আছে। বিজুর কিংবা অরুণ-অতুলের বন্ধুরা কেউ ভিতরে ঢুকতে পায় না। বাইরের বসবার ঘর পর্যন্ত তাদের গন্ডী। সিনেমা-থিয়েটার সম্বন্ধেও খুব কড়া বিধি-নিষেধ। বছরে একবার কি দু'বার বাবা-কাকার সঙ্গে তারা সিনেমা দেখে আসতে পারে। এ সম্বন্ধে ভুবনময়ীর কড়াকড়ি সবচেয়ে বেশি। মেয়েদের কোন রকম প্রগলভতা তিনি সহ্য করতে পারেন না। একটু বেচাল দেখলেই রাগ করেন, গাল-মন্দ করেন। আর তা'র পরেই বৈদ্যনাথ। এসব ব্যাপারে মায়ের বিধি-নিষেধ, আদেশ-নির্দেশ পালনে বৈদ্যনাথের উৎসাহ বেশি। যে সব মেয়েলি আচার-আচরণের সঙ্গত কারণ ভুবনময়ী বলতে পারেন না, শুধু 'ওটা দোষ', 'ওতে গেরস্থের অমঙ্গল হয়' বলে নাতি-নাতনীদের নিরস্ত করতে চেষ্টা করেন, বৈদ্যনাথ সেগুলিকে যুক্তিতর্ক দিয়ে প্রতিষ্ঠা না করে ছাড়েন না। তাঁর মতে আগেকার আচার-আচরণ বচন-প্রবচনের কিছুই নিরর্থক নয়। প্রায় প্রত্যেকটির পিছনে সমাজ রক্ষার গভীর উদ্দেশ্য রয়েছে। সেগুলির প্রয়োজন এখনো শেষ হয়নি। অল্প-স্বল্প সংস্কার করে

নিয়ে সেগুলিকে আজও কাজে লাগান যায়, কাজে লাগাতে হয়। কারণ ভারতীয় সমাজের কাঠামো আসলে বদলায়নি। জীবনযাত্রার আদর্শ মূলতঃ ঠিকই আছে। এ সম্বন্ধে সময় পেলেই কোন রকম কোন উপলক্ষ পেলেই ছেলেমেয়ে বা ভাগ্নেভাগ্নীদের ডেকে বৈদ্যনাথ উপদেশ দেন। তিনি বলেন 'গোড়া থেকেই সংযম দিয়ে জীবনকে বাঁধতে হয়। যে নিয়মই মান না কেন, নীতি নিয়মের বন্ধন তোমাকে স্বীকার করতেই হবে। একটু শিথিল হলে আর রক্ষা নেই। প্রকৃতি কোন শৈথিল্যকে ক্ষমা করে না, অনিয়মকে সহ্য করে না! সে একদিন না একদিন শোধ নেয়।'

সব সময় যে বৈদ্যনাথ নিজের বক্তব্যকে স্পষ্ট করে বলতে পারেন তা নয়। অনেক পুরনো কথার পুনরাবৃত্তি করেন। মনে হয় যেন মুখস্থ বলছেন। অরুণ মামার এই দার্শনিকতায় আড়ালে গিয়ে হাসে। কিন্তু বিজু হাসে না। পুরনোই হোক আর যাই হোক, মতের সঙ্গে মিলুক আর না মিলুক, বৈদ্যনাথের জীবন-দর্শন স্পষ্ট। বিশ্বাসের ভিৎ খুব দৃঢ়। সব সময়েই তাঁর একটা স্পষ্ট মতামত আছে। ভালো-মন্দ কোন কিছু সম্বন্ধে সংশয়-সন্দেহের ধার ধারেন না বৈদ্যনাথ। বিজুকে চুপ করে থাকতে দেখে প্রীতি বলল, 'আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে বলছিনে। তোমাদের ফাংশনে তুমি একাই যেয়ো।'

বিজু বলল, 'দেখা যাক।'

সন্ধ্যার দিকে বাসন্তীর কাছে এক অদ্ভুত প্রস্তাব করে বসল বিজু, 'প্রীতি আমার সঙ্গে একটু যাবে পিসীমা?'

বাসন্তী বললেন, 'ওমা ও আবার কোথায় এই রাত্রে।'

বিজু বলল, 'রাত বেশি হবে না সাড়ে সাতটা আটটার মধ্যেই আমরা ফিরে আসব।'

বাসন্তী বললেন, 'বিষয়টা কি?'

বিষয়টা আর কিছুই নয়, রঙমহলে তাদের 'মিলনী-সঙ্ঘের' উদ্যোগে একটা চ্যারিটি শো-এর ব্যবস্থা হয়েছে। সেই উপলক্ষে গান-বাজনার

অনুষ্ঠান হবে। প্রীতি তো এসব খুব ভালবাসে। তাই তাকেও সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চায় বিজু।
বাসন্তী বললেন, 'আমার তো কোন আপত্তি নেই। তোর পিসেমশাইও হয়তো তেমন কিছু বলবেন না। কিন্তু মা আর দাদার খুঁৎ-খুঁতির কথা তো জানিস।'
বিজু বলল, 'ওঁদের খুঁ-খুঁতির কি মানে হয় পিসীমা? কত বাড়ির মেয়েরা আসবে সেখানে, ও তো আর একা যাচ্ছে না; এ সব জিনিস ও ভালোবাসে বলেই ওকে যেতে বলছি। আর কাউকে তো নিতে চাইছিনে।' বাড়ির অন্যান্য মেয়েদের মধ্যে অণিমাকে তার শ্বশুর এসে নিয়ে গেছেন। কিন্তু প্রীতির আরো দুই বোন আছে—ইলা নীলা, বিজুরও দুই বোন আছে—টুনু রুণু, তারাও এসে ঘিরে ধরল। প্রীতি যদি যায় তারাই বা যেতে পারবে না কেন।
বিজু একটু বিরক্ত হয়ে বলল, 'কিন্তু টিকিট যে মাত্র দু'খানা। আচ্ছা তোদের আর একদিন নিয়ে যাব, তোরা আর একদিন যাস।'
প্রীতি বলল, 'তার দরকার নেই, তুমি টুনুকেই নিয়ে যাও বিজুদা।'
টুনু ষোল উৎরে সতেরয় পড়েছে। সে এই প্রস্তাবে ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, 'ঈস, আমি কেন যাব, যার জন্যে টিকিট আগে থেকেই কেটে রাখা হয়েছে, সেই যেতে পারবে।' কনকলতা আর বাসন্তী দুজনে এসে ছেলেমেয়েদের বিবাদ মিটিয়ে দিলেন। শেষ পর্যন্ত ঠিক হোল বিজু সবাইকে একদিন সিনেমা দেখাবে। টিকিটের দাম দেবেন বাসন্তী।

মীমাংসার পর প্রীতি আর বিজু বেরুতে যাচ্ছে ভুবনময়ী দোরের পাশ থেকে বললেন, 'সেজেগুজে কোথায় যাওয়া হচ্ছে এই সন্ধ্যার সময়?'
প্রীতি বলল, 'এই একটু ঘুরে আসি দিদিমা।'
ভুবনময়ী রুক্ষকণ্ঠে বললেন, 'ঘুরে আসবার আর সময় পেলে না। এই সন্ধ্যার সময় ঘরের মেয়ে বেরুচ্ছেন হাওয়া খেতে। যা কোন

জন্মে দেখিনি তাই। কেন ঘরে বসে দু'খানা বই পড়, কি সংসারের কাজ কর দু'খানা।'
বাসন্তী এগিয়ে এলেন, 'তুমি যদি সব সময় ওদের সঙ্গে খিট খিট কর তাহলে ওরা কি ভাবে বলতো মা। ওদেরও তো একটু সাধ আহ্লাদ আছে, ওদেরও তো দেখতে শুনতে ইচ্ছা করে। এই তো দেখবার শুনবার বয়স। তোমার মত তো ওরা বুড়ো হয়ে যায়নি।'
ভুবনময়ী রুষ্ট ভঙ্গিতে বললেন, 'বুঝতে পারছি। তোমাদের আস্কারাতেই এসব হচ্ছে। বেশ, যে ভাবে খুশি সেইভাবেই নিজেদের ছেলেমেয়েকে তোমরা গঠন কর। আমার কি, আমার কিছু বলতে আসাই অন্যায়।'
বাসন্তী আর কিছু বললেন না। কথায় কথা বাড়বে। মার আর দাদার এই অতিরিক্ত কড়াকাড়ি তিনি পছন্দ করেন না। আজকালকার ছেলেমেয়েদের একটু স্বাধীনতা দেওয়া ভালো। আহা, তাঁদের তুলনায় ওরা কতটুকুই বা দেখে শুনে, কতটুকুই বা আনন্দ আহ্লাদ করে? অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছিল বাসন্তীর। কিন্তু বিয়ের পর বহুদিন বাপমার কাছেই কেটেছে। খুব বড়লোক না হোক অবস্থাপন্ন লোক ছিলেন বাবা। মেয়ের সাধ আকাঙ্খা মেটাতে তিনি কার্পণ্য করতেন না। সার্কাস, থিয়েটার সব সঙ্গে করে করে দেখাতেন। সেই তুলনায় তাঁর মেয়েরা তো কিছুই দেখতে শুনতে পায় না, কোন রকম আমোদ স্ফূর্তি করে না। অথচ এইতো সখ আহ্লাদের সময়। এর পর কোথায় কোন ঘরে পড়বে, রান্নাঘরে হাতাবেড়ী নিয়ে আটকে থাকবে সকাল থেকে রাত বারটা পর্যন্ত আর বেরুবার ফুরসুৎ পাবে না। তাঁদের মত খাঁচায় বন্দী হয়ে থাকবার দিন তো ওদের পড়েই আছে। সেই জেল-হাজত ওদের কপালে এখনই কেন।
এই চার দেয়াল ঘেরা ছোট বাড়িটুকুর মধ্যে তিনশ প'য়ষট্টি দিন একভাবে কাটাতে বাসন্তীর নিজেরই যেন এক এক সময় দম বন্ধ হয়ে আসে। আর তাঁর মেয়েদের আসবে না? বাসন্তীর নিজেরই

তো এক এক সময় সব ফেলে বেরুতে ইচ্ছা করে। কিন্তু পারেন কই! একটা না একটা বাধা লেগেই থাকে। বাপের বাড়ি যদি দূরে হোত, দু'দিন গিয়ে সেখানেও থাকতে পারতেন। কিন্তু নিজেদের বাড়ির মধ্যেই বাপের বাড়ি হওয়ায় তাঁর সে সুখও গেছে। কনকলতা বছরে একমাস দেড় মাস করে বাপের বাড়িতে কাটিয়ে আসে, জা সুরমা আরো বেশি থাকে কিন্তু বাসন্তীর আর কোথাও নড়া হয় না। তাঁর ছুটি নেই। ঝগড়া-ঝাঁটি না থাকলে জামাইষষ্ঠীর দিনে কি পুজোর মধ্যে একটি দিন দাদা তাঁদের খেতে বলেন, কিন্তু তাতে কি বাপের বাড়ি যাওয়ার সাধ মেটে? তাতে কি একদিনের জন্যেও আরাম বিশ্রাম পাওয়া যায়? বিশ্রাম তো দূরের কথা কনকলতা যখন বাপের বাড়ি যান দুটি সংসারের ভারই বাসন্তীর উপর পড়ে। কিন্তু ভার বহনে কষ্টই হয়, আগের মত আনন্দ আর মেলে না। রোজকার হিসাব রোজ বৈদ্যনাথকে বুঝিয়ে দিতে হয়, সব সময় আশঙ্কা থাকে কনকলতা ফিরে এলে তাঁর কাছে কোন কৈফিয়ৎ দিতে হবে কি রকম জবাবদিহি করতে হবে তাঁর কাছে। তাই ভার নিয়েও শান্তি থাকে না বাসন্তীর মন। অথচ চোখের ওপর মাকে খাটতে দেখে, দাদাকে মেয়েলি কাজে হাত দিতে দেখে, ছেলেমেয়েগুলির অসুবিধা দেখে ভার না নিয়েও বাসন্তী পারেন না। ফলে মেজাজ আরও খিটখিটে হয়, কথাবার্তায় ঝাঁজ বাড়ে। বাসন্তীর মনে হয় এই সংসারের ভিতর থেকে একটু বেরুতে পারলে হোত। কিন্তু বেরুতে পারেন না। তাই মেয়েরা যখন এক আধ দিন বাইরে যাবার আবদার করে বাসন্তী বাধা দেন না, বরং সাহায্য করেন। ওদের আমোদ আহ্লাদের ভিতর দিয়ে নিজেও যেন খানিকটা আনন্দ বোধ করেন। ওদের বেরুনো যেন নিজেরই বেরুনো।

রাস্তায় নেমে প্রীতি বলল, 'দূর, আমার না আসাই ভালো ছিল। জনে জনের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে দিতে আসা। এভাবে আসতে কি ভালো লাগে?'

বিজু বলল, 'কেন এইতো ভালো। এক আধটু বাধা বিপত্তি না ঠেলে আসতে পারলে মজা কিসের।'
প্রীতি বলল, 'তুমি আছ তোমার মজা নিয়ে। কেউ চোখ রাঙাবে, কারোও চোখ টাটাবে আমার ভারি খারাপ লাগে। টুনিটা কি রকম বিশ্রী বিশ্রী সব কথা বললে শুনলে তো?'
বিজু বলল, 'বললই বা, ওদের কথায় কি এসে যায়। ওদের ফাঁকি দিয়ে তুমি একা একা বেড়াতে বেরোবে, গান শুনে নেবে আর ওরা টুঁ শব্দটি করবে না, তাই বা কি করে হয়?
প্রীতি প্রতিবাদ করে বলল, 'ফাঁকি তো আমি ওদের দিতে চাইনি, দিলে তুমিই দিয়েছ। আর মিছামিছি বদনাম দিচ্ছ আমাকে।'
বিজু বলল, 'আচ্ছা আচ্ছা, যত দোষ আমার। হোল তো। এবার সাবধানে বাসে ওঠো। দেখ দয়া করে এ্যাকসিডেণ্ট ঘটিয়ে বস না-যেন।'

প্রীতি হেসে বলল, 'আহাহা, অতই আনাড়ি পেয়েছ বুঝি আমকে।'
শ্যামবাজারগামী একটা বাস থামিয়ে প্রীতিকে নিয়ে উঠে পড়ল বিজু। লেডীজ মার্কা একটা ছোট বেঞ্চে এক ভদ্রলোক বসে ছিলেন। প্রীতিদের দেখে অপ্রসন্ন মুখে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। বিজু তাঁর জায়গা দখল করে প্রীতির কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে বলল, 'ভদ্রলোকের মুখখানার দিকে একবার তাকিয়ে দেখ। যেন বিশ্ব-সংসারের ওপর হাড়ে হাড়ে চটে গেছেন।'

প্রীতি লক্ষ্য করেছে। বিজু অমনিতে বেশ একটু গম্ভীর আর শান্তশিষ্ট ধরণের ছেলে। কিন্তু দুজনে এক জায়গায় হলে তার স্বভাব যেন বদলে যায়। কথাবার্তায় কেমন একটু প্রগলভ চাপল্য আসে বিজুদার। এই তরলতা অবশ্য ভালোই লাগে প্রীতির। বিজু তার কাছে যা, টুনুদের কাছে ঠিক তা নয়, গুরুজনদের কাছে আবার ঠিক অন্যরকম। একজন মানুষেরই ভিন্ন ভিন্ন লোকের কাছে ভিন্ন

ভিন্ন রূপ। একজন মানুষ ঠিক একজন নয়, অনেকজন ভেবে ভারি অদ্ভুত লাগল প্রীতির।

বিজুর কথার জবাবে গলা নামিয়ে বলল, 'তুমি তো ভারি নিষ্ঠুর বিজুদা। ভদ্রলোককে একে তো উঠে দাঁড়াতে বাধ্য করেছ, তার ওপর ওঁকে নিয়ে ঠাট্টা তামাসা শুরু করলে? তোমার মনে মোটে মায়া মমতা নেই?

বিজু বলল, 'তাই নাকি। আর তোমার মনে যত রাজ্যের মমতা এসে বাসা বেঁধেছে। ভদ্রলোক তোমার জন্যেই উঠতে বাধ্য হয়েছেন, আমার জন্যে নয়। বেশ আমি উঠে যাচ্ছি। ভদ্রলোক এসে বসুন এখানে।'

বলে বিজু ছদ্ম রাগে উঠতে যাচ্ছিল, প্রীতি তাড়াতাড়ি ওর হাত চেপে ধরল, 'কি যা তা করছ। লোকে কি ভাবছে বলতো।'

সত্যি সে যে এক বাস লোকের মধ্যে বসে আছে তা যেন বিজুর খেয়াল ছিল না। নিজের চাপল্যে এবার একটু লজ্জিত হোল বিজু। তারপর শান্ত গম্ভীরভাবে সামনের দিকে তাকাল।

বিডন স্ট্রীটের মোড় ছাড়িয়ে বাস দ্রুত শ্যামবাজারের দিকে এগিয়ে চলেছে।

গেটের কাছে বিজুরই বয়সী একটি যুবক স্মিতমুখে তাদের অভিনন্দন জানাল, 'এই যে বিজু এসো এসো, আমরা ভাবলাম তুমি বুঝি আর এলেই না, বই ছেড়ে তুমি উঠে আসতে পারবে কিনা আমরা সকলেই সন্দেহ করছিলাম।'

বিজু বলল, 'হুঁ, তোমরা তো ওই রকমই ভাব। পড়াশুনা যেন কেবল আমিই করি, তোমরা তো কেউ আর বই ছোঁও না।'

তারপর প্রীতির দিকে তাকিয়ে বলল, 'এসো পরিচয় করিয়ে দিই। আমার বন্ধু সীতেশ সেন। একসঙ্গে আমরা পড়ি। আর প্রীতি চন্দ, আমার—'

কিন্তু সীতেশ বিজুকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই মৃদু হেসে আর একজন আগন্তুকের প্রবেশপত্র দেখবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।
প্রীতি যেতে যেতে বলল, 'তোমার বন্ধুটি তো ভারি অসভ্য বিজুদা।'
বিজু বলল, 'কেন অসভ্যতার কি দেখলে।'
প্রীতি আর কোন কথা বলল না।
মেয়েদের জন্যে আলাদা বসবার ব্যবস্থা। প্রীতি এগিয়ে যেতে একটু ইতস্তত করছিল, বিজু বলল, 'ভয় নেই, নিশ্চিন্তে বস গিয়ে ওখানে। হারিয়ে যাবে না, যাওয়ার সময় আমি ডেকে নিয়ে যাব।'
প্রীতি লজ্জিত হয়ে বলল, 'আহাহা।'
একদল অপরিচিত সুসজ্জিত তরুণী মেয়ের মধ্যে গিয়ে বসল প্রীতি। মুহূর্তের মধ্যে তার মনের সমস্ত দ্বিধা সঙ্কোচ উদ্বেগ ভাবনা মন থেকে মুছে গেল।
একটু বাদেই অনুষ্ঠান আরম্ভ হোল। কণ্ঠ-সংগীত, যন্ত্র-সংগীত ছাড়াও ছোট একটি গীতিনাট্যের অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। একখানা ছাপান প্রোগ্রাম হাতে ছিল প্রীতির। তার সঙ্গে প্রত্যেকটি বিষয় মিলিয়ে দেখতে লাগল। এমন আনন্দ যেন আর সে পায় নি। গান বাজনা আবৃত্তি অভিনয় সবই প্রীতির অদ্ভুত ভালো লাগল। আর আনন্দের এই সুযোগ দেওয়ার জন্যে বিজুর ওপর কৃতজ্ঞতায় ওর মন ভরে উঠল।
অনুষ্ঠান শেষ হোল সাড়ে বারোটায়। প্রীতি ভিড়ের মধ্যে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল, বিজু এসে বলল, 'এই যে এসো। ঈস কত রাত করে ফেললে।'
রাত্রি বেশি হওয়ায় প্রীতির মনও শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল, কিন্তু বিজুর কথার প্রতিবাদ করে বলল, 'আমি বুঝি রাত করলাম, তুমি আমাকে ডাকলে না কেন।'
রাস্তায় নেমে এসে বিজু হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'তুমি এত মুগ্ধ হয়ে শুনছিলে যে, তোমাকে ডাকতে কষ্ট হোল। সত্যি গান-বাজনা তুমি

খ্বই ভালোবাস প্রীতি। যদি স্বযোগ স্ববিধা পেতে তুমিও এ সব ফাংশনে গাইতে টাইতে পারতে।'
প্রীতি বলল, 'থাক ওসব কথা আর বলো না। বলে পড়াটাই হোল না আর গান, কিছ্বই হবে না, কিছ্বই হোল না। মাঝে মাঝে মনে হয় সমস্ত জীবনটাই এমনি করে ব্যর্থ যাবে বিজ্বদা।'
বিজ্ব বলল, 'দ্বর, জীবনের এই তো কেবল শ্বর্। এরই মধ্যে সমস্ত জীবনের কথা ভাববার কি হয়েছে।'
হাতের ইশারা করে বিজ্ব একটা রিক্সা ডাকল।
প্রীতি বলল, 'আবার রিক্সা কেন। বাসে গেলেই তো তাড়াতাড়ি যাওয়া যাবে। শেষ বাস এখনও পাওয়া যেতে পারে।'
বিজ্ব বলল, 'না না রিক্সাই ভালো। বাসে বড় ভিড়। রিক্সায় দ্বজনে কথা বলতে বলতে যাওয়া যাবে।'

রিক্সায় দ্বজনে উঠে বসল। নির্জন পথ। আকাশে চাঁদ। এত রাত্রে এমনভাবে একসঙ্গে দ্বজনে আর চলাফেরা করেনি। ভারি অদ্ভুত, ভারি বিচিত্র আর নতুন মনে হতে লাগল সব কিছ্ব।
বিজ্ব বলল, 'বেশ লাগছে না?'
প্রীতি ঘাড় নেড়ে বলল, 'হ্বঁ।'

বিজ্ব বলল, 'এই একট্ব আগে তুমি সারা জীবন ব্যর্থ হোল বলে আক্ষেপ করছিলে। এখন কি অন্য রকম মনে হয় না? এখন কি আর কোন রকম আফশোষের কথা মনে পড়ে?'

প্রীতি বলল, 'আহা কিসে আর কিসে। সত্যি, প্বর্ষ ছেলে হওয়া অনেক স্ববিধে।'

বিজ্ব বলল, 'কেন হঠাৎ একথাটা তোমার মনে হোল কিসে, মেয়ে হওয়াতেই বা অস্ববিধে কি?'
প্রীতি বলল, 'অস্ববিধে নেই? তুমি কত স্বাধীন। ইচ্ছা মত

পড়াশুনা করছ। যখন খুশি তখন বাইরে বেরুচ্ছো। তোমার কত বন্ধুবান্ধব, আর আমি! আমি কি পাচ্ছি?'

বিজু সহানুভূতির স্বরে বলল, 'সত্যি। আমার হাতে যদি ক্ষমতা থাকত, তাহলে আমি নিজে যা পাচ্ছি তোমাকেও তাই দিতাম। লেখাপড়া গানবাজনা শিখবার সব রকম সুযোগ দিতাম তোমাকে। স্বাধীনভাবে চলতে ফিরতে দিতাম।'

প্রীতি বলল, 'হুঁ, তুমি কর্তা হলে ঠিক হয়ত বাবার মতই হতে, গোড়ায় সবাই ওই রকম বলে।'

বিজু বলল, 'মোটেই না। আমি সম্পূর্ণ অন্য রকম হ'তাম। আমি কিছুতেই স্বার্থপরের মত সব একা ভোগ করতাম না। একা ভোগ করলে ভোগ বলেই মনে হয় না। আর একজনকে ভাগ না দিলে, আর একজনের সঙ্গে ভোগ না করলে মনে হয় যেন আধখানা হোল। পুরোপুরি পেলাম না। চ্যারিটি শোয়ের পাসটা যখন পেলাম, তখন তোমার কথা মনে পড়ল। ভাবলাম, তুমি তো আমার চেয়েও বেশি গান বাজনা ভালোবাস, তোমাকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাই, নিজে চেয়েচিন্তে জোগাড় করলাম আর একখানা। সাধারণত আমি এরকম করিনে। কিন্তু তোমার জন্যে—'

প্রীতি বলল, 'সত্যি, তোমার জন্যেই সুযোগটা পেলাম।'

রিক্সা এসে বাড়ির সামনে থামল। ভাড়া মিটিয়ে দুজনে সদর দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। বিজু কড়া নাড়তেই বৈদ্যনাথ এসে দোর খুলে দিলেন। তিনি বাইবের ঘরেই ছিলেন। কঠিন গম্ভীর তাঁর মুখ।

বিজু আর প্রীতি মাথা নীচু করে পাশ কাটিয়ে চলে যাবে ভেবেছিল, কিন্তু বৈদ্যনাথ পথ আগলে দাঁড়ালেন; ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দাঁড়া, কোথায় ছিলি এতক্ষণ পর্যন্ত।'

বিজু ক্ষীণ স্বরে বলল, 'একটা চ্যারিটি শো—'

বৈদ্যনাথ ধমক দিয়ে বললেন, 'চ্যারিটি শো। পরীক্ষার আর ক' মাস

বাকি শুনি? পড়াশুনা সব গেছে। উনি চ্যারিটি শো করে বেড়াচ্ছেন। তা আবার একা নয়। একটা ধাড়ী মেয়েকে আবার সঙ্গে জুটিয়ে নেওয়া হয়েছে, নইলে তো আড্ডা জমে না। আস্কারা পেয়ে পেয়ে সব একেবারে মাথায় উঠেছ, না?'

বাসন্তী ঘুমোননি। রান্নাঘরের কাজ মিটিয়ে কেবল নিজের ঘরে গিয়ে বসেছিলেন, চেঁচামেচি শুনে নেমে এলেন। ফিরতে এত বেশি দেরি করবার জন্যে তিনিও বকলেন দুজনকে। তারপর দাদার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আহা থাম। না হয় গান শুনতে গিয়ে একটু দেরিই করে ফেলেছে, রোজ তো আর এমন হয় না। তার জন্যে অত শাসন কিসের?'

বৈদ্যনাথ বললেন, 'না শাসন করবে কিসের, আহ্লাদ দিয়ে দিয়ে আস্কারা দিয়ে তোর মত মাথায় চড়িয়ে রাখবে। নিজের ছেলেমেয়ে-গুলি তো গেছেই, যতদূর বকাটে হবার হয় হয়েছে, এখন বাড়ির আর সব ছেলেমেয়েগুলি যে একটু ভালো থাকবে, তার জো নেই। তা তুই আর থাকতে দিবিনে। বাড়ির সবগুলি ছেলেমেয়ে নষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তুই থামবিনে।'

বাসন্তী বললেন, 'দাদা, এই কথা তুমি বলতে পারলে? আমার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিশে তোমার ছেলেমেয়েরা নষ্ট হচ্ছে? এই কথা বললে তুমি?

বৈদ্যনাথ বললেন, 'বলবই তো। হাজারবার বলব। একটা পচা আপেল থলির সবগুলি আপেল নষ্ট করে তা জানিস? আমি সব সময় একটা প্রিন্সিপল্ নিয়ে চলি। পাড়ার কোন বাজে সংসর্গে ছেলেদের মিশতে দিইনে। কিন্তু আমার বাড়ির মধ্যেই অসৎ সঙ্গের বাসা, পাড়া সম্বন্ধে সাবধান হয়ে আমি কি করব, নইলে বিজুর সাহস কি পড়াশুনো ছেড়ে রাত একটা পর্যন্ত বাইরে বাইরে কাটায়?'

বাসন্তী স্তব্ধ হয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। বিজু চলে যাচ্ছিল

তাকে বাধা দিয়ে বললেন, 'শোন বিজু, তোমাকে আমি এই বলে রাখলুম, আমার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এরপর তোমরা আর মিশতে এসো না। আমাদের সঙ্গে কোন কথাবার্তা পর্যন্ত বলতে এসো না তোমরা। আমার ছেলেমেয়েরা খারাপ আছে সেই ভালো। তোমাদের আর খারাপ হয়ে দরকার নেই। খারাপ সংসর্গে গিয়ে কাজ নেই তোমাদের।'

ভুবনময়ী শুয়ে পড়েছিলেন। তিনি উঠে এসে ভাইবোনের ঝগড়া থামাতে চেষ্টা ক'রে বললেন, 'তোরা কি হয়েছিস বল তো, বাড়িতে কি ডাকাত পড়েছে যে এত চেঁচামেচি শুরু করেছিস তোরা, ছেলে-বেলায়ও তো এত ঝগড়া বিবাদ তোরা করিসনি। আর এই বুড়ো বয়সে—'

মা'র কথার কোন জবাব না দিয়ে বাসন্তী মেয়েকে নিয়ে নিজের ঘরে চলে গেলেন। তারপর কঠিন স্বরে মেয়েকে শাসন ক'রে বললেন, 'খবরদার, ফের যদি ওদের ঘরে পা বাড়াতে দেখি, আমি তোমাকে আস্ত রাখব না, বিজুদা বিজুদা, বিজুদার জামা, বিজুদার কাপড়, বিজুদার জুতো দিনরাত তো বিজুদার জিনিসপত্রের তদারকি নিয়েই আছিস। আজ হোল তো শিক্ষা? শুনলি তো সব? যদি একটুও মান-অপমান বোধ থাকে তা'হলে ভুলেও আর ওমুখো হবিনে। কানে যাচ্ছে কথা?'

প্রীতি বলল, 'যাচ্ছে মা।'

বাসন্তী আবার বললেন, 'হ্যাঁ, তোমাকে আমি স্পষ্ট নিষেধ করে দিলাম, ওদের ছেলেমেয়ে কারো সঙ্গেই মিশতে পারবে না তোমরা। পড়াশুনো গল্পগুজব যা করবার নিজেদের ঘরে বসে নিজেদের ভাই-বোনের সঙ্গে করবে, ওদের সঙ্গে মেলামেশার মোটেই দরকার নেই আর।'

অবনীমোহন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। স্ত্রীর চেঁচামেচির শব্দে তাঁর

ঘ্নম ভেঙে গেল। বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কি ব্যাপার। রাত দ্নপ্নরে আবার কি হোল তোমার।'
বাসন্তী বললেন, 'যা হবার হয়েছে। তুমি ঘ্নমন্চ্ছ ঘ্নমোও, তুমি তো সংসারের সাতেও নেই পাঁচেও নেই। তোমার আর কি। কারো মান-অপমানের ধার যতো তোমাকে ধারতে হয় না।'
প্রীতির মন এক অদ্ভুত বিতৃষ্ণা আর বিস্বাদে ভরে উঠল। এই খানিকক্ষণ আগে জলসায় গান বাজনা শ্ননতে শ্ননতে কি আনন্দই না পেয়েছিল। আর তার পরিণতি হোল এই কুশ্রী ঝগড়ায়। বিজ্নর ওপরও তার ভয়ঙ্কর রাগ হোল। জানাই তো আছে যে তার বাবা এসব পছন্দ করেন না। তব্ন কেন জলসায় প্রীতিকে বিজ্ন সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল। সে না বললে তো আর প্রীতি যেত না। প্রীতি জানতেও পারত না। বিজ্নর জন্যেই প্রীতির মাকে এমন অপমান সহ্য করতে হোল।
দিন কয়েক মায়ের নির্দেশ প্রীতি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলল। বিজ্নর সঙ্গে কোন কথা বলল না। কোন পড়া ব্নঝবার জন্যে গেল না তার কাছে। শ্নধ্ন বিজ্নর সঙ্গেই না, মামাত ভাই বোন সকলের সঙ্গেই সে কথা বন্ধ করল। বিজ্নও ক'দিন খ্নব গম্ভীর হয়ে রইল। এমন ভাব করল যেন প্রীতিকে সে চেনেই না। যেন সামান্য আলাপ পরিচয়ও নেই পরস্পরের সঙ্গে।
কিন্তু দ্ন'জনেরই মনটা খারাপ হয়ে রইল। যেন সমস্ত প্নথিবী শ্নষ্ক আর শ্নন্য হয়ে গেছে।
একদিন বিকেলে চিলাকোঠার আড়ালে প্রীতি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। চারদিকে কেবল বাড়ি আর বাড়ি। প্রাচীর আর প্রাচীর। এই নিষেধের বেড়া পার হয়ে আর বেরোবার জো নেই। সারাজীবন যেন এই বন্দীদশার মধ্যে কাটবে। কিসের এই হতাশা, কিসের এই শ্নন্যতা প্রীতি ব্নঝে উঠতে পারে না। আর সব ভাইবোন তো এর মধ্যেই সন্তুষ্ট। যা পাচ্ছে তাই নিয়েই খ্নশি। কিন্তু প্রীতি কি

চায়। সে কেন খুশি হ'তে পারে না, কি হ'লে কি পেলে মনের এই শূন্যতা কাটে।
হঠাৎ প্রীতি চমকে উঠল। পিছন থেকে কে যেন আস্তে আলগোছে তার কাঁধে হাত রেখেছে।
প্রীতি মুখ ফিরিয়ে দু'পা পিছিয়ে গেল, বলল, 'যাও এখান থেকে। তোমাদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।'
বিজু প্রীতির রাগ দেখে একটু হেসে বলল, 'তাই নাকি।'
প্রীতি বলল, 'তাই নাকি মানে। সেদিন তোমার বাবা মাকে কি অপমানটাই না করলেন আর তুমি একটা কথা পর্যন্ত বললে না, অথচ তোমার জন্যেই তো এমন হোল। কিন্তু আশ্চর্য, একটা প্রতিবাদ পর্যন্ত তোমার মুখ থেকে বেরোল না।'
বিজু একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, 'মুখে প্রতিবাদ করে লাভ কি হোত, তাতে ঝগড়া ঝাঁটি বাড়ত ছাড়া কমত না। প্রতিবাদ করি তো আমরা কাজের ভিতর দিয়েই করব। এখন যেমন করছি।'
প্রীতি আর কোন কথা বলল না। কিন্তু বিজুর কথা বলার ভঙ্গি ওর ভারি ভালো লাগতে লাগল। মুহূর্তপূর্বের নীরবতা যেন আর নেই। সব শূন্যতা ফের ভরে উঠেছে।
একটু বাদে এদিকে কার পায়ের সাড়া পেয়ে বিজু চলে গেল। ঝগড়ার পরিসমাপ্তিতে দু'জনের মনেই শান্তি এসেছে। কিন্তু তাদের মধ্যে ঝগড়ার সম্পর্ক যে আর নেই একথা বাইরে অন্য কাউকে তারা বুঝতে দিল না। আর সকলের সামনে তারা আগের মত মুখ ভার ক'রেই চলে। পরস্পরের আত্মীয়তাকে স্বীকার করে না। কিন্তু রোজ দু' একবার ক'রে বাড়ির অন্য সকলের চোখের আড়ালে তাদের দেখা সাক্ষাৎ হয়। বিনিময় হয় মাত্র দু' একটা কথার। কিন্তু সেই দু' একটা কথা যেন শুধু দু' একটা কথাই নয়, সেই দু' এক মিনিটের ব্যাপ্তিও অনেকখানি।
দুই পরিবারের ঝগড়া ফের মিটে গেল। বাসন্তী বৈদ্যনাথের সঙ্গে

আবার কথাবার্তা বলতে লাগলেন। কিন্তু বিজু আর প্রীতির লোক-দেখানো মনোমালিন্য সহজে মিটল না। বাড়ির অন্য সকলের সামনে পরস্পর সম্বন্ধে তাদের ঔদাসীন্য অবজ্ঞার যেন আর সীমা নেই। কিন্তু সকলের চোখের আড়ালে মনের অবস্থাটা অন্যরকম। এই লুকোচুরির মধ্যে যেন তারা এক নতুন রহস্যের আভাস পেয়েছে। স্বাদ পেয়েছে এক বিচিত্র সম্পর্কের।

অনেক খোঁজখবর চেষ্টা-চরিত্রের পর শেষ পর্যন্ত চাকরি একটি মিলল করবীর। কোন অফিস-টফিসে নয়, পদ্মপুকুর বিদ্যাপীঠে। মেয়েদের হাইস্কুলে। কিন্তু মাইনে বড় কম। মাসে চল্লিশ টাকা। গ্রাজুয়েট হ'লে ষাট হোত। খোঁজটা অরুণই নিয়ে এল। বলল, 'করবেন? এত অল্প টাকায় কি পোষাবে আপনার?'

করবী বলল, 'না পোষালে উপায় কি—এখন যা পাই তাই নিতে হবে।'

অরুণ বলল, 'বেশ তাহলে একদিন চলুন আমার সঙ্গে। মিসেস দত্তের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই।'

মাধবী দত্ত অরুণেরই এক প্রফেসর বন্ধুর স্ত্রী। মনোহরপুকুর রোডে একটি ফ্ল্যাট নিয়ে সস্ত্রীক থাকেন প্রফেসর দত্ত। তাঁর স্ত্রী পদ্মপুকুর বিদ্যাপীঠের হেডমিস্ট্রেস।

আগে থেকে ব্যবস্থা করে করবীকে নিয়ে এক রবিবার তাঁদের বাসায় গিয়ে দেখা করল অরুণ।

কথাবার্তা অরুণ মোটামুটি আগেই বলে রেখেছিল। নতুন করে বেশি কিছু আর বলতে হোল না। মাধবী দেবী করবীদের আপ্যায়ন করে ড্রয়িং-রুমে বসালেন। চা, খাবার আনালেন। দু'চার কথা জিজ্ঞেস করবার পর বললেন, 'আচ্ছা, একখানা এ্যাপলিকেসন আপনি কালই পাঠিয়ে দেবেন। একজন টিচার আমাদের নিতেই হবে। আপনার জন্যে আমি অবশ্যই চেষ্টা করব।'

ইংরাজীতে টাইপ করা আবেদনপত্র করবী সঙ্গে নিয়েই এসেছিল। হেডমিস্ট্রেসের কাছে সেখানা রেখে গেল।

সেক্রেটারীর কাছে আর একদিন ইণ্টারভিউ দিতে হোল করবীকে। তার দিনকয়েক পরেই এল নিয়োগপত্র।

টিউশানি সেরে অরুণ এল রাত্রে দেখা করতে। বলল, 'চাকরি সত্যিই পেলেন তাহলে?'

করবী কৃতজ্ঞতার সুরে বলল, 'পেলাম, আপনার জন্যেই পেলাম। সত্যি আপনার নিজেরও তো চাকরি-বাকরি নেই। তবু এতদিন ধরে আমার জন্যেই আপনি চেষ্টা করেছেন।'

অরুণ একটু হেসে বলল, 'না, যতটা পরার্থপর আমাকে মনে করেছেন, আমি ততটা নই। চেষ্টা দু'জনের জন্যেই চালাচ্ছিলাম, একজনের আপাতত যা হোক কিছু একটা হোল। অবশ্য প্রয়োজনের তুলনায় এ কিছুকে সামান্য কিছুও বলা যায় না। তবু একেবারে বেকার থাকার চেয়ে—'

করবী বলল, 'তাতো ঠিকই।'

মাসখানেক পরে আরো একটু সুবিধা হোল। পর পর দুটো টিউশানিও জুটে গেল করবীর। দুটোয় মিলে পঞ্চাশ টাকা। স্কুলের মাইনের চেয়ে বেশি। অবশ্য স্কুলের হেডমিস্ট্রেসের যোগা-যোগেই টিউশানি দুটো জুটল।

অরুণ খবর পেয়ে বলল, 'বেশ তো, আপনি নেহাৎ কম স্বার্থপর নয় দেখছি। পটাপট ভালো ভালো চাকরি আর টিউশানি জুটিয়ে নিচ্ছেন। আর আমি যে বেকার সেই বেকারই রয়ে গেলাম।'

করবী লজ্জিত হয়ে বলল, 'সত্যি, এবার আপনার জন্যেই আমার চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু জানেন তো, আমাদের সাধ্যের সীমা।'

অরুণ বলল, 'থাক থাক, আপনাকে আর বিনয় করতে হবে না। আপনার সাধ্য কি কম নাকি?'

করবী বলল, 'কম নয়? কিসে বেশি দেখলেন বলুন?'
অরুণ সংক্ষেপে বলল, 'দেখছি।'
সাড়ে দশটায় স্কুল বসে। রোজ দশটার মধ্যে করবীকে বেরিয়ে পড়তে হয়। স্নান সেরে তৈরী হয়ে নিতে হয় তারও আগে। প্রথম প্রথম ক'দিন রান্নাও করত, কিন্তু ব্লাডপ্রেসারটা একটু কমে যাওয়ার পর শাশুড়ী নিজেই এসে বসলেন রাঁধতে। করবী আপত্তি করে বলেছিল, 'এ কি, আপনি এলেন কেন?'
নিভাননী বললেন, 'ক'দিন আমিই রাঁধি। তোমার তো কষ্ট হয়।'
করবী বলল, 'তাই বলে আপনি কেন রাঁধবেন। না না তা হবে না।'
নিভাননী এবার কড়া ধমক দিলেন পুত্র-বধূকে,—'হবে না মানে? তুমি কি সত্যিই একটা শক্ত অসুখ-বিসুখ ঘটাতে চাও করবী? দিন-রাত এই খাটুনি, তারপর ফের যদি তুমি আগুনের তাপে এসে বস, তাহলে কি শরীর থাকবে?'
করবী বলল, 'কিন্তু আপনার শরীরও তো ভালো নয় মা, এই বয়সে আগুনের তাপ আপনারই বা সইবে কেন?'
নিভাননী জবাব দিয়েছেন, 'সইবে সইবে। আগুনের তাপে আমার কিছু হবে না। রাঁধা-বাড়ার অভ্যাস আমার না আছে তাতো নয়। বসে বসে রাঁধব, তাতে কি এমন হবে। কিন্তু বেশি অত্যাচার অনাচার করে তুমি যদি শুয়ে পড় তাহলে আর উপায় থাকবে না।'
তারপর থেকে নিভাননী নিজেই রান্না-বান্না শুরু করলেন।
কাজে বেরুবার আগে করবী আসন পেতে গিয়ে খেতে বসে।
নিভাননী নিজের পুত্রবধূকে নিরামিষ তরকারীর সঙ্গে ভাত বেড়ে দেন। পাতের সামনে বসে খাওয়ার তদারক করেন। করবীর মনে পড়ে, তার স্বামী পরেশ যখন অফিসে যাওয়ার আগে খেতে বসত, তখনও নিভাননী তার পাতের কাছে বসে এইরকম করতেন। কম খাওয়ার জন্যে অনুযোগ আর বেশি খাওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করতেন রোজ। ছেলে মারা যাওয়ার পর আজ ছেলের বউ সেই জায়গা

নিয়েছে। করবীর রোজগারেই এখন সংসার চলবে। তার ওপরই সবাইকে নির্ভর করতে হবে। তার শরীর যাতে একটু সুস্থ থাকে, সে কাজকর্মে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, সে সম্বন্ধে লক্ষ্য না রাখলে চলে না।

দিনকয়েক পরে দিলীপ করবীর খাওয়ার সময় খুরিতে করে দু-আনার দই নিয়ে এল।

করবী বলল, 'ও আবার কি?'

দিলীপ বলল, 'খাও বউদি। নিরামিষ খেতে তোমার তো ভারি কষ্ট হয়। পেট ভরে তো খেতেই পার না। মার না হয় খেতে খেতে অভ্যাস হয়ে গেছে। তোমার তো আর তা হয় নি। কিন্তু একেবারে না খেলে শরীরই বা থাকবে কি করে?'

করবীর চোখ ছল ছল করে উঠল। এই ছোট্ট দেওরের এত দরদ তার ওপর। স্বামী গেছেন। করবী ভেবেছিল, একজনের সঙ্গে সঙ্গে বুঝি সবাই গেছে। কিন্তু সব তো যায় নি। তিনি তাঁর স্নেহ মমতা রেখে গেছেন এদের মধ্যে। ছেলে, দেওর আর শাশুড়ীর আদর যত্নের মধ্যে যেন স্বামীরই সেই ভালোবাসার স্বাদ পেল করবী। না, সব শূন্য হয় নি। সব শূন্য হয় না। রাখতে জানলে একজন গেলেও সব ভরে রাখা যায়। তার স্মৃতি দিয়ে সব ভরে রাখতে হয়।

দইয়ের সবটুকু ঢেলে নিল না করবী। আধাআধি নিয়ে বাকিটুকু খুরিতে রেখে দিল।

নিভাননী বললেন, 'ওকি, ওইটুকু তো দই, তার আবার রাখলে কেন?'

করবী বলল, 'থাক একটু, দিলু আর পিপলুকে দেবেন।'

নিভাননী হেসে বললেন, 'আর আমি বুঝি বাদ যাব। কিন্তু কেবল দিলু আর পিপলুই বা কেন। তোমার ওই ছোট দইয়ের খুরির ভাগ দেওয়ার জন্যে দেখ পাড়াপড়শীদের আর কাকে কাকে ডেকে আনবে।'

দিলীপ কাছে দাঁড়িয়েছিল। সেও হাসল, বলল, 'বউদি, তোমার দই

কি গল্পের সেই দীনবন্ধুদাদার দইয়ের মত যে, খুরি থেকে যত ঢালবে, ততই ভরে উঠবে?'

করবী কোন জবাব দিল না। মনে মনে ভাবল, মাঝে মাঝে হৃদয় সেই দীনবন্ধুদাদার খুরিই হতে চায় বটে, এক ফোঁটা করুণা, পৃথিবীর কাছ থেকে সামান্য একটু সদয় ব্যবহারে শুকনো, শূন্য-হৃদয় অমৃতে এমন কানায় কানায় ভরে ওঠে যে, মনে হয় সবাইকে সেখানে নিমন্ত্রণ করে না আনতে পারলে যেন তৃপ্তি নেই। মনে হয়, যে দাক্ষিণ্য নিজে পেয়েছি, তা সবাই পাক; যে মাধুর্যের স্বাদ নিজে অনুভব করেছি, তার অমৃত-স্বাদে সমস্ত পৃথিবী মধুর হয়ে উঠুক।

খাওয়া সেরে স্কুলে বেরোবার জন্যে তৈরী হোল করবী। কালো ফিতেপেড়ে ফর্সা শাড়িখানা প'রে নিল। বেরুবার আগে স্বামীর ফটোর সামনে এসে একবার দাঁড়াল করবী। রোজই দাঁড়ায়। মনে মনে অনুমতি নেয়। না, পরেশের কোন গোঁড়ামি ছিল না। মেয়েদের চাকরি-বাকরি করা সে পছন্দ করত। করবী বলত, 'তাহলে আমাকে দাও একটা কিছু জোগাড় করে।'

পরেশ বলত, 'দেব বইকি। যখন দরকার বোধ করব, নিশ্চয়ই দেব।' কিন্তু পরেশের দরকার বোধ করবার দরকার হয় নি। তার আগেই সে চলে গেছে। আর সমস্ত প্রয়োজনের বোঝা আজ চেপেছে করবীর ঘাড়ে। কিন্তু তার জন্যে দুঃখিত নয় করবী। বিধবা হয়ে অন্যের আশ্রয় যে তাকে ভিক্ষা করতে হয় নি, বরং দেওর, শাশুড়ীকে আশ্রয় দিতে পেরেছে, এর জন্যেই নিজের ভাগ্যকে সে ধন্যবাদ দেয়। নিজের এই শক্তিসামর্থ্য মনের এই সাহস যেন তার চিরকাল থাকে। স্বামীর কাছেই যেন প্রার্থনা জানাল করবী। প্রতিকৃতির মধ্যে পরেশের মুখ গম্ভীর, প্রশান্ত। তার স্নিগ্ধ দুটি অপলক চোখ করবীর দিকে তাকিয়ে রয়েচে। করবী মনে মনে বলল, 'হ্যাঁ, এমনি করেই তাকিয়ে থেক তুমি। এমনি করেই আমাকে সব সময় দেখ। তুমি আমার নয়নে নয়ন রেখ অন্তরমাঝে।'

'মা, আমাকে ওই তাজমহলটা দাও না। আমি খেলব।'
পিপলুর কথায় চমকে উঠে করবী তাড়াতাড়ি মুখ ফেরাল। দুষ্টু ছেলে করেছে কি, চেয়ারটা টেনে নিয়ে গেছে কাঁচের আলমারীর কাছে। তারপর তার একটা পাল্লা ধরে ক্রমাগত টানাটানি করছে। ভিতর থেকে ছোট্ট তাজমহলটা সে বের করবে। বের করে খেলবে।
ছেলেকে একটু ধমক দিল করবী, 'ও কি হচ্ছে।'
পিপলু আবার বলল, 'আমাকে তাজমহলটা দাও না মা।'
করবী বলল, 'ছিঃ, এই দামী জিনিস দিয়ে কেউ খেলে না কি?'
পিপলু বলল, 'খেলে না? তবে কি করে?'
করবী বলল, 'ঘরে তুলে রাখে, ঘর সাজিয়ে রাখে।'
কিন্তু পিপলু নাছোড়বান্দা। আজ ওই তাজমহলটা তার চাই-ই। বিরক্ত হয়ে শাশুড়ীকে ডাকল করবী। 'মা, পিপলুকে নিয়ে যান তো এখান থেকে। বড় দুষ্টুমি শুরু করেছে।'

নিভাননী এসে ঘরে ঢুকল—'কি হয়েছে কি সারাদিন তো তোমাকে দেখতে পায় না, তাই যাওয়ার সময় এক-আধটু মাতলামি করে। সেজন্যে কি অমন করে ধমকাতে হয়? কি চাইছে কি ও।'
করবী বলল, 'ওই তাজমহলটা চায়। দেখুন দেখি আবদার!'
নিভাননী নাতিকে কোলে টেনে নিতে নিতে বললেন, 'ছিঃ, কাজের জিনিস কি নেয় নাকি দাদু?' তারপর করবীর দিকে ফিরে তাকালেন তিনি। 'এটা তো অরুণ কিনে দিয়েছিল না বউমা, আচ্ছা, কি হয়েছে ছেলেটির বল তো? কতদিন ধরে আসে না—একবার খোঁজ নিলে হয়।'

কথাটা নিজেও ভাবছিল করবী। নিজের মনের কথা শাশুড়ীর মুখে শুনতে পেয়ে ও ভারি খুশি হোল। বলল, 'হ্যাঁ, খোঁজ নিতে হবে। ক'দিন ধরে আসছেন না আর। অসুখ-বিসুখ হয়ে পড়ল কি না, কে জানে।'

হঠাৎ অরুণের জন্যে করবী মনে মনে বড় ব্যাকুলতা বোধ করল। বেশ

আমুদে, স্ফূর্তিবাজ মানুষ। যতক্ষণ থাকেন, দিলীপ আর পিপলুকে নিয়ে খেলেন। হৈ-হল্লায়, ছুটোছুটিতে সারা বাড়িটা বেশ সরগরম হয়ে ওঠে। দু-একদিন বাদে বাদেই তো আসতেন। সেই মানুষের আজ প্রায় দিন সাতেক ধরে দেখা নেই। করবী নিজেও চাকরি আর নতুন টিউশানি নিয়ে এত ব্যস্ত রয়েছে যে, আর কারো কথা ভাববারও সময় পায় নি। ভাববার কথা তার মনেও হয় নি। কিন্তু আজ যেন এই ক'দিনের বিস্মরণ তার শোধ তুলল। করবীর বার বার মনে হতে লাগল, অরুণের খবর তার একবার নেওয়া উচিত ছিল। অমন উপকারী বন্ধুর খোঁজ না নেওয়া তার অন্যায় হয়েছে।

বাইরের ঘরে দিলীপ বসে পড়ছে। করবী যাওয়ার আগে দিলীপের ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল।

'দিলীপ শোন!'

'কি বউদি।'

বইয়ের পাতা থেকে করবীর দিকে তাকাল দিলীপ।

করবী একটু ইতস্তত করে বলল, 'আচ্ছা, অরুণবাবুর কি হয়েছে জানো? তিনি তো অনেকদিন আসেন না।'

দিলীপ বলল, 'জানিনে তো বউদি। তবে যদি বল স্কুলে খোঁজ নিতে পারি।'

করবী বলল, 'স্কুলে কি করে খোঁজ নেবে?'

দিলীপ বলল, 'অরুণদা যে ছাত্রটিকে পড়ান, সে তো আমাদের ক্লাসেই পড়ে। তার কাছে জিজ্ঞেস করলেই হবে।'

করবী খুশি হয়ে বলল, 'ঠিক। তাহলে তার কাছেই একবার খোঁজ নিয়ে এসো। ভদ্রলোকের অসুখ-বিসুখ করল কি না কে জানে।' বলে করবী স্কুলে চলে গেল।

ছোট ছোট মেয়েদের ক্লাস। একটার পর আধ ঘণ্টা টিফিন আছে। ক্লাস সেরে খানিকক্ষণ বিশ্রামের জন্যে টিচারদের রুমে গিয়ে বসল করবী। সুলতা চ্যাটার্জী স্কুলের সেকেণ্ড টিচার। বছর তিরিশেক বয়স।

কিন্তু মিশতে পারে সব বয়সী মেয়েদের সঙ্গে। করবী ঘরে ঢুকতেই তাকে ডেকে নিজের পাশের চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'এই যে আসুন, বসুন এসে এখানে।' করবী তাঁর পাশে গিয়ে বসল।
সুলতা বলল, 'ভালো পড়াতে পারেন বলে এরই মধ্যে আপনার খুব নাম শুনছি। মেয়েরা বলাবলি করছিল।'
করবী লজ্জিত হয়ে বলল, 'কি যে বলেন।'
সুলতা বলল, 'আপনার গুণ থাকলে কি হবে দোষও আছে। সেকথাও কিছু বলব।'
করবী বিস্মিত হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকাল।
সুলতা হেসে বলল, 'আপনি বড় অমিশুক। কারো সঙ্গে মিশবেন না, কথা বলবেন না, হাসি-গল্প করবেন না। শুধু মুখ বুজে কাজ করে যাবেন। তাহলে কি হয়? সে কাজে কি আর রস পাওয়া যায়? একেই তো এই মাস্টারীর মত কাজ। দু'বছর যেতে না যেতেই দেখবেন এমন একঘেয়ে বস্তু আর দুনিয়ায় নেই। যেটুকু সুখ, তা এই পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশায়। অমন করে মুখ গম্ভীর করে থাকবেন না। লোকের সঙ্গে মিশবেন, আলাপ আলোচনা করবেন।'
করবী বলল, 'দেখুন আগে খুব মিশতে পারতুম। আজকাল চেষ্টা করেও আর পারিনে। তেমন যেন ইচ্ছাই হয় না।'
সুলতা একটুকাল চুপ করে থেকে সহানুভূতির সুরে বলল. 'দেখুন, আমি সব শুনেছি। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম, আপনার বুঝি বিয়ে-থা হয় নি, আপনাকে দেখলে কিন্তু তাই মনে হয়। পরে হেড-মিস্ট্রেসের কাছে শুনলাম সব কথা। শুনে অবশ্য খুব দুঃখই হোল। দুঃখেরই যে কথা। কিন্তু দুঃখ করে কি করব বলুন। আপনিই বা সেই দুঃখের কথা মনে রেখে কি করবেন। আপনাকে সব ভুলতে হবে।'
করবী একটু যেন চমকে উঠল—বলল, 'সব ভুলতে হবে!'

সুলতা বলল, 'ভুলতে হবে বই কি। সারাজীবন কি দুঃখ নিয়ে বাঁচা যায়।'

টিফিনের ঘণ্টা শেষ হওয়ার পর ফের ক্লাস আরম্ভ হোল। মেয়েদের পড়াতে পড়াতে সুলতার কথাটা বার বার মনে পড়তে লাগল করবীর। সারাজীবন দুঃখ নিয়ে বাঁচা যায় না। তবে কি নিয়ে বাঁচা যায়, কি নিয়ে বাঁচবে করবী। স্বামীর সঙ্গে তো তার দুঃখের স্মৃতিই জড়ানো। দুঃখকে ভুললে যে তাকেই ভোলা হবে। কিন্তু তাই বা কেন। পাঁচ বছরের দাম্পত্যজীবনে সুখ-স্মৃতিও তো আছে। সেই সুখ সম্ভোগের দিনগুলির কথা, রাতগুলির কথা মনে করে করে সারাজীবন কাটিয়ে দেবে করবী। সমস্ত জীবন সেই পাঁচ বছরকে অক্ষয় করে রাখবে। তার আর কোন সুখের প্রয়োজন নেই।

স্কুল ছুটির পরে টিউশানি। একই বাড়ির চার নম্বর আর ছ' নম্বর ফ্ল্যাটে মাসখানেকের মধ্যে টিউশানি দু'টি জুটে গেছে।

চার নম্বরে একটি ধনী ফার্নিচার ডিলারের পুত্রবধূকে পড়াতে হয়। ছ' নম্বরে পড়ায় ছোট ছোট দু'টি মেয়েকে। দুই জায়গা থেকেই প'চিশ টাকা করে পায়। প্রত্যেকটি টিউশানির পিছনে দেড় ঘণ্টা করে সময় যায়। সব মিলিয়ে তিন ঘণ্টা। কোন কোনদিন তার বেশিও লাগে।

কিন্তু আজ একটু সকাল সকালই ফিরতে পারল করবী। চার নম্বরের বউটি তার স্বামীর সঙ্গে সিনেমা দেখতে গেছে। তার শাশুড়ি বললেন, 'দেখুন দেখি কি আক্কেল। সিনেমা দেখবে, রবিবার-টবিবার দেখলেই হয়। মিছামিছি একটা দিন নষ্ট।'

বাসায় আসবার সঙ্গে সঙ্গে দিলীপ বলল, 'অরুণদার খবর পেয়েছি বউদি, ভালো খবর নয়।'

করবী একটু চমকে উঠে বলল, 'সে কি রে। কি হয়েছে তাঁর।'

দিলীপ বলল, 'না না, তেমন কিছু নয়। তাঁর এ পাড়ার টিউশানিটি গেছে।'

করবী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল, 'ও তাই বল। তোমার ভূমিকা শুনে আমি ভেবেছিলাম, কি বিপদ-আপদই না জানি হয়েছে, কিন্তু টিউশানিটি গেল কি করে?'

দিলীপ বলল, 'ওঁদের বাড়িতে কি কোন টিউটরের বেশিদিন টিকবার জো আছে? বাপ-মা-ছেলে কেউ না কেউ অপছন্দ করে বসলেই হোল। শ্যামল বলল, এবার কিন্তু ভাই আমার কোন দোষ নেই। মাস্টার মশাইর বিরুদ্ধে এবার আমি কোন কথা লাগাই নি, তবে ভদ্রলোক অঙ্কটঙ্ক কিছু পারতেন না।'

করবী চটে উঠে বললেন, 'না, অঙ্ক পারতেন না। আর অঙ্কের জাহাজ বুঝি ও নিজে।'

দিলীপ একটু হেসে বলল, 'শ্যামলের একটা কথাও বিশ্বাস ক'রো না বউদি। ও ভারি মিথ্যেবাদী। হয়তো ও নিজেই চক্রান্ত করে অরুণদাকে সরিয়েছে। ওর কিচ্ছু হবে না।'

করবী আর কোন কথা না বলে নিজের ঘরে চলে গেল। যাক, তাহলে কোন শক্ত অসুখ-বিসুখ নয়। কিন্তু বেকার মানুষের টিউশানি যাওয়ার বিপদটাও নেহাৎ কম নয়। নিতান্ত অসুবিধেয় না পড়লে এতদূরে অমন সামান্য মাইনেয় কেউ ছাত্র পড়াতে আসে না। মনে মনে অরুণের জন্যে ভারি সহানুভূতি বোধ করল করবী। কিন্তু এপাড়ার টিউশানিটি যে গেছে, এখন যে সে আর আসতে পারবে না, সে খবরটা করবীকে দিয়ে গেলেই তো পারত অরুণ। দেখা করে একবার জানিয়ে গেলে ক্ষতি ছিল কি। না, কি লজ্জা বোধ করছে। কিন্তু চাকরি যাবার চেয়েও কি টিউশানি চলে যাওয়াটা এমন বেশি অগৌরবের যে, সেকথা অরুণ তাকে জানিয়ে যেতে পারল না। তাকে না জানাক দিলীপকে না হয় তার মাকে তো জানিয়ে যেতে পারত। মনে মনে একটু অভিমানই হোল করবীর। কেবল ছাত্রের বাড়ি ছাড়া কি এ পাড়ায় আর কোন পরিচিত লোক ছিল না, পরিচিত পরিবার ছিল না অরুণের? টিউশানি গেলেও

কি তাদের একবার খোঁজ নেওয়ার কথা তাঁর মনে হোল না?

কিন্তু নিজের মনের এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মান-অভিমানে করবী এক সময় নিজেই বিস্মিত হোল, লজ্জিতও হোল। সত্যি, এ কি সে ভাবছে, এত দাবী করছে সে কার ওপর? দাদার অগণিত সহকর্মীদের মধ্যে অরুণও একজন। এখন তো আর সহকর্মীও নয়। করবীর সঙ্গে মাত্র কয়েক মাসের আলাপ। তার আর্থিক দুরবস্থার কথা শুনে অল্প মাইনের একটা স্কুলমাস্টারী জুটিয়ে দিয়েছে, এই পর্যন্ত। সেই পরিচয়ের দাবীতে আর কি আশা করতে পারে করবী? আশা করা সঙ্গতও নয়।

কিন্তু এই যুক্তিতে তেমন স্বস্তিবোধ করল না করবী. তেমন তৃপ্তি পেল না। মনে হোল অরুণের ওপর সে অবিচার করছে। নিশ্চয়ই অন্য কোন কারণে অরুণ এদিকে আসতে পারে নি। অসুস্থ হয়ে পড়াটাও বিচিত্র নয়। তাছাড়া এখন তো সে একেবারে বেকার, নিশ্চয়ই খুব অসুবিধার মধ্যে পড়েছে। মন মেজাজও প্রসন্ন থাকবার কথা নয়। এ অবস্থায় করবীরই উচিত অরুণের খোঁজ-খবর নেওয়া। কৃতজ্ঞতার বলে তো একটা জিনিস আছে! উপকার যতটুকুই হোক করেছে তো। তা স্বীকার করবার মত সৌজন্য করবীর কেন থাকবে না? না, শিষ্টাচারের কোন ত্রুটি ঘটতে দেবে না করবী। অরুণের সে খোঁজ নেবে। কিন্তু কি করে খোঁজ-খবর নেওয়া যায়? অরুণের ঠিকানা অবশ্য তার কাছে আছে। ইচ্ছা করলেই একটা চিঠি দেওয়া যায়। কিন্তু চিঠি দেওয়াটা কি ঠিক হবে? স্বামী বেঁচে থাকতে তাঁর দু-একজন পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে অবশ্য করবী পত্রালাপ করেছে। কিন্তু অরুণ তো আর তা নয়। দাদার বন্ধু ইদানীং নিজেরও বন্ধু। তবু কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ তার কাছে চিঠি লেখায় কেমন যেন একটু সঙ্কোচ বোধ করল করবী। অথচ না লিখেও স্বস্তি নেই। পরদিন ভোরে উঠে দিলীপের কাছে গিয়ে বলল, 'আচ্ছা দিলীপ, অরুণবাবুর একটা খোঁজ নিলে হয় না? ভদ্রলোক কেমন আছেন,

কোন কাজকর্ম পেলেন কি না—'
দিলীপ উল্লসিত হয়ে বলল, 'সত্যি বউদি, আমাদের একবার খোঁজ নেওয়া উচিত। আমি তো ঠিকানা জানিনে। তাহলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতাম।'
করবী বলল, 'ঠিকানা আমি জানি। কিন্তু যাওয়ার দরকার নেই। তুমি বরং একখানা চিঠি লিখে দাও।'
দিলীপ বলল, 'চিঠি! বেশ লিখব। কিন্তু কি লিখব বল তো?'
করবী বলল, 'বাঃ রে, একখানা চিঠি কি করে লিখতে হয় তাও কি তোমাকে শিখিয়ে দিতে হবে না কি? কেন স্কুলেও তো ইংরেজি-বাঙলায় চিঠি লেখা শেখায়।'
দিলীপ বলল, 'তা শেখায়, তবু সে তো স্কুলের চিঠি। তেমন চিঠি লিখতে ইচ্ছা করে না। তার চেয়ে তুমি বরং বল, আমি লিখছি।'
শেষ পর্যন্ত তাই হোল। করবীই বলে বলে গেল কথাগুলি। দিলীপ একটা কাগজে লিখে নিল। অনেক কাটাকুটি অদল-বদলের পর চিঠিটা এইরকম দাঁড়াল ঃ

'শ্রদ্ধাস্পদেষু,

অনেকদিন হোল আপনি এদিকে আসেন নি। দেখা-সাক্ষাৎ তো হয়ই না, সামান্য খোঁজ-খবরটুকু পর্যন্ত নেই। আমরা বড়ই চিন্তিত রয়েছি। আপনার শরীর কেমন আছে, বাড়ির সব কে কেমন আছেন, জানাতে দেরী করবেন না আর সময় করে একবার যদি আসতে পারেন, খুবই ভালো হয়। সকলের সঙ্গেই দেখা-সাক্ষাৎ হতে পারে। আশা করি, শিগ্‌গির একদিন আসবেন। সশ্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ করবেন। ইতি।'

কিন্তু করবীর মুসাবিদায় মোটেই খুশি হোল না দিলীপ। বলল, 'এরকম চিঠি তো আমিও লিখতে পারতাম।'

করবী হেসে বলল, 'তুমি যা লিখতে পারতে তাইতো লিখিয়েছি।'
নিজের নাম স্বাক্ষর করেই চিঠিটা অবশ্য ডাকে দিল দিলীপ। কিন্তু

মনটা ওর খ্ঁৎ খ্ঁৎ করতে লাগল। এমন চিঠি সেও লিখতে পারত, কিন্তু লিখত না। চিঠির একটি শব্দও তার নয়, সব বউদির। কথাগুলি যেন বড় মেয়েলী। এমন হবে জানলে সে বউদিকে তার চিঠির মুসাবিদা করতে বলত না। কোনদিন আর বলবেও না। যা পারে, সে নিজেই লিখবে। নিজের কথা নিজে বানিয়ে না লিখলে কি মনের কথা লেখা যায়?

দিন দুই পরে পোস্ট কার্ডে জবাব এল অরুণের। দিলীপের কাছে সে লিখেছে ঃ 'কল্যাণীয়েষু,

হঠাৎ তোমার চিঠিখানা পেয়ে ভারি খুশি হলাম। জীবনে মাঝে মাঝে ছোট ছোট আশ্চর্য রকমের ঘটনা ঘটে। খুব বড় ধরনের কিছু নয়; পাহাড়ের চূড়ায় ওঠা, কি জাহাজ শুদ্ধ সমুদ্রের তলায় ডুবে যাওয়ার মত বড় বড় রোমহর্ষক কোন কাণ্ড কারখানার কথা বলছিনে। নেহাৎই কারো একখানা চিঠি পাওয়া কি পথ চলতে চলতে ভিড়ের মধ্যে কোন চেনা মানুষের সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ার মত ঘটনা। যা রোজ ঘটতে পারে অথচ রোজ ঘটে না। তোমার চিঠিখানার মধ্যেও সেই জাতের রোমাঞ্চ আছে।

এতদিনে শুনেছ বোধহয় তোমাদের পাড়ার সেই টিউশানিটি গেছে। তোমাদের খবর দিয়ে আসবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু সেদিন গিয়ে দেখলাম বাড়ির দোর জানালা সব বন্ধ। দল বেঁধে কোথায় যেন সব বেরিয়েছে। তাই চলে এলাম। আসছে রবিবার আবার যাব। সাক্ষাৎ মত সব বলব শুনব। দেখো সেদিন আবার কোথাও যেন বেরিয়ো না। ঘরে থাকবার কথাটা মনে রেখো। ইতি—
অরুণ চন্দ।'

চিঠিখানা বার কয়েক পড়ল দিলীপ। হাতের লেখাটি বেশ ভালো অরুণদার, কথাগুলিও বেশ। তবু মনে হোল চিঠিখানার সব কথা যেন তাকেই লেখা নয়, যেন আরো কাউকে কথাগুলি শোনাতে চান অরুণদা। কোনখানে তার নাম নেই, কিন্তু সবখানে তার গন্ধ আছে।

চিঠিটা হাতে করে দিলীপ গিয়ে করবীর কাছে দাঁড়াল, 'বউদি তোমার চিঠি।'

'কই দেখি।'

বলে দিলীপের হাত থেকে চিঠিটা তাড়াতাড়ি কেড়ে নিল করবী। তারপর এপিঠ ওপিঠ পড়ে চিঠিটা ফেরৎ দিয়ে বলল, 'দুষ্টু, এ চিঠি বুঝি আমার। এর কোন জায়গায় আমার কথা লেখা আছে বলতো?'

দিলীপ বললো, 'লেখা নেই, কিন্তু—'

করবী হেসে বলল,—'আসলে আমার সম্বন্ধে একটা কথাও তো কোথাও জিজ্ঞেস করেননি। সেইজন্যেই তুমি তাঁর দোষ ঢাকতে এসেছ।'

অন্য দিনের মত আজও স্কুলে গেল, ছাত্রী পড়াল করবী। কিন্তু আজকের দিনটি যেন ঠিক অন্যান্য দিনের মত নয়। কোথায় যেন একটু বৈশিষ্ট্য লেগে আছে দিনটির মধ্যে। কিসের যেন একটু মাধুর্য। অরুণ ঠিকই বলেছে। একটা সামান্য ছোট ঘটনাতেও দিনের রঙ পালটে যেতে পারে। অসামান্যতার ছোঁয়াচ লাগতে পারে জীবনে। কিন্তু একটু বাদেই করবী চমকে উঠল। এসব ভাবনার কি কোনো মানে হয়।

ফেরার পথে কিছু ফুল কিনে নিয়ে এল করবী। মালা গেঁথে ঝুলিয়ে দিল স্বামীর ফটোয়। সুগন্ধি ধূপ কাঠি জেলে দিল এক পাশে। তারপর সামনে এসে দাঁড়াল। মনে মনে বলল, 'তুমিই আমার একমাত্র অসামান্য। তোমার স্মৃতিই আমার সারাজীবনের পক্ষে যথেষ্ট। আমার আর কোন কিছুর প্রয়োজন নেই।'

ঘুমের মধ্যে গড়াতে গড়াতে পিপলু বিছানার একেবারে এক কিনারে চলে গেছে। কাণ্ড দেখ ছেলের। তক্তাপোশে উঠে এসে করবী ছেলেকে বুকের মধ্যে টেনে নিল। পিপলু যখন আছে তখন আর চিন্তা কি,

তখন তার আর ভয় কি। ও যখন আছে তখন সব আছে।

রবিবার সন্ধ্যার পর অরুণ এসে হাজির হোল।

করবী বলল, 'আসুন। খবর কি আপনার। যাতায়াত দেখাসাক্ষাৎ একেবারেই ছেড়েই দিলেন যে, টিউশানিটি গেছে সেই দুঃখে বুঝি?'

অরুণ হেসে বলল, 'সে দুঃখ কি কম। আপনার দু' দুটি টিউশানি আছে, সে দুঃখ আপনার বুঝবার কথা নয়।'

করবী বলল, 'আপনি তো ভারি হিংসুটে দেখছি। যতটা ভালোমানুষ ভেবেছিলাম ততটা তো নয়।'

অরুণ বলল, 'তাই নাকি?'

অরুণকে বৈঠকখানার ঘরে এনে বসাল করবী। সাড়া পেয়ে পিপলুকে সঙ্গে নিয়ে নিভাননীও এলেন এ ঘরে। বললেন, 'এসো বাবা। ক'দিন ধ'রে তোমার আর কোন খোঁজ-খবর নেই। ভাবলাম অসুখ বিসুখই হোল না কি, বাসার সব ভালো আছে তো?'

অরুণ বলল, 'বাড়ি ভরা লোক, কারো না কারো সর্দিকাসি, মাথা ধরাটরা একটু-আধটু থাকবেই। এসব বাদ দিলে একরকম ভালোই বলা যায়।'

নিভাননী হেসে বললেন, 'অরুণের যেমন কথা। তারপর চাকরি বাকরি কিছু হোল নাকি?'

অরুণ বলল, 'হ্যাঁ, তাও একটা হয়েছে, অনেক হাঁটাহাঁটি ঘোরাঘুরির পর কেরানীগিরি একটা জুটেছে কোন রকমে।'

করবী জিজ্ঞেস করল, 'কোথায়?'

অরুণ বলল, 'এ জি বেঙ্গলে।'

করবী উল্লসিত হয়ে বলল, 'তাই বলুন। তাহলে চাকরি বাকরি জুটিয়ে বেশ নিশ্চিন্ত মনে বেড়াতে বেরিয়েছেন। আর এতক্ষণ খুব দুঃখের কথা বলা হচ্ছিল।'

অরুণ বলল, 'চাকরি জুটলেই কি সব দুঃখ ঘোচে?'

করবী অরুণের দিকে তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল। না চাকরি

জ্বটলেই সব দ্বঃখ ঘোচে না, ঘোচেনি। কিন্তু অর্বণেরতো তা নয়। ওকে তো তেমন কোন দ্বঃখ পেতে হয়নি। শোকের আঘাতে অর্বণের তো ব্বক চুরমার হয়ে যায়নি। তব্বও অর্বণ কেন দ্বঃখের কথা বলছে। অর্বণ দ্বঃখের কি জানে, দ্বঃখের কি বোঝে। ওর তো সমস্ত স্বখ, সমস্ত ভবিষ্যৎ সামনে। অর্বণের আবার দ্বঃখ কি। না অর্বণের কোন দ্বঃখ নেই। ও শ্বধ্ব বলবার ভঙ্গি।

দিলীপও কাছেই ছিল। অর্বণের চাকরির খবর শ্বনে বলল, 'যাক চাকরি পেয়েছেন ভালোই হয়েছে এবার বউদিকে একদিন ভালো ক'রে খাইয়ে টাইয়ে দিন।'

অর্বণ আর করবী পরস্পরের দিকে তাকাল। একট্ব বাদে নিভাননীর দিকে চেয়ে করবী বলল, 'দেখছেন মা দিলীপের লজ্জার বহর। নিজের খাওয়ার কথাটা বলতে পারল না। আসলে নিজের ইচ্ছেটা চাপাচ্ছে আমার ওপর।' নিভাননীও হাসতে লাগলেন।

হঠাৎ অর্বণের হাতের একখানা চটি বইয়ের ওপর চোখ পড়ল করবীর, বলল, 'ওখানা কি।'

অর্বণ বলল, 'একখানা কবিতার বই। কাল বেরিয়েছে।'

করবী বলল, 'সে কি, আপনিও কবিতা লেখেন নাকি!

অর্বণ বলল, 'না না আমি কেন লিখব। আমার একজন বন্ধ্বর বই। আসবার পথে ট্রামে দেখা। একখানা উপহার দিল।'

করবী বলল, 'দেখি।'

তারপর বইখানা নেড়ে চেড়ে দেখল করবী। বইয়ের আর লেখকের নাম পড়ল মনে মনে। জলতরঙ্গ—শ্বভেন্দ্ব সেন। তারপর আস্তে আস্তে অর্বণের হাতে বইখানা ফেরৎ দিয়ে বলল, 'বেশ হয়েছে গেট আপ।'

একট্ব বাদে হঠাৎ বলল, 'ওঁরও ভিতরে ভিতরে ইচ্ছা ছিল একখানা কবিতার বই বের করবার।'

একট্বকাল সবাই চুপ ক'রে রইল। তারপর অর্বণ বলল, 'ইচ্ছা

করলে এখনো তো পরেশবাবুর বই বের করা যায়। কবিতাগুলি আছে তো?'
করবী বলল, 'প্রায় সবই আছে। আমি গুছিয়ে ফাইল করে রেখেছি।'
অরুণ বলল. 'তাহ'লে তো ভালই হোল। সেই ফাইল থেকে বেছে কিছু কবিতা নিয়ে বেশ একখানা বই করা যায়।'
নিভাননী বললেন, 'তুমি সত্যি বলছ অরুণ? এখনো ছাপা যায় তার বই?'
অরুণ বলল, 'কেন যাবে না। চেষ্টা করলে—'
নিভাননী সাগ্রহে বললেন, 'তাহ'লে তুমি একটু চেষ্টা ক'রে দেখ অরুণ। তোমার তো কতজনের সঙ্গে জানা শোনা আছে। তুমি একটু চেষ্টা করলে হয়তো হবে। ওর একটা হাতের চিহ্ন যদি থাকে—'
অরুণ বলল, 'নিশ্চয়ই।'
তাপর করবীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'কবিতাগুলি একটু দেখাবেন আমাকে?'
করবী বলল, 'আজই দেখতে চান?'
অরুণ বলল, 'ক্ষতি কি, আবার কবে আসব। তার চেয়ে আজই দেখে রাখি। অবশ্য আপনার যদি আপত্তি থাকে—'
করবী বলল, 'না না আপত্তির কি আছে। আচ্ছা চলুন ও ঘরে।'
অরুণকে সঙ্গে ক'রে নিজের ঘরে নিয়ে গেল করবী। তারপর ড্রয়ার খুলে বার করল কয়েকটি কবিতার খাতা। বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত কবিতার ফাইলটিও দিল বার ক'রে। অরুণ আস্তে আস্তে পাতা উল্টিয়ে দেখতে লাগল কবিতাগুলি।
করবী একবার মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন লাগছে?'
অরুণ বলল, 'বেশ। বেশির ভাগই দেখছি প্রেমের কবিতা।'
করবী একটু লজ্জিত হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, ওই ধরনের কবিতাই বেশি। অথচ এসব কথা কোনদিনই তিনি মুখে বলতেন না। কিন্তু লেখার

সময় ওই ছিল যেন তাঁর একমাত্র বিষয়বস্তু।'

অরুণ করবীর দিকে তাকিয়ে একটু হাসল, 'তাই নাকি!'

করবী আরও লজ্জিত হয়ে বলল, 'হ্যা, আমিই বরং বলতুম—ও ছাড়া কি লিখবার তোমার অন্য কোন বিষয় নেই? অন্য কিছু নিয়ে লেখ।'

অরুণ বলল, 'তিনি কি জবাব দিতেন?'

করবী বলল, 'তিনি মুখ টিপে টিপে হাসতেন। বলতেন অন্য বিষয় নিয়ে যদি লিখতেই পারব তা'হলে ওবিষয় নিয়ে লিখব কেন? আমি যা পারি তাই লিখেছি, তাই লিখছি। সব বস্তু, সব রস তো আর একজনের জন্যে নয়।'

অরুণ বলল, 'ঠিক কথা।'

তারপর ফের কবিতা পড়ায় মন দিল।

করবী বলল, 'কি মনে হচ্ছে? বই ক'রে বার করা যায় তো? কোন পাবলিশার কি নিতে রাজী হবে?'

অরুণ একটু চিন্তা করে বলল, 'চেষ্টা ক'রে দেখতে হবে কতদূর কি করা যায়।'

কবিতাগুলি একটু পুরোন ধরনের। ভাষা পুরোন, ভঙ্গি পুরোন, ভাবের মধ্যেও বিশেষ কোন মৌলিকতা নেই। যেটুকু আছে সেটুকু শুধু একধরনের সহজ সারল্য। আন্তরিকতা। কিন্তু শুধু এই সম্বলে এ কাব্যগ্রন্থের প্রকাশক পাওয়া শক্ত হবে। অরুণ তা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল। কিন্তু করবীকে সঙ্গে সঙ্গে সে কথা বলতে পারল না। করবী হয়ত দুঃখ পাবে। বরং কবিতাগুলির একটু বেশি রকম প্রশংসা করে বলল, 'না না কবিতাগুলি তো ভালোই, তবে সব পাবলিশার তো কবিতার বই প্রকাশ করে না। যারা করে তাদের কাছে গিয়ে বলে দেখতে হবে।'

করবী বলল, 'আপনাকে যদি এর জন্যে বেশি কষ্ট করতে হয় তা'হলে বরং থাক। কাজ নেই অত হাঙ্গামায়।'

বলে খাতাগুলি করবী গুছিয়ে তুলে রাখতে যাচ্ছিল, অরুণ বাধা দিয়ে

বলল, 'ওকি সব তুলে রাখছেন কেন?'
করবী বলল, 'তবে কি করব।'
'আমাকে দিন দু' একটা। আমি পড়ি, দু' একজন পাবলিশার বন্ধুকে পড়তে দিই। তবে তো কাজ হবে।'
করবী একটু ইতস্তত ক'রে বলল, 'আমি ভাবছিলাম দরকার কি আপনার অত কষ্ট করে?'
অরুণ বলল, 'করলামই বা কষ্ট। যে কোন কাজ করতে হলেই কিছু না কিছু কষ্ট করতে হয়। ভালো কাজের জন্যে আরও বেশি কষ্ট। তাই বলে কি কেউ ফেলে রাখে?'
করবী বলল, 'আচ্ছা নিন তা'হলে।'
অরুণ বেছে বেছে কিছু কবিতা নিল সঙ্গে। তারপর করবীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভয় নেই আপনার। এর একটা লেখাও হারাবে না।'
করবী হেসে বলল, 'আমি কি ভয় পেয়েছি যে আগে থেকেই আপনি অত ভরসা দিচ্ছেন? আপনার কাছ থেকে কিছু যে হারাবে না, সে বিশ্বাস আমার আছে। নইলে আর কাউকে যা দিতে পারিনি, তা আপনাকে দিলাম কি করে?'
বলেই করবী হঠাৎ থেমে গেল। স্বামীর কবিতার খাতা দিতে গিয়ে এত কথা না বললেও হোত অরুণকে। আজকাল সহজেই বড় ভাবপ্রবণ হয়ে পড়ে করবী। স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে তার এই অভ্যাস হয়েছে। কথায় কথায় চোখে জল আসে, স্বর ভারি হয়ে ওঠে। কেমন যেন অসহায় মনে হয় নিজেকে। এমন একজন সহৃদয়, সহানুভূতিশীল বন্ধুকে কাছে পেতে ইচ্ছা করে, যার কাছে সব বলা যায়, হৃদয়ের সব দুঃখ নিবেদন করা চলে। নিজের দুঃখ তো শুধু নিজে বওয়া যায় না, শুধু একা সওয়া যায় না। অন্যকে তার ভাগ দিতে হয়, অন্যের দুঃখের ভাগ নিতে হয়। এই দেওয়া নেওয়ার মধ্যেই দুঃখের ভার লঘু হতে থাকে।
করবীর কথা শুনে অরুণ ওর মুখের দিকে একবার তাকাল। হঠাৎ

এতখানি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে ফেলে করবী যে লজ্জা পেয়েছে, তা বুঝতে অরুণের বাকি রইল না। বিষয়টাকে সহজ করে দেওয়ার জন্যে বলল, 'দেখুন, আপনার কাছে এসব খাতাগুলির যে কি মূল্য, তা আমি জানি। কিন্তু আমার ইচ্ছা এর মূল্য আরো বাড়ুক, শুধু আপনি আমি নয়, আরো পাঁচজনে এর থেকে রস পাক, আনন্দ পাক, তবেই তো পরেশবাবুর লেখাগুলি যোগ্য মর্যাদা পাবে।'

নিভাননী এসে দাঁড়ালেন দোরের সামনে, বললেন, 'কিসের মর্যাদার কথা বলছ অরুণ।'

অরুণ বলল, 'পরেশবাবুর লেখাগুলির। এত ভালো লেখা। এগুলিকে এতদিন প্রকাশ না করাই তো অন্যায় হয়েছে। এ-তো বাক্স-বন্দী করে লুকিয়ে রাখবার জিনিস নয়। তা যদি করি, লেখাগুলির ওপর অবিচার করা হবে।'

আনন্দে নিভাননীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, 'সত্যি বলছ? সত্যি এগুলি ছেপে বার করবার মত হয়েছে?'

অরুণ বলল, 'নিশ্চয়ই।'

নিভাননী বললেন, 'তাহলে তুমি এগুলি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছ?'

অরুণ বলল, 'হ্যাঁ, কিছু কিছু নিলাম। করবী দেবী দিতে চাইছিলেন না, আমিই প্রায় জোর করে কেড়ে নিয়ে গেলাম ওঁর কাছ থেকে।'

অরুণ যাওয়ার জন্যে পা বাড়াল। নিভাননী বাধা দিয়ে বললেন, 'কত রাত হয়ে গেছে। এখান থেকে খাওয়াটা সেরে গেলেই তো পারতে।'

অরুণ বলল, 'এই তো একটু আগে চা-টা খেয়ে নিলাম মাসীমা। খাওয়ার মধ্যে কি আছে।'

নিভাননী বললেন, 'খেয়ে গেলে বড় খুশি হতাম। অবশ্য বাইরের কাউকে খেতে বলবার মত কোন আয়োজনই আজ নেই। কিন্তু তোমাকে তো বাইরের ছেলে বলে মনে করিনে।'

অরুণ বলল, 'অত করে বলছেন কেন, বাড়িতে তো বলে আসি নি, মা

হয়তো খাবার নিয়ে বসে থাকবেন। আর একদিন বরং আসব।'

করবী বলল, 'আর একদিন নয়। একেবারে তারিখ ঠিক করে দিয়ে যান।'

অরুণ বলল, 'বেশ, আপনি ঠিক করুন।'

করবী একটু চিন্তা করে বলল, 'তাহলে সামনের রবিবার আসুন সন্ধ্যার পর। ওদিন তো দুজনেরই ছুটি আছে। সেই ভালো হবে।' একটু থেমে বলল, 'কবিতার বই সম্বন্ধে কি হোল না হোল, তা জানতে পারব। ভালো কথা, এ বইটা যে আপনি ফেলে গেলেন।' বলে অরুণের আনা 'জলতরঙ্গ' বইখানা ওর দিকে এগিয়ে দিতে গেল করবী।

অরুণ বাধা দিয়ে বলল, 'আমি মোটামুটি দেখে নিয়েছি। ও বই থাক এখন আপনার কাছে। আপনি দেখুন। আমি পরে আর একদিন এসে নেব।'

করবী বলল, 'আচ্ছা।'

অরুণ বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এসে ট্রাম ধরল। তার হাতে পরেশের কবিতার খাতা। অরুণ মনে মনে ভাবল, এই পরেশকে সে কোনদিন দেখেনি, কোনদিন দেখাবেও না। করবীর মৃত স্বামী ছাড়া এই লোকটির আর কোন পরিচয়ই তার কাছে নেই। তবু তার কবিতার বই সে প্রকাশ করবার জন্যে নিয়ে যাচ্ছে। কারণ তাতে করবী খুশি হবে। কিন্তু একথাটা নিজের কাছেও নিজে স্বীকার করতে লজ্জাবোধ হোল অরুণের। না শুধু করবীর খুশি হওয়ার জন্যেই নয়, সাধারণ সাহিত্যপ্রীতি থেকেই এ কাজে সে অগ্রসর হয়েছে। একজন মৃত ব্যক্তির স্মৃতিচিহ্ন রাখবার জন্যেই তার আগ্রহ। আর কোন উদ্দেশ্য আর কোন স্বার্থবোধ এর মধ্যে নেই।

পরদিন অফিস থেকে ফেরার পথে এক পাবলিশার বন্ধুর দোকানে গিয়ে হাজির হোল।

বিমলেন্দু সান্যাল তাকে দেখে বলল 'আরে অরুণ যে! কি ব্যাপার, হঠাৎ তুমি এ পাড়ায়।'
অরুণ বলল, 'এলাম। তোমার সংগে একটা জরুরী কথা আছে।'
বিমলেন্দু বলল, 'বল।'
অরুণ পকেট থেকে কবিতার খাতাটা বের করে বলল, 'এর একটা ব্যবস্থা তোমাকে করে দিতে হবে।'
বিমলেন্দু বিস্মিত হবার ভঙ্গি করে বলল, 'বল কি হে। শেষ পর্যন্ত তুমিও কবিতা লিখতে শুরু করলে নাকি? কিন্তু এ যে দেখছি কোন পরেশ চন্দ্র বসুর নাম। লিখলেই যদি তবে আর ছদ্মনামে কেন?'
অরুণ বলল, 'ছদ্মনাম নয়। ওইটাই ভদ্রলোকের আসল নাম।'.
তারপর ধীরে ধীরে বন্ধুকে সব কথা খুলে বলল অরুণ। শেষে অনুরোধ জানাল, 'ভদ্রলোকের স্ত্রীর ভারি ইচ্ছা স্বামীর স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে একখানা বই অন্তত বের করেন—'
বিমলেন্দু মুচকি হেসে বলল, 'বুঝতে পেরেছি তাঁর ইচ্ছেটাই এখানে বড়, নারী ভূমিকাটাই এক্ষেত্রে আসল ভূমিকা।'
অরুণ ধমকের ভঙ্গিতে বলল, ছিঃ, এর যে একটি ভিন্ন দিক আছে, যে দিকটা অত্যন্ত করুণ, অত্যন্ত দুঃখের, সেটা কি তোমার চোখে পড়ছে না বিমল?'
বিমল একটুকাল গম্ভীর হয়ে থেকে বলল, 'পড়বে না কেন অরুণ পড়ছে। কিন্তু পড়লেও কি করব বল। কবিতার বই ছাপবার মত অবস্থা এখন আমাদের নয়। তবে যদি সেই ভদ্রমহিলা নিজের খরচে ছাপেন, প্রকাশক বলে আমাদের নামটা বরং দিতে পারি, এর বেশি কিছু করবার সাধ্য আমাদের নেই।'
দিনকয়েক আরো দু' একটি পাবলিশারের কাছে ঘোরাঘুরি করল অরুণ। সকলের মুখেই এক কথা। এই অজ্ঞাত মৃত লেখকের কবিতার বই ছাপা অসম্ভব।
পরের রবিবার অরুণ ফের গিয়ে উপস্থিত হোল করবীদের বাসায়।

করবী আপ্যায়ন করে বলল, 'আসুন।'
তারপর নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে চেয়ারটা এগিয়ে দিল অরুণের দিকে। একথা ওকথার পর সেই কবিতার খাতার কথা উঠল।
করবী জিজ্ঞেস করল, 'তারপর কি করলেন আপনার বইয়ের।'
অরুণ বিস্মিত হয়ে বলল, 'আমার বই!'
করবী লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, 'ওই হোল। ববস্থা ট্যবস্থা কিছু করা গেল নাকি।'
নৈরাশ্যকর খবরটা বেশ আস্তে আস্তে সইয়ে সইয়ে করবীকে জানাল অরুণ। শেষে বলল, 'আমি অবশ্য এখনো চেষ্টা ছাড়িনি—।'
করবী একটুকাল গম্ভীর হয়ে থেকে বলল, 'না না, অনর্থক চেষ্টা করে কিছু লাভ হবে না। তার চেয়ে নিজের খরচেই আমরা ছাপব সেই ভালো। হয়তো একটু দেরি হবে। তার আর কি করা যাবে। আপনি বরং খোঁজ নিন, কত খরচ পড়তে পারে।'
তাই ঠিক হোল। বই প্রকাশ করাটা আপাতত বন্ধ রইল। কিন্তু সে সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনার অন্ত রইল না।
প্রায় প্রত্যেক রবিবার অরুণ আসে করবীদের ওখানে। পরেশের খাতাপত্রগুলি বের করে। দু-একটা কবিতা করবীকে শুনিয়ে শুনিয়ে আবৃত্তিও করে। তারপর তা নিয়ে আলোচনা সমালোচনা হয়। কবিতার চমৎকার ব্যাখ্যা করতে পারে অরুণ। ভিতরকার গূঢ় অর্থকে সুন্দর করে প্রকাশ করতে পারে। নিজের কবিতার ভাববস্তু এমন করে বুঝিয়ে বলতে পরেশও হয়ত পারত না। ভারি অদ্ভুত লাগে করবীর। সে মুগ্ধ হয়ে শোনে। সত্যিই কি পরেশ এমন চমৎকার লিখত। আগে তো বুঝতে পারেনি করবী আগে তো বুঝতে চেষ্টা করেনি। এখন অরুণের ব্যাখ্যার ভিতর দিয়ে পরশের অনেক কবিতার মর্ম যেন সে নতুন করে উপলব্ধি করেছে।
নিভাননী প্রথম প্রথম এসে বসতেন। অন্যের মুখে ছেলের কবিতার আলোচনা আর ব্যাখ্যা শুনতেন। কিন্তু অরুণ একটু সঙ্কোচ বোধ

করে দেখে আস্তে আস্তে তিনি ওদের এই সাপ্তাহিক কাব্যালোচনার বৈঠক থেকে সরে গেলেন।

সপ্তাহের ছ'টা দিন খুবই ব্যস্ত থাকে করবী। কাজের চাপে তার যেন নিশ্বাস ফেলবার সময় থাকে না। রবিবারেও স্কুলের খাতাপত্র দেখতে হয়। তারপর বিকেলের পর থেকে সে অরুণের জন্যে প্রতীক্ষা করতে থাকে। অরুণ আর কেউ নয়, তার স্বামীর কাব্যের ব্যাখ্যাতা। তার স্বামীর কবিতার স্বাদ গ্রহণের সহায়ক।

করবী তার দূরসম্পর্কের বিধবা মাসীমাকে দেখেছে, স্বামীর ফটো তিনি পূজো করতেন। শুধু ফুল, চন্দন আর ধূপদীপই জ্বালতেন না, শ্বেত পাথরের রেকাবিতে করে নৈবেদ্যও সাজিয়ে দিতেন সামনে। কিন্তু বেঁচে থাকতে পরেশ একটা প্রণাম পর্যন্ত করবীর কাছ থেকে নেয়নি। ঠিক ওই ধরনের বিগ্রহ-পূজায় করবীর নিজেরও কেমন যেন এক ধরনের লজ্জা করে। তার চেয়ে পরেশের কীর্তির আলোচনা, তার রচিত কবিতার ব্যাখ্যার ভিতর দিয়ে স্বামীকে স্মরণ করতে ভালো লাগে করবীর। এও এক ধরনের পূজা। কিন্তু এর পদ্ধতি-প্রকরণটা বেশ আধুনিক। বাইরের একজন পূজক পুরোহিতের অবশ্য দরকার। কিন্তু সে তো নিতান্তই উপলক্ষ্য মাত্র। আসল পূজার অধিকারিণী তো করবী নিজে।

একদিন অরুণ এসে বলল, 'আজ আপনাকে একটা জিনিস দেখাব।'

করবী বলল, 'কি জিনিস।'

অরুণ অত সহজে গূঢ় রহস্য ভাঙ্গল না, বলল,—'অনুমান করুন দেখি।'

করবী বলল, 'আন্দাজ অনুমানের ক্ষমতা আমার নেই, আপনি বলে ফেলুন।'

অরুণ পকেট থেকে একটি পত্রিকা বের করে বলল, 'দেখুন তো কাগজখানা কেমন।'

পত্রিকাখানির সব ক'টিই কবিতা। বিভিন্ন লেখকের লেখা। তার মধ্যে পরেশেরও নাম আছে, আর আছে পর পর তার দু'টি কবিতা।

করবী খানিকক্ষণ কোন কথা বলল না। শুধু কৃতজ্ঞভঙ্গিতে অরুণের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর একটু বাদে বলল, 'সত্যি, আপনি যা আমাদের জন্যে করছেন তার তুলনা হয় না। এমন বোধহয় কেউ কোনদিন করেনি।'

অরুণ বলল, 'এই বুঝি সৌজন্য শুরু হোল। আমার তো ধারণা ছিল, ওসব পর্ব আমরা পার হয়ে এসেছি।'

করবী আস্তে আস্তে বলল, 'তা এসেছি।'

তারপর পত্রিকাখানা শাশুড়ীকে দেখাবার জন্যে পাশের ঘরে চলে গেল। নিভাননীও দেখে খুশি হলেন। ছেলের কবিতা সম্বন্ধে তেমন কোন মন্তব্য না করে অরুণের উদ্দেশেই বললেন, 'সত্যি, ওর মত ছেলে হয় না।' করবী স্মিতমুখে চুপ করে রইল। অরুণের প্রশংসা তার নিজের প্রশংসারই মত। কারণ এই পারিবারিক বন্ধুটিকে সে নিজে আবিষ্কার করেছে। এর সমস্ত কৃতিত্ব করবীর।

যাওয়ার সময় অরুণ আরও একটি সুখবর দিয়ে গেল। এই কবিতার পত্রিকাটি যারা বের করে তাদের সঙ্গে পরেশের কবিতার বই সম্বন্ধে অরুণ কথা বলেছে। কাগজ কেনার টাকাটা যদি তাদের দেওয়া যায়, তারা নিজের খরচে ছাপবে এবং অন্যান্য বইয়ের সঙ্গে বিজ্ঞাপন দেবে। এখন পুরো টাকাটা না দিলেও চলবে। কাজ আরম্ভ করার জন্যে সামান্য কিছু দিলেই হবে আপাতত।

করবী খুশি হয়ে বলল, 'বেশ তো তা দেওয়া যাবে। আপনি কাজ শুরু করে দিন।'

অরুণ বলল, 'তাহলে কবিতাগুলি ফের বাছাই করে রাখুন।'

করবী বলল, 'বাঃ বাছাই করবার আমি কি জানি। যা করবার আপনিই করবেন।'

অরুণ বলল, 'উঁহু আপনি অমন করে দায়িত্ব এড়িয়ে গেলে চলবে না।

যা করতে হয় দুজনে মিলেই করব।'

করবী বলল, 'আচ্ছা।'

অরুণ একটু চুপ করে থেকে বলল, 'ভাবছি বইয়ের ফ্ল্যাপে পরেশবাবুর একটু জীবনীর মত থাকলে মন্দ হয় না। আর সেই সঙ্গে ছোট মত একটু ভূমিকা। কাকে দিয়ে লেখান যায় বলুন তো। আপনি লিখবেন?'

করবী বলল, 'ক্ষেপেছেন? চিঠিপত্র ছাড়া আমি জীবনে কিছু লিখেছি যে আজ লিখব? বরং যা লিখবার আপনি লিখে দিন।'

অরুণ বলল, 'বেশ। আপনার কাছ থেকে শুনে শুনে লিখব। সে একরকম আপনারই লেখা হবে।'

নতুন করে বই প্রকাশের উদ্যোগ-আয়োজন চলতে লাগল। যাচাই বাছাই চলল কবিতার। অরুণ ভূমিকা লিখল, লিখল কবির জীবনচরিত। নাম সম্বন্ধেও দিনকয়েক লাগল মনস্থির করতে। তারপর মাসখানেক বাদে সত্যিই প্রকাশিত হোল পরেশের প্রথম কবিতার বই, 'পাতাবাহার।' ছাপা, বাঁধাই চমৎকার হয়েছে, সুন্দর হয়েছে প্রচ্ছদপট। করবী খুশি হয়ে বলল, 'এর সমস্ত কৃতিত্ব আপনার।'

তারপর উৎসর্গ পাতাটায় চোখ পড়ায় লজ্জিত হয়ে বলল, 'এ কি করেছেন?'

পাতার মাঝখানে সংক্ষেপে লেখা আছে, 'করবীকে।' অরুণ একটু হাসল, 'কেন, ঠিকই তো আছে। পরেশবাবু থাকলে তো এ-ই করতেন।'

করবী আস্তে আস্তে বলল, 'না, তিনি তা করতেন না। এসব ব্যাপারে তাঁর ভারি সঙ্কোচ ছিল।'

অরুণ হঠাৎ বলল, 'বেশ তাহলে ধরে নিন, এর জন্যে আমিই দায়ী।'

করবী অরুণের দিকে একবার তাকিয়ে তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিল। তারপর ফের প্রতিবাদের ভঙ্গিতে বলল, 'না না, এটা ভালো হয়নি।

এর জন্যে আমাকে সকলের কাছে বিশেষ করে মার কাছে বড়ই লজ্জা পেতে হবে।'

অরুণ অভয় দিয়ে বলল, 'বাঃ এতে লজ্জার কি আছে। আপনার স্বামীর বই, আপনার সঙ্কোচের তো কোন কারণ নেই।'

করবী আর কোন কথা বলল না।

বই দেখে নিভাননী ভারি খুশি হলেন। বললেন, 'সবই হোল শুধু যার জিনিস, সে দেখে যেতে পারল না।'

বলতে বলতে তাঁর গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে এল, চোখে জল এসে পড়ল। নিজের ঘরে ফিরে যাওয়ার আগে তিনি অরুণকে ডেকে বললেন, 'তোমার মত বান্ধব আমাদের নেই। তুমি আত্মীয়ের চেয়েও বড়। আর কি বলব, তুমি দীর্ঘায়ু হও। তোমার মা-বাপ যেন কোনদিন আমার মত দুঃখ না পায়।'

রাত্রে শোওয়ার আগে স্বামীর ফটোর সামনে তার একখানা বই রেখে দিল করবী। খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। না, তেমন গভীর শোক কি দুঃখ এই মুহূর্তে তেমন করে যেন অনুভব করল না করবী। তার বদলে অদ্ভুত এক আত্মপ্রসাদ বোধ করল। লাজুক মুখচোরা স্বামীর গোপন ইচ্ছাকে এতদিনে সে বাস্তব করে তুলেছে। শুধু দুঃখ এই, পরেশ নিজের চোখে তা দেখল না।

একটু পরে আলো নিভিয়ে করবী শুয়ে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল অরুণের কথা। যাওয়ার আগে সে বলছিল, 'কাজ এখনো শেষ হয়নি। তাড়াতাড়ি বইগুলির রিভিউর ব্যবস্থা করাতে হবে। দোকানে দোকানে পাঠাতে হেব বিক্রীর জন্যে, এখনো অনেক কাজ বাকি আছে।' অরুণ কবি নয়, কিন্তু সত্যিই খুব কাজের লোক, করবী মনে মনে ভাবল।

চাকরি, টিউশানি আর সাংসারিক কাজকর্মের সঙ্গে সঙ্গে নতুন আর একটি কাজ জুটল করবীর। স্বামীর বইয়ের তত্ত্বাবধান।

এতদিন তার কেনা প্রিয় বইগুলি ঝেড়ে পুছে সেল্‌ফে যত্ন ক'রে সাজিয়ে রেখেছে এখন আরো একখানা বই বাড়ল। তা পরেশের নিজের। তার আকার ছোট হলেও করবীর কাছে তা ছোট নয়। এই বই তার স্বামীর স্মৃতিপুজোর অঙ্গ। করবী খানকয়েক বই বেছে বেছে পরেশের দু' তিনজন বন্ধুকে উপহার পাঠাল, তারা কেউ চিঠিতে ধন্যবাদ দিল, কেউ বা নিজেরা এসে দেখা ক'রে গেল। এক কপি পাঠাল দিল্লীতে দাদাকে। হিরন্ময়ও খুশি হ'য়ে চিঠি দিল, 'বেশ হয়েছে।' কি ভেবে স্কুলের হেডমিস্ট্রেসকেও একখানা বই উপহার দিল করবী আর দিল সেকেন্ড টিচার সুলতাকে। এই সহকর্মিণীটি কিছুদিনের মধ্যেই সহৃদয়া বন্ধুর স্থান নিয়েছে। স্কুল থেকে এক সঙ্গে বেরোয়, খানিকটা পথ এক সঙ্গে হেঁটে আসে। শুধু নিজের সুখ দুঃখের কথাই বলে না, খুঁটে খুঁটে করবীর কথাও জিজ্ঞেস করে।

বই পেয়ে সুলতা খুশি হয়ে বলল, 'এসব গুণও ছিল নাকি তাঁর? কই এর আগে তো বলনি?'

করবী স্মিতমুখে চুপ ক'রে রইল।

স্কুলের অন্যান্য শিক্ষয়িত্রীরাও কৌতূহলী হয়ে বইখানা চেয়ে নিয়ে পড়ল, কেউ কেউ সুখ্যাতিও করল। সমস্ত স্কুলে পরেশের নাম ছড়িয়ে পড়ল। আরো ছড়াক, আরো ছড়াক, স্বামীর কীর্তির মধ্যেই স্বামীকে সে অনুভব করবে।

কিন্তু কাগজে কাগজে যত তাড়াতাড়ি সমালোচনা বেরোবে ভাবা গিয়েছিল তা হোল না। বই প্রকাশিত হওয়ার পর প্রায় দু' মাস কেটে গেল কোথাও সমালোচনার দেখা নেই। করবী অধীর হয়ে অরুণকে বার বার তাগিদ দিতে লাগল, 'কই, কি হোল? সমালোচনা তো কোথাও বেরুচ্ছে না?'

অরুণ বলল, 'চেষ্টা তো করছি।'

মাঝখানে এক রবিবার অরুণ এল না। করবীর বড় ফাঁকা ফাঁকা

লাগতে লাগল। স্বামীর কাব্যের আলোচনা সমালোচনা, তার বইয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হিসাবের জন্যই অরুণকে দরকার।
করবী এক সময় শাশুড়ীকে বলল, 'আজ বোধ হয় অরুণবাবু আর এলেন না।'
নিভাননী নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বললেন, 'হয়তো কোন কাজে আটকা পড়ে গেছে। দূর তো আর কম নয়।'
করবী আর কোন কথা বলল না। অরুণের সম্বন্ধে সে কি বেশি আগ্রহ প্রকাশ ক'রে ফেলেছে? শাশুড়ী কি কিছু ভাবলেন? কিন্তু ভাববার কি আছে? অরুণের মত হিতৈষী বন্ধু আর তো কেউ নেই।

সেদিন শনিবার স্কুল দেড়টায় ছুটি হয়ে গেল। টিউশানিগুলি এ সময় সেরে যেতে পারলে ভালো হোত। কিন্তু ছাত্রীরা সন্ধ্যার আগে কেউ পড়বে না। করবী ফিরে এল বাড়িতে। কিন্তু বাড়িতেও মন টেকে না। মনে হয়, এর চেয়ে স্কুলই যেন ভালো ছিল। সারাদিন বাইরে বাইরে কাটাতে পারলে বাড়ির এই শূন্যতা মনকে ততখানি অস্থির করতে পারে না। মাঝে মাঝে ভারি শূন্য শূন্যই লাগে করবীর। সংসারে সবাই আছে, দেওর ছেলে শাশুড়ী—সকলেই তো ভালোবাসে করবীকে। তবু সেই একজন ছাড়া সবই শূন্য, সবই অন্ধকার।
সেই অন্ধকার পুরী থেকে একটু আগে আগেই বেরিয়ে পড়ল করবী। কাজ নিয়ে সে ভুলে থাকতে চায়। কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে না পারলে দুঃখমুক্তির আর কোন পথ নেই।
নিভাননী বললেন, 'এইতো এলে। এখনই কোথায় বেরুচ্ছ আবার?'
করবী বলল, 'ভালো লাগছে না মা। যাই টিউশানিগুলি সেরে আসি।'
নিভাননী বললেন, 'শরীর যদি ভালো না থাকে তাহ'লে বরং আজ

নাই বা গেলে। একদিন কামাই করলে আর কি হবে।'
করবী বলল, 'না না, কামাই করলেই বরং আরো খারাপ লাগবে। একেক সময় মনে হয়, শনি-রবিবারগুলি না থাকলেই আমার পক্ষে ভালো হোত।'
নিভাননী দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'তুমিই যদি এই কথা বল তাহ'লে আমি কি ক'রে এর মধ্যে থাকি।'
করবী আর কিছু না বলে সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল।
অন্যমনস্কভাবে হে'টে চলেছে, হঠাৎ শুনতে পেল, 'এই যে আপনি, কোথায় যাচ্ছেন এ সময়?'
করবী মুখ তুলে তাকাল। অরুণ একেবারে মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে।
হেসে বলল, 'আমি আপনাদের ওখানেই যাচ্ছিলাম।'
করবী বলল, 'চলুন তাহ'লে।'
অরুণ বলল, 'না, না, আপনি যখন বেরিয়ে পড়েছেন—'
করবী একটু হাসল, 'বেরিয়ে পড়লে কি আর ফেরা যায় না?'
অরুণ বলল, 'তাতে হয়তো আপনার কাজের ক্ষতি হবে।'
করবী বলল, 'না না, ক্ষতির কি আছে। চলুন চা টা খাবেন।'
অরুণ বলল, 'চা তো আপনি রোজই খাওয়ান। আজ না হয় আমি খাওয়াচ্ছি। শুনুন একটি সুখবর আছে। রিভিউ বেরিয়েছে। বেশ ভালো রিভিউ। কাগজখানা আজই আমার হাতে পড়ল; তাই নিয়ে এলাম।'
করবী উল্লসিত হয়ে বলল, 'সত্যি? কই দেখি দেখি।'
অরুণ বলল, 'এই রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখা যাবে না। তার চেয়ে চলুন না ওই রেস্টুরেন্টটায়। চা খেতে খেতে দেখাব।'
করবী একটু ইতস্তত ক'রে বলল, 'চলুন।'
ট্রাম লাইন পার হয়ে দু'জনে মোড়ের রেস্টুরেন্টে গিয়ে ঢুকল।
বয় একটা কেবিন দেখিয়ে দিয়ে দরজার কালো পর্দাটা ফাঁক ক'রে

ধরল। তারপর অরুণরা ভিতরে গিয়ে বসল, ফরমায়েস নেওয়ার জন্যে বয় একপাশে দাঁড়িয়ে বলল, 'কি আনব, ফাউল কারি, চপ কাটলেট—' অরুণ মাসিক কাগজখানা উল্টাতে উল্টাতে বলল, 'আচ্ছা, দুটো কাটলেট নিয়ে এসো আর চা।'

করবী বাধা দিয়ে বলল, 'না না, দুটো নয়, দুটো নয়, শুধু একটা।'

অরুণ চমকে উঠে করবীর মুখের দিকে তাকাল, তারপর লজ্জিত অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে বলল, 'আমি ভারি দুঃখিত। আমার মনে ছিল না। বিশ্বাস করুন, আমি ইচ্ছা ক'রে—'

করবী ম্লান হেসে বলল, 'ইচ্ছে ক'রে কেন বলবেন, আপনি খেয়াল করেননি।'

তারপর বয়ের দিকে তাকিয়ে একটা কাটলেট আর দু'কাপ চায়ের অর্ডার দিল করবী।

অরুণ বলল, 'না না, শুধু দু' কাপ চা। আর কিছু দরকার নেই।'

করবী বলল, 'কেন, দরকার নেই কেন, আপনি খান না।'

অরুণ মাথা নাড়ল, 'না তা হয় না।'

রেস্টুরেন্টের ছোকরাটি বলল, 'খুব ভালো কাটলেট ছিল বাবু, নিয়ে আসি দু'খানা।'

অরুণ ধমক দিয়ে বলল, 'তোমাকে যা বলছি শোন। শুধু দু' কাপ চা নিয়ে এসো।'

বয় আর কোন কথা না বলে চলে গেল। দু'জনে চুপ ক'রে খানিকক্ষণ বসে রইল। কেউ কারো দিকে তাকাল না।

একটু পরে অরুণই ফের কথা বলল, 'সমালোচনাটা দেখবেন?'

করবী বলল, 'বার করুন।'

অরুণ মাসিক পত্রিকার পাতা উল্টে জায়গাটা খুলে করবীর সামনে রাখল।

করবী একবার চোখ বুলিয়ে দেখে বলল, 'ভালোই তো হয়েছে। বেশ ভালো হয়েছে।'

বয় দু'জনের সামনে দু' কাপ চা দিয়ে চলে গেল।
অরুণ বলল, 'আপনি মন খুলে কথা বলছেন না। আপনি ভেবেছেন আমি ইচ্ছা ক'রেই—'
করবী বলল, 'ছিঃ তা কেন ভাবতে যাব। আপনার মত উপকারী বন্ধু আমাদের নেই। আপনি ইচ্ছা ক'রে আমাকে আঘাত দেবেন একথা কি ভাবা যায়!'
অরুণ একটুকাল চুপ ক'রে থেকে বলল, 'কিন্তু এসব তো সংস্কার ছাড়া আর কিছু নয়।'
করবী বলল, 'কোন সব?'
অরুণ বলল, 'এই খাওয়া-ছোঁয়ার বিচার? স্মৃতির শ্রদ্ধা জানাবার এই বাহ্যিক অনুষ্ঠানই কি সব?'
করবী বলল, 'কিন্তু আমাদের সমাজের এই-ই রীতি। খাওয়া পরা সম্বন্ধে বিধবাদের কতকগুলি নিয়ম মেনে চলতে হয়।'
অরুণ বলল, 'চলতে যে হয় তা আপনিও জানেন আমিও জানি। কিন্তু কেন হয় সেইটাই প্রশ্ন। কই বিপত্নীক পুরুষদের বেলায় তো এসব কোন বিধান নেই, তাই বলে কি মৃত স্ত্রীকে তারা ভুলে যায়, না তার জন্যে তাদের কোন শোক দুঃখ বোধ হয় না?'
করবী কোন কথা বলল না।
অরুণ ফের বলতে লাগল, 'অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে তো এ ধরনের রীতি নিয়ম নেই, কিন্তু তাই ব'লে মৃত স্বামীর জন্যে তাদের দুঃখ কি কিছু কম?'
করবী আর্তস্বরে বলল, 'অরুণবাবু, এসব আলোচনা আজ থাক।'
করবী উঠে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু অরুণ তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'বসুন, আমাকে ভুল বুঝবেন না। আপনাকে উপলক্ষ্য ক'রেই কথাটা উঠল। আপনার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে কিছু বলা আমার উদ্দেশ্য ছিল না।'
করবী ফের অধীরভাবে বলল, 'এসব আলোচনা আজ থাক অরুণবাবু।'

খানিকক্ষণ কেউ আর কোন কথা বলল না। একটু বাদে দু'জনে গম্ভীর মুখে বেরিয়ে এল।
বাড়ির কাছকাছি আসতেই করবীর চোখে পড়ল কারা যেন তাদের সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে জোর গলায় কথা কাটাকাটি করছে। আরো একটু এগুতেই তাদের চিনতে পারল করবী। বাড়িওয়ালার সরকার শীতলবাবু আর দিলীপ। পায়ে চটি, গায়ে ফতুয়া, মাথায় টাক। বেঁটে খাট মোটাসোটা মাঝ বয়সী ভদ্রলোক।
শীতলবাবু বললেন, 'তোমাদের মতলবখানা কি বল। কেবল ঘোরাচ্ছ, আর ঘোরাচ্ছ। ভাড়াটা দেওয়ার ইচ্ছা আছে কি নেই সোজা ভাষায় বলে দিলেই হয়।'
দিলীপ বলল, 'দেখুন, যা বলবার ভদ্র ভাষায় বলুন। ভাড়া আপনারা কবে না পেয়েছেন। এই মাসেই যা একটু দেরি হয়েছে দিতে।'
শীতলবাবু বললেন, 'এমাস মানে এই দু' মাস হোল। তোমাদের সবইতো চলছে। স্কুল, কলেজ, বেড়ান-চেড়ান, আমোদ-স্ফূর্তি কোনটাইতো বন্ধ নেই। যত অভাব অনটন বুঝি এই ভাড়া যেওয়ার বেলায়?'
করবী এসে সামনে দাঁড়াল, 'কি হয়েছে শীতলবাবু। আসুন ভিতরে এসে বসুন। দিলীপ সদর দরজায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি তর্ক করছ। বাড়ির ভিতরে কি জায়গা ছিল না?'
তিরস্কৃত হয়ে দিলীপ বউদির দিকে তাকাল, তারপর একটু রুক্ষ কণ্ঠে বলল, 'ভিতরে আমি যেতে বলেছিলাম বউদি, উনিই রাজি হননি। তাছাড়া তুমি যে এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে, তাতো ভাবিনি। অনর্থক ওঁকে বসিয়ে রেখে লাভ কি হোত।'
তার সঙ্গে এমন উদ্ধত ভঙ্গিতে সাধারণত কথা বলে না দিলীপ। করবী বুঝতে পারল, যে কোন কারণেই হোক ও আজ ভারি চটেছে। দিলীপের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে শীতলবাবুর দিকে তাকিয়ে করবী বলল, 'আপনিই বা ছেলেমানুষের কাছে ভাড়ার কথা তুলতে

গেছেন কেন শীতলবাবু। যা বলবার আমাকে বললেই পারতেন।'

শীতলবাবু বললেন, 'আপনাকেই তো বলতে এসেছিলাম মা। কিন্তু ছোকরা সামনে এসে চ্যাটাং চ্যাটাং কথা আরম্ভ করল। দেখতে ছেলেমানুষ হ'লে কি হবে, ভিতরে পেকে গেছে।'

করবী প্রতিবাদ করে বলল, 'না, শীতলবাবু দিলীপ আমাদের তেমন ছেলে নয়।'

শীতলবাবু একটু হেসে বললেন, 'না হলেই ভালো মা। নিজের বাড়ির ছেলের কি কোন দোষ থাকে? থাকে না। সে যাকগে। আমি ভাড়ার জন্যে এসেছিলাম। আর তো দেরি করা যায় না। এর আগে দু'দিন এসে ঘুরে গিয়েছি। কর্তা বড় তাগিদ দিচ্ছেন। এমাস নিয়ে দু'মাস হোল।'

করবী গম্ভীর মুখে বলল, 'আচ্ছা, আপনি পরশু আসুন।'

শীতলবাবু বললেন, 'আবার পরশু? আচ্ছা। কিন্তু আর যেন কথার নড়চড় না হয়। তাহেল বড়ই অসুবিধেয় পড়ব মা।' শীতলবাবু বিদায় নিলেন।

করবী মুখ ভার করে বাড়ির ভিতরে ঢুকল।

আড়াল থেকে নিভাননী সব শুনছিলেন। তিনি বিরস ভঙ্গিতে বললেন, 'তোমাদেরই বা এ কোনধরনের গৃহস্থালী বাপু। বাড়ি ভাড়াটা আগে চুকিয়ে দিলেই হয়। দু'দিন দেরি হলে যারা রোজ তাগিদ দিতে আসে, তাদের টাকা ফেলে রেখে সাধ করে কেন অপমান কুড়োন। আমার আর কিচ্ছু ভালো লাগে না।'

শাশুড়ীর কথার জবাব না দিয়ে করবী ঘরের ভিতরে চলে গেল। সত্যি সব অব্যবস্থার জন্যে সেই তো দায়ী। বই ছাপানোর জন্যে শ' খানেক টাকা বেহিসেবী ব্যয় করে ফেলে এখন আর কিছুতেই কুলোতে পারছে না করবী। বড় ভুল হয়ে গেছে। বড় অবিবেচকের মত কাজ করে ফেলেছে করবী। সময় আর সুযোগ মত পরেশের বইখানা প্রকাশ করলেই হোত। তার পরিবারের লোকজনই যদি কষ্ট পেল, বাইরের

লোকের কাছে অপমানিত হোল, তা'হলে করবী নিজের দায়িত্ব পালন করল কি করে। স্বামীর বই নিজের চাকুরির টাকায় প্রকাশ করে যে আত্মপ্রসাদ কিছুদিন আগেও বোধ করেছিল করবী, এই মুহূর্তে তার চিহ্নমাত্র রইল না। বরং অবসাদ আর নৈরাশ্যে মন ভরে উঠল করবীর। কি করে চালাবে সংসার। সামান্য স্কুল মাস্টারীর টাকায় এদের সে বাঁচিয়ে রাখবে কি করে। মান-সম্মান নিয়ে কি করে বেঁচে থাকতে পারবে।

'বউদি তুমি রাগ করেছ?'

কখন দিলীপ এসে পাশে দাঁড়িয়েছে। করবী চমকে উঠে ওর দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাল তারপর শান্তভাবে বলল, 'না রাগের কি আছে?'

দিলীপ বলল, 'আমি তোমাকে বড় রূঢ় কথা বলেছি। শীতলবাবুর কথাগুলি আমার সহ্য হচ্ছিল না তাই—'

করবী সস্নেহে ওর পিঠে হাত রাখল, 'তা আমি জানি দিলীপ। তাতে কি হয়েছে। দোষ তো আমারই, দায় তো আমারই। তুমি যাও, মন স্থির করে পড়াশুনো করো গিয়ে।'

দিলীপ বলল, 'পড়াশুনোয় আমার কিছুতেই আর মন বসছে না বউদি। আমি ভেবেছি পড়া এখনকার মত বন্ধ রাখব।'

করবী অবাক হয়ে বলল, 'ছিঃ ওসব তুমি কি বলছ দিলীপ। বাড়িওয়ালার লোক দু' দিন এসে তাগিদ দিয়ে গেছে। এতেই তুমি এত বিচলিত হয়েছ! কিন্তু আরো কত দুঃখকষ্টের মধ্যে দিয়ে আমাদের চলতে হবে ভাই। ভয় করলে তো হবে না।'

দিলীপ বলল, 'দুঃখকষ্টকে মোটেই ভয় করছিনে বউদি। কিন্তু মেয়েছেলে হয়ে তুমি একা একা যে কষ্ট করছ, দিনরাত সংসারের জন্যে এত খাটছ, তা আমি সইতে পারছিনে।'

শীতলবাবু নেহাৎ মিথ্যা বলেননি। বয়সের তুলনায় দিলীপ সত্যিই যেন একটু ভারিক্কি হয়ে পড়েছে। করবী ওর কথার ভঙ্গিতে একটু হাসল, 'মেয়েছেলে হয়ে একা খাটছি বলে পুরুষ ছেলের বুঝি মানহানি

হয়েছে। ঈস কত বড় পুরুষ মানুষ তুমি।'

দিলীপ লজ্জিত হয়ে বলল, 'না, তা নয়। কিন্তু আমি যদি কাজকর্ম করে তিরিশ চল্লিশ টাকাও এনে দিতে পারি, তোমার তো কিছু সাহায্য হয়। লক্ষ্মী স্টোর্সের সুধাংশুবাবু বলছিলেন, আমি যদি চাই, সেলসম্যানের কাজ দিতে পারেন আমাকে। তাঁদের একজন অল্পবয়সী সেলসম্যান নাকি দরকার।'

করবী কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। এই চোদ্দ পনের বছরের ছেলেটি এত কথাও ভাবছে। এর মধ্যে পড়া ছেড়ে দিয়ে চাকরি করবার চিন্তা করছে ও। হঠাৎ অসীম মমতায় মন ভরে উঠল করবীর। এদের জন্যে সে আরো খাটবে, আরো কষ্ট করবে। সকাল বেলায় আরো একটা কি দুটো টিউশানি জুটিয়ে নেবে। চেষ্টা করবে বেশি মাইনের চাকরিতে ঢুকতে, তবু কিছুতেই ওদের কষ্ট দেবে না।

দিলীপ আবার বলল, 'তুমি কি রাগ করলে বউদি?'

করবী বলল, 'হ্যাঁ রাগ করেছি। তুমি যত বাজে কথা বলবে, বাজে চিন্তা করবে আর আমি রাগ করব না?'

দিলীপ কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে রইল। করবী বলতে লাগল, 'ওসব ভাবনা তুমি ছেড়ে দাও। কারো কথায় কান দিয়ো না, যত কষ্টই হোক তোমাকে পড়তেই হবে। তোমার দাদার মত এম এ পাশ করতে হবে তোমাকে, তুমি মানুষ হলে তবেই তো আমাদের আশা-ভরসা, তুমি মানুষ হলে তবেই তো পিপলুকে মানুষ করার চেষ্টা করবে। আমি যে তোমার মুখ চেয়েই বসে আছি ভাই।'

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে রইল। পরস্পরের মধ্যে সেই নিবিড় অন্তরঙ্গতা যেন আবার ফিরে এসেছে।

কিছুদিন যাবৎ দিলীপের মনে ভারি একটা অভিমান জন্মেছিল। বউদি যেন বড় বেশি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। বই বই করে এমন মেতেছে যে আর কোন দিকে আর কারো দিকে তার লক্ষ্য করবার অবসর মাত্র নেই। অবশ্য বই তার দাদারই। কিন্তু অরুণবাবুর

এমন ভাব, যেন তার সবটুকু কৃতিত্ব তার। তার দাদা বইখানার একজন মৃত লেখক ছাড়া কিছু নয়। মনে মনে ভারি অপ্রসন্ন হয়ে উঠেছিল দিলীপ। ইদানীং কেন যেন অরুণকে তার আর তেমন সহ্য হয় না, ভালো লাগে না বউদির সঙ্গে তার অতখানি ঘনিষ্ঠতা, অত অন্তরঙ্গতা। এই নিয়ে পাড়ার বকাটে ছেলেদের এক-আধটু ঠাট্টা তামাসাও কানে গেছে দিলীপের। দিলীপ অবশ্য তাদের ধমকে দিয়েছে, তাদের কথা মোটেই কানে তোলেনি। তবু তো বউদির একটু সাবধানে থাকা উচিত। দিলীপ ক'দিনই ভেবেছে, বউদিকে কথাটা বলবে। কিন্তু বলি বলি করেও বলতে পারেনি। অদ্ভুত এক সঙ্কোচ বোধ করেছে। ছিঃ ওকথা কি বলা যায়। বউদি হয়ত মনে দুঃখ পাবেন। ভাববেন, পাড়ার বাজে ছেলেদের সঙ্গে মিশে দিলীপও বকাটে হয়ে গেছে। না, ও কথা সে বলতে পারবে না মরে গেলেও না। হঠাৎ দিলীপের মনে পড়ল পরশু দিন শীতলবাবুকে বাড়ি ভাড়া দেওয়ার কথা বলেছে বউদি। কিন্তু কি করে দেবে?

একটু ইতস্তত করে কথাটা সে স্পষ্ট জিজ্ঞেসই করে বসল, 'সোমবার তুমি কি করে টাকা দেবে বউদি? অত টাকা পাবে কোথায়?'

করবী বলল, 'সে তোমাকে ভাবতে হবে না। ধার-টার করে কোন রকমে চালিয়ে দিতেই হবে।'

দিলীপ বলল, 'কার কাছ থেকে ধার করবে?'

করবী বলল, দেখি ভেবে।'

দিলীপ হঠাৎ বলে বসল, 'আর যাই করো, অরুণদার কাছে ধার চেয়ো না।'

করবী চমকে উঠে দিলীপের মুখের দিকে তাকাল, 'কেন দিলীপ, ও কথা বলছ কেন। তাঁর কাছে ধার চাইলেই বা দোষ কি।'

দিলীপ বলল, না দোষ কিছু নেই। তবে তিনি তো বাইরের লোক।'

করবী বলল, 'ধার তো আমাদের বাইরের লোকের কাছেই চাইতে হবে। ভিতরের লোক আর কোথায় পাব। অরুণবাবু আমাদের পরিবারের

বন্ধু। অনেক সময় অনেক উপকার করেছেন। তাঁকে অশ্রদ্ধা করা আমাদের কারোরই উচিত নয় দিলীপ।'
দিলীপ বলল, 'অশ্রদ্ধা আমি করিনি বউদি। অমনিই বলছিলাম। যাই পড়ি গিয়ে। কালকের অনেক পড়া বাকি আছে।'
বলে দিলীপ আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

সম্বন্ধটা বৈদ্যনাথই উপস্থিত করলেন। তাঁর অফিসের সহকর্মী বিপিন সরকারের ছেলে। বি এ পাশ করেছে। ফুড ডিপার্টমেণ্টে চাকরি করে। এ্যালাউন্স ট্যালাউন্স মিলিয়ে শ' দেড়েক টাকার মত পায়। ছেলেটিকে দেখেছেন বৈদ্যনাথ। কথায় বার্তায় বেশ চটপটে চালাক চতুর। এমন ছেলে জীবনে উন্নতি না ক'রেই পারে না। আজকালকার ছেলেদের তো স্বাস্থ্যের দিকে তেমন লক্ষ্য নেই। মেয়েদের মত সাজগোজ পোশাক-আশাক নিয়েই ব্যস্ত। কিন্তু বিপিনবাবুর ছেলে রণজিৎ তেমন নয়। স্বাস্থ্য তার ভালোই। স্কুল কলেজে পড়বার সময় ব্যায়াম ট্যায়াম করত। মাথার ওপর মা বাপ আছে, দাদা বউদি আছে। পাঁচজনের সংসার। বড়লোক না হলেও খাওয়াপরার কোন কষ্ট নেই। এর চেয়ে ভালো সম্বন্ধ আর কি হতে পারে?

রান্নাঘরে বঁটি পেতে তরকারি কুটছিলেন বৈদ্যনাথ। পরনে নীল রঙের লুঙ্গি। এই মাত্র বাজার সেরে এসেছেন। কিন্তু বাজার ক'রে দিয়েই ক্ষান্ত হয় না বৈদ্যনাথ। কোন বেলা কি রান্না হবে, কিসে কোন তরকারি খাটাতে হবে স্ত্রীকে তাও নির্দেশ দেন। ইদানীং বৈদ্যনাথের কাজ আরও বেড়েছে। একদিন বাজার থেকে তিনপো আলু আর আধ সের পটল এনেছিলেন, আর আনা চারেকের পুঁই শাক। মাছের বেশি দর বলে মাছ আনেননি। কনকলতা তো বাজার দেখে রেগেই আগুন। 'এ বাজারে এতগুলি লোকের দু'বেলা কি করে পোষাবে। তুমি রাঁধো-বাড় এসে, আমি চললুম ঘর ছেড়ে।'

বৈদ্যনাথ বললেন, 'দেখ মাছ তরকারি কোটা আর রাঁধার ওপর সব নির্ভর করে। তা জানলে এ তো ভালো, এর অর্ধেক জিনিসেও সবাইকে পুষিয়ে দেওয়া যায়। তুমি যেভাবে মাছ কোট, যেরকম পোয়াটাক পরিমাণ খণ্ড করো একেকখানা, তাতে তিন সের মাছেও কুলোক না। আবার তেমনভাবে দিতে থুতে জানলে তিনপো'তেও কুলিয়ে দেওয়া যায়।'

কনকলতা রাগ ক'রে বলেছিলেন, 'বেশ, এর পর থেকে তুমিই কুটে-টুটে দিয়ো। রান্নাবাড়া দেওয়া-থোওয়া তুমিই করো এসে। আমি কিন্তু পারব না।'

বৈদ্যনাথ বললেন, 'উ'হু পারব না বললে তো আর সংসার চলে না। আমি যেভাবে দেখিয়ে শুনিয়ে দেব, আমি যেভাবে ডাইরেকশন দেব, সেইভাবে চলতে হবে।'

তারপর থেকে বঁটি নিয়ে তরকারি কুটতে বসে গেলেন বৈদ্যনাথ, শুধু হিসেব করে বাজার করাটাই এখনকার দিনে কোন কাজের কথা নয়, রান্নাবাড়ার সময়েও যদি হিসেবটা না রক্ষা ক'রে চলা যায় তাহলে সংসারে আয় দেয় না। এর আগে বলে বলে হয়রান হয়েছেন বৈদ্যনাথ, কনকলতা তাঁর পরামর্শকে কাজে লাগাতে পারেননি। তাই হাতে কলমে স্ত্রীকে বৈদ্যনাথ দিনকয়েক দেখিয়ে দিতে লাগলেন।

ছেলেকে বঁটিতে তরকারি কুটতে দেখে ভুবনময়ী এসে বললেন, 'ও বৈদ্য, তরকারি আমি কুটে দিচ্ছি, তুই ওঠ। শেষে হাত কেটে মরবি।'

বৈদ্যনাথ বললেন, 'কিচ্ছু হবে না মা, তুমি ওখানে চুপ করে বসে থাক, পারি কি না পারি দেখ।'

ভুবনময়ী বললেন, 'কিন্তু তোর এসব পারার দরকারই বা কি। বউ রয়েছে, মেয়েরা রয়েছে, আমিও তো সাধ্যমত যা করবার করছি। বাড়িতে তরকারি কুটবার লোকের অভাব আছে নাকি, তুই তোর কাজে যা।'

বৈদ্যনাথ বিরক্ত হয়ে বললেন, 'এও একটা কাজ মা। আজকালকার দিনে কিভাবে সংসার চালাতে হয়, তা তোমাদের সবারই শেখা দরকার। আয়টা সংসারে সবাই করতে পারে না, কিন্তু ব্যয়টা সবাই যদি বুঝে শুনে করে তাহলে তার কাছ থেকেও প্রায় earning member-এর সাহায্যই পাওয়া যায়। তোমাদের সেই আগেকার আমল আর নেই। যত খুশি আনছ নিচ্ছ, ঢালছ খাচ্ছ। তা নেই এখন। যদি বাঁচতে হয় সবাইকে পা টিপে টিপে হিসেব করে চলতে হবে। না হলে পদস্খলন কেউ আটকাতে পারবে না।'
শুধু মুখের বক্তৃতাতেই নয়, নিজের পছন্দমত নিজের হিসেব মত মাছ তরকারি কুটে বৈদ্যনাথ দেখিয়ে দিলেন, তিনি সব পারেন। মেয়েলি কাজেও তাঁর সমান নৈপুণ্য আছে। কিন্তু স্বামীর এই নৈপুণ্যে কনকলতা যে তেমন খুশি হন তা নয়। প্রায়ই বলেন, 'আমার হাতের কাজ যদি তোমার পছন্দ না হয়, তাহ'লে আমাকে বিদায় করে দাও। এসব কি কাণ্ড। মেয়েদের কাজে যদি পুরুষে হাত বাড়াতে আসে সব সময়, তাহ'লে কি ভালো লাগে?'
বাসন্তী হেসে বলেন, 'আহা অমন করো কেন বউদি, ভালো বুঝে তোমার সাহায্য করতে আসে। আর তুমি কিনা—'

কনকলতা মুখ ঘুরিয়ে বলেন, 'কাজ নেই আমার অমন সাহায্যে। জ্বালায় জ্বালায় একেবারে অস্থির হয়ে গেলুম ঠাকুরঝি, আমার হাতের তরকারি কোটা পছন্দ হবে না, জামায় বোতাম লাগানো পছন্দ হবে না, বিছানা পাতা পছন্দ হবে না। সব নিজের হাতে করবেন তবে হবে। মেয়েদের কাজ এতই যদি অপছন্দ তবে আর বিয়ে করার দরকার ছিল কি। ঘোমটা দিয়ে নিজেই নিজের বউ সেজে থাকলেই হোত। সেই যে সং দেখেছিলাম, একটি লোকের এক অঙ্গ পুরুষ আর এক অঙ্গ মেয়ে, তোমার দাদাটিও তাই। উনি একাই তোমার দাদা আর বউদি। এ সংসারে আমার আর কোন দরকার নেই।'

বাসন্তী হাসতে থাকেন। হাসতে হাসতে বলেন, 'তুমি এই কথা বলছ আর আমার ভাগ্য একেবারে উল্টো। মাথা কুটে মরলেও ওকে দিয়ে সংসারের কোন কাজ হয় না। না পুরুষের কাজ, না মেয়েদের কাজ। কিছুতেই হাত দেবেন না। একেবারে নিষ্কর্মার গোঁসাই ঠাকুর। কেবল মাইনের টাকাটি এনে দিয়েই খালাস।'

কনকলতা বললেন, 'নিষ্কর্মা তো তুমি বানিয়েছ। তুমি অবনীবাবুকে কিছু করতে দাও যে তিনি কিছু করবেন? সেদিক থেকে তুমিও অর্ধনারীশ্বর। তোমাদের ভাইবোনের মধ্যে বেশ স্বভাবের মিল আছে। আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, তোমরা যদি ভাইবোন না হ'তে, তোমরা যদি—'

বাসন্তী ধমক দেন, 'কি যা তা শুরু করেছ। তোমার মুখ তো নয়—'

কনকলতা মুখ টিপে হাসেন।

বাসন্তী মনে মনে ভাবেন, এর চেয়েও তো বেশি মিল ছিল তাঁর দাদার সঙ্গে। শুধু স্বভাবের মিল নয়, মনের মিল, অন্তরের মিল, ভাবের মিল। সে মিল কোথায় মিলিয়ে গেল। দু'জনে এত কাছাকাছি আছেন, নিত্য দেখা সাক্ষাৎ হচ্ছে, তবু যেন মনে হয়, কত দূরের মানুষ। যেন নিজের দাদা নয়, সম্পূর্ণ পর, ভাড়াটে বাড়ির আলাদা একঘর ভাড়াটে মাত্র। একেক সময় পরের চেয়েও নিষ্ঠুর ব্যবহার করে দাদা। সামান্য কারণে কথা বন্ধ ক'রে থাকে। পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেও মুখ তুলে তাকায় না, যেন কারো সঙ্গে কারো চেনা-পরিচয়টুকুও নেই।

কিন্তু প্রীতির সম্বন্ধ উপলক্ষ্য ক'রে বৈদ্যনাথ আবার যেন বোনের কাছে এসেছেন। ঠিক আগের মতই অন্তরঙ্গ ধরনে কথাবার্তা শুরু করেছেন। এই ছেলেটির কথা বৈদ্যনাথ আগেও বাসন্তীকে দু' একদিন বলেছেন। আজও সেই প্রসঙ্গ তুলে ছেলেটির স্বভাব চরিত্র আর বাড়ি-ঘরের অবস্থার কথা বর্ণনা ক'রে বাসন্তীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বিপিনবাবু তো আমাকে অস্থির ক'রে তুলল বাসি, তাঁকে

কি বলি বল তো। আমার মুখে মেয়ের রূপের প্রশংসা শুনে তিনি তো রোজই প্রীতিকে দেখতে আসতে চান। একটি সুন্দরী বউ ঘরে নিতে তাঁর ভারি সাধ। মেয়ে দেখে যদি পছন্দ হয়—পছন্দ হবেই, প্রীতিকে যে দেখবে সেই পছন্দ করবে, তাহলে দেনাপাওনার ব্যাপারে তেমন কিছু আটকাবে না, বিপিনবাবু সে ইঙ্গিতও দিলেন।'

বাসন্তী চালের ভিতর থেকে কাঁকরগুলি বেছে ফেলতে ফেলতে বললেন, 'ওসব কথা আমাকে বলা কেন দাদা। যাদের মেয়ে, যারা বিয়ে দেওয়ার কর্তা তাদেরই কোন গা নেই, গরজ নেই। ওসব শুনে আমি কি করব?'

ভুবনময়ী কাছেই বসেছিলেন। তিনি রাগ করে ধমক দিয়ে উঠলেন, মুখ বিকৃত করে বললেন, 'আমি কি করব, ঢঙের কথা তুই আর বলিসনে বাসি, শুনলে আমার গা জ্বালা করে। তোদের ভাব চরিত্তির দেখলে তোদের সঙ্গে আমার আর কথা বলতে ইচ্ছে করে না। কেন তুই বা শুনবি না কেন। তোর কি পেটের মেয়ে নয়? সে সুখে থাকলে তুই সুখে থাকবি নে? না কি কোন নিন্দামন্দ হলে, একজন এক কথা বলে বসলে তোর বুকে বাজবে না? তবে? অবনীকে তুই বলেছিলি?'

বাসন্তী বললেন, 'বলেছিলাম।'

ভুবনময়ী জিজ্ঞেস করলেন, 'কি বলল?'

বাসন্তী বললেন, 'নতুন আর কি বলবে। সেই একই কথা। আমার হাতে এখন টাকা নেই। মেয়ের বিয়ে কি করে দেব?'

ভুবনময়ী বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তার হাতে কবেই বা টাকা হোল। মেয়ের বিয়ের কথা তুললেই তো তার হাতে টাকা থাকে না। এদিকে দান-ধ্যানের বেলায় তো টাকার অভাব হয় না। অমুক বউদি, তমুক বন্ধুকে মাসের মাস সাহায্য তো লেগেই আছে। বাড়ির লোকে খেতে পাক আর না পাক, অসুখ-বিসুখে পরিবারের চিকিৎসা হোক আর না হোক তার পুণ্য বজায় থাকলেই হোল। তাহলেই সংসারের

লোক সব তরে যাবে। কিন্তু টাকা নেই বলে তো আর মেয়ের বয়স অপেক্ষা ক'রে থাকবে না। এখনই তো বিয়ের বয়স পার হয়ে গেছে। এই ফালগুনে উনিশ গেল না?'

বাসন্তী বললেন, 'না মা, এই উনিশে পড়ল।'

ভুবনময়ী হাসলেন। তাঁর কাছেও মেয়ের বয়স চুরি করছে বাসন্তী। প্রীতির বয়স উনিশ নয় ঠিক কুড়ি। বৈদ্যের ছেলে বিজু হোল আষাঢ়ে, তার পরের ফালগুনে হোল প্রীতি। প্রত্যেকটি নাতিনাতনীর বয়স ঠিক আছে ভুবনময়ীর। ঠিক আছে ওদের জন্মবার। বয়সের হিসেব ওদের মা-বাবার ভুল হ'তে পারে, কিন্তু তাঁর ভুল হয় না।

ভুবনময়ী বললেন, 'উনিশই হোক, কুড়িই হোক, বিয়ের বয়স তো আর বসে থাকছে না। তুই অবনীকে ভালো করে বল। এ সম্বন্ধ বিনা চেষ্টায় হাতছাড়া করা উচিত নয়। অবশ্য প্রজাপতির নির্বন্ধ যেখানে আছে সেখানে হবেই। জন্ম মৃত্যু বিয়ে বিধাতাকে নিয়ে। মানুষের হাতে সব নয়। তবু চেষ্টা চরিত্র বাপ মাকে না করলে কি চলে? তুই বল অবনীকে।'

বাসন্তী বললেন, 'আমি বলে বলে হার মেনেছি মা। আমি বলতে গেলেই ঝগড়া লাগবে। রোজ একবার ক'রে প্রীতিকে নিয়ে ঝগড়া হয়, আর একবার অতুলকে নিয়ে। জামাই তো তোমার খুব বাধ্য। তুমি দেখ না বলে কয়ে।'

ভুবনময়ীই বলবার ভার নিলেন। আফিসে যাওয়ার আগে অবনী যখন খেতে নামলেন নিচে, নিজের ঘর থেকে বাটিতে করে খানিকটা নিরামিষ তরকারি এনে জামাইর পাতের সামনে এগিয়ে দিয়ে এক পাশে একটু সরে বসলেন ভুবনময়ী।

অবনী মৃদু হেসে নিজের মনে খেয়ে যেতে লাগলেন।

ভুবনময়ী বললেন, 'কেমন হয়েছে রান্না?'

অবনীমোহন মুখ তুলে তাকালেন একবার শাশুড়ীর দিকে, চেয়ে বললেন, 'ভালো।'

ভুবনময়ী বললেন, 'তবু ভালো যে তোমার মুখের একটু কথা শুনলুম। কিছু জিজ্ঞেস না করলে আজকাল আর কোন কথা বল না। সপ্তাহের সাতদিনই যেন মৌনব্রত নিয়ে বসে আছ। দিনরাত এত কি ভাব বল দেখি।'

খেতে খেতে একটু হাসলেন অবনীমোহন, মৃদুস্বরে বললেন, 'কই কিছু ভাবিনে তো।'

ভুবনময়ী বললেন, 'আমার তো মনে হয় দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই তুমি কিছু না কিছু ভাবছ। আগে আগে অফিস থেকে ফিরে একবার ক'রে আমাদের ঘরে যেতে, কথাবার্তা বলতে। আজকাল আর সে সব কিছু নেই।'

একটু যেন নিঃশ্বাস ছাড়লেন ভুবনময়ী।

অবনীমোহন একটু কৈফিয়তের ভঙ্গিতে বললেন, 'আপনি ব্যস্ত থাকেন—'

ভুবনময়ী বললেন, 'ব্যস্ত থাকলেই বা কি। মানুষ মানুষের খোঁজ-খবর নেয় না?'

অবনীমোহন কোন জবাব দিলেন না।

ভুবনময়ী এবার আসল কথায় এলেন, বৈদ্য তো প্রীতির এক সম্বন্ধ এনে হাজির করেছে, শুনেছ নাকি কিছু?'

অবনীমোহন বললেন, 'শুনেছি।'

ভুবনময়ী বললেন, 'তাদের নাকি খুবই গরজ। আমি বলি কি, একটা দিনটিন ঠিক করে, তারা এসে দেখে যাক।'

অবনীমোহন বললেন, 'কিন্তু শুধু দেখে গেলেই তো হবে না। আমরা এদিকে তৈরী হতে পারছি কই। মৃগাঙ্কের আবার চাকরি গেল। সংসারের এই খরচ। চালিয়ে রাখাই কঠিন।'

ভুবনময়ী বললেন, 'কঠিন ছাড়া তোমার মুখে সহজ কথাটা কোনদিন আর শুনলাম বাপু। কিন্তু সহজই হোক, কঠিনই হোক সংসারে যা কর্তব্য তাতো করতেই হবে। আর মৃগাঙ্কের চাকরির কথা বলছ,

ওর তো বছরের মধ্যে দু'বার চাকরি হয়, দু'বার যায়। তার চাকরি-বাকরির সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ের সম্পর্ক কি। তারা কি কেউ কোন ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায়, না ঘামাবে?'

অবনীমোহন ফের শাশুড়ীর দিকে তাকালেন। শ্বশুরবাড়ির কেউ তাঁর ভাইদের সম্বন্ধে কোনরকম আলোচনা সমালোচনা করুক, তা তিনি পছন্দ করেন না। আজকের আলোচনাও যে তাঁর মনঃপূত হচ্ছে না, সেকথা তিনি শুধু তাকাবার ভঙ্গিতেই বুঝিয়ে দিলেন।

ভুবনময়ী জামাইর ভঙ্গি দেখে বেশ একটু ক্ষুণ্ণ হলেন। এতকাল একসঙ্গে এক জায়গায় আছেন, তবু অবনীর এই পর পর ভাবটা গেল না। ওদের সংসারের কোন ব্যাপার সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে অবনীর কাছ থেকে কোনদিন কোন উৎসাহ পাওয়া যায় না। অথচ এক জায়গায় থাকতে গেলেই কথা আসে। চোখের ওপর অন্যরকম ভাব-চরিত্র দেখলেই লোকে তা বলে। কিন্তু অবনী তা চায় না। বেশ না চায় না চাইল। নিজের পরিণাম নিজেই একদিন টের পাবে। নেহাৎই মেয়েটা চোখের সামনে রয়েছে, তাই তার ভালো-মন্দের কথা না ভেবে পারেন না ভুবনময়ী, নইলে কে যেত অন্যের সংসারের কথার মধ্যে থাকতে।

একটু চুপ করে থেকে ভুবনময়ী বললেন, 'সেকথা যাক, তোমার ভাই চাকরি করুক আর নাই করুক, তোমাদের সংসারের জন্যে কেউ ভাবুক আর নাই ভাবুক, তা আমার বলতে যাবার কি দরকার। তবে যেটুকু বলা কর্তব্য মনে করলাম বললাম। এখন তোমার যা ইচ্ছা, তাই কর।'

বলে বেশ একটু রাগ করেই উঠে গেলেন ভুবনময়ী। আস্তে আস্তে খাওয়া শেষ করে অবনীমোহনও উঠে পড়লেন। তাঁর মনে হোল শাশুড়ীর সঙ্গে ব্যবহারে সৌজন্যের হানি ঘটেছে। মুখে কিছু বলেন নি বটে, কিন্তু ভঙ্গিতে রূঢ়তা ফুটে উঠেছে। একটু যেন লজ্জিত হলেন অবনীমোহন। মুখ ধুয়ে ওপরে উঠে যাওয়ার আগে

শাশুড়ীর ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। ভুবনময়ী ফের রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। অবনীমোহন একটুকাল দাঁড়িয়ে থেকে বললেন, তা পাত্রপক্ষের কি রকম দাবী-দাওয়া সে কথা কিছু বললেন বৈদ্যবাবু।'

ভুবনময়ীর রাগ পড়ে নি। তিনি বললেন, 'কি জানি বাপু, বৈদ্য তো বাড়িতেই আছে, যা শুনবার তার কাছেই শোন গিয়ে।'

অবনীমোহন ফিরে যাচ্ছিলেন, ভুবনময়ী ফের কথা শুরু করলেন, 'শুনেছি তো দাবী-দাওয়া তাদের কিছু নেই। পণ-টন কিছু দিতে হবে না; তবে ছেলের বিয়েয় তো ঘরের টাকা কেউ খরচ করে না, বাড়ি-খরচটা মেয়েপক্ষকেই বহন করতে হয়।'

অবনীমোহন একটু হাসলেন, 'তারপর গয়নাগাঁটি, ভোজনপাত্র, যা নিয়ম আছে সবই—'

ভুবনময়ী বললেন, 'হাঁ, নিয়মমত সবই করতে হবে। আর পাঁচজনে যা করে, তুমিও তাই করবে। এমন তো নয়, তুমি দুনিয়ায় প্রথম মেয়ের বিয়ে দিতে যাচ্ছ।'

অবনীমোহন আর দাঁড়ালেন না, তাঁর অফিসের বেলা হয়ে গেছে। অফিসে গিয়ে কাজের ফাঁকে ফাঁকে খানিকক্ষণ কি চিন্তা করলেন। ধার নিয়ে নিয়ে প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের জমানো টাকাটা তলায় এসে ঠেকেছে। আর সেখান থেকে তুলবার কিছু নেই। আড়াই হাজার টাকার একটি ইন্সিওরেন্সের পলিসি অবশ্য সামনের মাসে ম্যাচিওর করবে। কিন্তু সে টাকায় কি সব খরচ পোষাবে। তা ছাড়া ওই টাকার সবই যদি মেয়ের বিয়েয় খরচ করে বসেন, তাহলেই বা চলবে কি করে। অনেক দেনা ওই টাকায় শোধ করবার কথা ভেবেছেন অবনীমোহন। কিন্তু শোধ করা আর হয়ে উঠছে কই। বছরের পর বছর সুদসমেত ঋণের পরিমাণ বেড়েই চলছে। দেশের ভূ-সম্পত্তি যা আছে, তা ব্যবসায়ী মহাজনের কাছে বন্ধক পড়েছে। বাকি অংশের খাজনা অল্পস্বল্প যা আদায় হয়, তা সেখানকার জ্ঞাতিরাই

ভোগ করেন। এখানকার ভরসা শুধু চাকরি। অবনীমোহনের মাইনের অঙ্কটা শুনতে মন্দ শোনায় না। সব মিলিয়ে সাড়ে চারশ' পাচ্ছেন আজকাল। কিন্তু পেলে কি হবে। মাসের অর্ধেক কাটতে না কাটতে সব নিঃশেষিত হয়ে যায়। নিজের হাতখরচ আর অন্য সব খরচ রেখে মৃগাঙ্ক যা দেয়, তাতে মাসের বাকি দিনগুলি কুলোতে চায় না। ভারি টানাটানি পড়ে, অশান্তি আর খিটিমিটির মাত্রা বেড়ে ওঠে। পরের মাসের মাইনে না পাওয়া পর্যন্ত সেই খিটিমিটির আর জের মেটে না, তবু এমনি করেই মাসের পর মাস কেটে যাচ্ছে। আর শিগগির যে এ অবস্থা পাল্টাবে, তেমন কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। নিজের মনেই চিন্তা করতে থাকেন অবনী-মোহন। তবু এরই মধ্যে ছেলেদের পড়াশুনো আর মেয়েদের বিয়ের ব্যবস্থাটাও সঙ্গে সঙ্গে করে ফেলতে হবে। সেগুলিও গার্হস্থ্য কর্তব্য। সংসারের এই আর্থিক অবস্থায় সে কর্তব্য যত অসাধ্য বলেই মনে হোক, সেগুলিও বাদ রাখলে চলবে না। ফেলে রাখতে অবনীমোহন চানও নি; কিন্তু প্রত্যেক মাসে জমার তুলনায় খরচের অঙ্কটা ভারি হওয়ায় মেয়ের বিয়ের কথা ভাবতেই সাহস পান নি অবনীমোহন। এমনি করে করে বছরের পর বছর কেটে গেছে। প্রীতির বয়সটা হঠাৎ যেন আবার নতুন করে হিসেব করলেন অবনীমোহন। বয়সটা ওর একটু বেশিই হয়েছে বটে। নিজে যখন বিয়ে করেছিলেন স্ত্রীর বয়স ছিল চোদ্দ। কিন্তু সে আমল আর নেই। এখন একটু বেশি বয়সেই বিয়ে হয় ছেলেমেয়েদের। তবু অবনীমোহনের মতে সতের-আঠারোর মধ্যেই বাঙালী মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাওয়া উচিত, তার ওদিকে যাওয়াটা সঙ্গত নয়। কিন্তু সাধ্যের সঙ্গে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে নিজের রুচি আর মতামতের খাপ খাইয়ে নিতে পারেন কই অবনীমোহন। সংসারের আরো পাঁচজনের ভাবনা ভেবে আরো পাঁচরকম বিবেচনা করে নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সাধ-আহ্লাদকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়।

একান্নবর্তী পরিবারের তাই রীতি। নিজের বাবার কাছে এই শিক্ষাই পেয়েছেন অবনীমোহন, গাঁয়ের বাড়িতে তিনি ছিলেন আরও বড় একটি পরিবারের কর্তা। সবাইকে শাসন যেমন করতেন, স্নেহও করতেন তেমনি। অবনীমোহনের মধ্যে তাঁর বাবা অভয়চরণের সেই শৌর্য নেই, সেই প্রতাপ নেই, পৌরুষ আর কাঠিন্যের ভাগটাও কম। কিন্তু আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সবাই বলে পৈতৃক গুণের যেটুকু পাবার ভাইয়ের তুলনায় অবনীই বেশি পেয়েছেন। অবনীমোহন জানেন, বাপের অনেক কিছুই তিনি পান নি। বাবা থাকতেই জমিদারী বিষয়সম্পত্তি যেমন আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে, তেমনি অনায়ত্ত রয়ে গেছে তাঁর খ্যাতি, যশ, ব্যক্তিত্ব। একজন তো আর এক-জনের সব কিছু পায় না, একজন তো আর একজনের সম্পূর্ণ প্রোটোটাইপ হতে পারে না, অবনীমোহনও পারেন নি। আগে আগে সেজন্য দুঃখ হোত, এখন আর হয় না। আজকাল নিজের ক্ষমতার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন, নিজের সাধ্যের সীমার মধ্যে গুটিয়ে নিয়েছেন নিজেকে। তাছাড়া সেই আগেকার আমল তো আর নেই। গাঁয়ের জমিদারি গেছে, দেশের সঙ্গে, মাটির সঙ্গে প্রায় কোন সম্পর্কই আর নেই। এখন ভাড়াটে বাড়ির বাসিন্দা, এখন সব গৌরব, সব প্রভুত্ব এসে ঠেকেছে নিজেদের এই একান্নবর্তী সংসারের কর্তৃত্বে, আর অফিসের একটি ছোট ডিপার্টমেন্টের কয়েকজন কেরানীর অধিনায়কত্বে। তবু অবনীমোহন পণ করেছেন এই ছোট্ট গণ্ডীর মধ্যে নিজের হৃদয়কে ছোট হতে দেবেন না, নিজের ধর্মকে খাটো করবেন না। সুদিনে দুর্দিনে এই একই লক্ষ্য আঁকড়ে রেখেছেন অবনীমোহন। ঘরের দেয়ালে টাঙানো অভয়চরণের বড় একখানা অয়েলপেণ্টিংএর নিচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কতদিন মনে মনে প্রার্থনা করেছেন, 'বাবা, আমি আপনার মত হতে পারলাম না, কিন্তু আশীর্বাদ করুন যেন নিজের মত হতে পারি।'

অফিস থেকে ফিরে আজও একবার বাবার সেই প্রতিকৃতির দিকে

তাকালেন অবনীমোহন। তারপর চাদরটা রেখে দিয়ে আলনার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খদ্দরের জামার বোতাম খুলতে লাগলেন।
একটু বাদে বাসন্তী এসে পাশে দাঁড়ালেন, বললেন, 'আজ যে বড় সকাল সকাল ফিরলে। হঠাৎ এমন সুমতি যে।'
পশ্চিমের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালেন অবনীমোহন। দিনের আলো প্রায় শেষ হয়েছে। কিন্তু একেবারে মিলিয়ে যায় নি। সামনের বাড়ির বারান্দায় সারি সারি সাজানো কয়েকটি ফুলের টব। প্রত্যেকটি টবে রঙ-বেরঙের বিদেশী সীজন ফ্লাওয়ার। একটি গাছ ফুলের ভারে একেবারে নুয়ে পড়েছে।
সেদিকে তাকিয়ে হঠাৎ অবনীমোহন বলে উঠলেন, 'সুরেনবাবুর সত্যিই ফুলের খুব শখ আছে।'
বাসন্তী বললেন, 'আছেই তো। সবাই তো আর তোমার মত নয়। আমাদের ছাদেও তো দাদা কয়েকটা ফুলের টব এনেছেন। রজনীগন্ধাটা ক'দিন ধরে বেশ ফুটছে। লক্ষ্য করেছ?'
অবনীমোহন স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'করেছি।' তারপর হঠাৎ বললেন, 'শোন, প্রীতির বিয়েটা এবার দিয়েই দেওয়া যাক। বাড়িতে অনেকদিন কোন আমোদ-আহ্লাদ হয় না। জীবনটা যেন একেবারে শুকনো হয়ে গেছে।'
বাসন্তী স্বামীর কাছে আরও একটু এগিয়ে এসে বললেন, 'তোমার মুখে আমোদ আহ্লাদের কথা। এ যে ভূতের মুখে রাম নাম। সত্যি, তোমার তাহলে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার মত আছে?'
শেষের কথাটায় ঠাট্টার সুর আর রইল না বাসন্তীর। তার কণ্ঠেও বেশ একটু আনন্দের আমেজ লাগল। বললেন, 'তুমি কিছু ভেব না, আমার গায়ের গয়না তো কিছু আছে। তাই ভেঙে নতুন গয়না ওকে গড়িয়ে দেব। আর নগদ টাকা সে একরকম করে কুলিয়ে নেওয়া যাবে। না হয় আরও কিছু ধার হবে তোমার। তার জন্যে মেয়েটা কি আইবুড়ো থাকবে নাকি চিরকাল? ওর হয়ে গেলে

আবার পরেরটির কথা ভাবতে হবে না?'
স্বামীর হাত থেকে জামাটা নিয়ে আলনায় ঝুলিয়ে রাখলেন বাসন্তী, তারপর বললেন, 'তবু ভালো, এতদিন বাদে তোমার মুখ থেকে প্রীতির বিয়ের কথাটা বেরিয়েছে। এবার ওর বিয়েটা নিশ্চয়ই হবে। আমার মন বলছে হবে।'
বাসন্তীর মুখে হাসি ফুটল।
অবনীমোহন বললেন, 'দেখ প্রীতির বিয়ের কথা আমার মুখ থেকে না বেরোলেও এর আগেও আমার মাঝে মাঝে মনে হয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভেবেছি ওকথা আমি কেন আগে বলব? ওর কাকা আছে, সে বলুক। আরে টাকার জোগাড় তো আমিই করব। কিন্তু সে এগিয়ে আসুক, সে উদ্যোগী হোক। আমার মেয়ের বিয়ের কথা আমাকে মুখ ফুটে বলতে হবে কেন?'
বাসন্তী বললেন, 'হুঁ, সেই রকম ভাই-ভাগ্যই কিনা তোমার! সে তো কেবল আড্ডা আর বন্ধুবান্ধব নিয়েই আছে। সংসারের কোন খোঁজ রাখে, না ধার ধারে?'
অবনীমোহন বললেন, 'সংসারে সবাই কি একরকম হয়? তাছাড়া আমি মাথার ওপর আছি বলেই ও এরকম বেপরোয়া হতে পেরেছে। না হলে কি পারত? মৃগাঙ্ককে তো এখনো ছেলেমানুষ বলেই মনে হয় আমার।'
বাসন্তী অবাক হয়ে বললেন, 'ছেলেমানুষ? চল্লিশ পার হয়ে গেছে না ঠাকুরপোর বয়স।'
অবনীমোহন স্নেহার্দ্র স্বরে বললেন, 'পার হয়ে গেলে কি হবে, ওর ছেলেমানুষী কোনদিন যাবে না। নিজের হবি আর হৈ-হল্লা নিয়েই ও আছে। থাকুক। দেখ, এক কাজ কর, আজ রাত্রে ওকে ডেকে পাঠাও। খাওয়া-দাওয়ার পর ওর সঙ্গে আলোচনা করি।'
বাসন্তী বললেন, 'কিসের আলোচনা?'
অবনীমোহন বললেন, 'প্রীতির বিয়ের।'

বাসন্তী বললেন, 'ও মা, এখনই ঘটা করে এত আলাপ-আলোচনার কি হয়েছে। বরপক্ষ এসে মেয়ে দেখে যাক, তাদের পছন্দ হোক, দাবী-দাওয়ার কথা শুনি তারপরে ওর সঙ্গে আলোচনা করতে হয় করো।'

অবনীমোহন বললেন, 'উঁহু, পরে নয়, আগে থেকেই ওকে জানাতে হবে। সেইটাই উচিত।'

বাসন্তী একটু বিরক্তির সুরে বললেন, 'তোমার মুখে তো উচিত ছাড়া আর কথা নেই, যাও দয়া করে এবার হাত-মুখটা ধুয়ে এসো। সেটাও কম উচিত নয়।'

তোয়ালেটা স্বামীর দিকে এগিয়ে ধরলেন বাসন্তী।

সন্ধ্যার পর থেকে বার বার ভাই আর বড় ছেলের খোঁজ নিতে লাগলেন অবনীমোহন। না, তারা কেউ ফেরেনি, কখন ফিরবে, তারও ঠিক নেই।

বাসন্তী বললেন, 'এতো একটা বাড়ি নয়, মেস হোটেলের চেয়েও বাড়া। যার যখন খুশি আসে, যার যখন ইচ্ছে খায়।'

অবনীমোহন বললেন, 'তুমি চুপ করো। নালিশ ছাড়া কি তোমার মুখে আর কোন কথা নেই?'

বাসন্তী বললেন, 'আমি কিছু বললেই তো তাতে তোমার গায়ে জ্বালা ধরে। কিন্তু সংসারে যা দিন-রাত দেখতে পাচ্ছি, তাই

অবনীমোহন ফের বাধা দিয়ে বললেন, 'থাক, থাক।'

অবশ্য দেখতে তিনিও পাচ্ছেন। এক সংসারে একই বাড়িতে থেকেও দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কাটে মৃগাঙ্কের সঙ্গে তার দেখা-সাক্ষাৎ, কথাবার্তা হয় না। কোন মাসে মাইনের টাকাটা নিজেই দিয়ে যায়, কোন মাসে চেয়ে নিতে হয়, এই পর্যন্ত। আর কোন খোঁজ-খবর সে রাখে না। মাঝে মাঝে মনে হয়, ভাইয়ের সঙ্গে তিনি এক অন্নে আছেন বটে, কিন্তু একই চিন্তা ভাবনায়, একই

দায়িত্বে নেই, যা করবার সব অবনীকেই করতে হয়। কিন্তু এই একনায়কত্ব তো তিনি চাননি। সংসারের সবাই সমান উপার্জন করতে পারে না, তবু সংসারের জন্য মায়া-মমতা, চিন্তা-ভাবনা, দায়িত্ব-কর্তব্য সকলেরই সমান থাকা দরকার। না হলে শুধু এক হাঁড়িতে ভাত রেঁধে, এক সারিতে বসে খেলেই তো আর একান্নবর্তিতা হয় না, তাছাড়া সেই এক সারিতে বসে খাওয়াই বা হয় কই। দু' ভাইয়ের অফিসের সময় এক নয়, দু' জনের নাওয়া-খাওয়ার সময়ও তাই আলাদা। এমন কি, ছুটির দিনগুলিতেও একসঙ্গে খাওয়ার জো নেই। মৃগাঙ্ক অতিমাত্রায় সামাজিক, আড্ডাপ্রিয় মানুষ। ছুটির দিনে ওর হয়ত কোন বন্ধু বাড়িতে নিমন্ত্রণ জুটে গেল, না-হয় ফিরল দুটো-আড়াইটেয়। এদিকে নাওয়া-খাওয়ার ব্যাপারে অবনী অত্যন্ত নিয়ম মেনে চলেন। অনিয়ম তাঁর শরীরে সয় না। কিন্তু মৃগাঙ্কের অনিয়মেই আনন্দ। নিয়মের বাড়াবাড়ি, কড়াকড়িতে যেন হাঁপিয়ে ওঠে। কিন্তু এ বৈষম্য নেহাৎ-ই বাইরের। অবনীমোহন অনুভব করতে থাকেন, ভাইয়ের সঙ্গে ভিতরে ভিতরে নানা রকমের ব্যবধান ক্রমেই বাড়ছে। মৃগাঙ্ক মনোযোগ দিয়ে কোন চাকরি-বাকরিই করল না। এই অমনোযোগের চাপ যে সম্পূর্ণ অবনীমোহনের ওপর গিয়েই পড়ে, সেটুকু বোধও যেন ওর নেই। মাঝে মাঝে বেশ ভালো চাকরিই পায় মৃগাঙ্ক। অবনীমোহন আশা করতে থাকেন, বিশ-পঁচিশ টাকা হাতখরচ রেখে এবার পুরো টাকাটাই সংসারে দেবে মৃগাঙ্ক। কিন্তু তা হয় না। অর্ধেকেরও বেশি টাকা সে নিজের জন্যে খরচ করে। এত টাকা ওর কেন দরকার হয়, তা অবনীমোহন জিগ্যেস করতে গিয়েও করতে পারে না। তিনি চুপ করে যান। কিন্তু স্ত্রী তো চুপ করে থাকবার মানুষ নয়, তাঁর অভিযোগ অনবরত চলে। বাসন্তী বলেন, 'এর বেশি টাকা কি করে দেবে ঠাকুরপো। বউয়ের ফাই-ফরমায়েসের খরচ আছে না? তাছাড়া শ্বশুরবাড়ির তরফের

আত্মীয়-কুটুম্বের আপ্যায়নের জন্যেও তাকে আলাদা তবিল রাখতে হয়। আমাদের সাধারণ আদরযত্নে তো ওদের মন ওঠে না।'

এসব বিবরণে মাঝে মাঝে মন খারাপ হয়ে যায় অবনীমোহনের। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ ধরনের ক্ষুদ্রতা, সঙ্কীর্ণতাকে মন থেকে তিনি ঝেড়ে ফেলেন। এসব অনুদারতার প্রশ্রয় তিনি দিতে পারেন না। যে বড়, তাঁকে অনেক সহ্য করতে হয়, অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। স্ত্রীকেও সেই কথা বলেন, সেই পরামর্শ দেন অবনীমোহন, 'তুমি বড়, তোমাকে সইতে হবে।'

অবনীমোহনের মনে হয়, নিজের ভিতরে যে ক্ষুদ্রতা আছে, স্বার্থ-পরতা আছে, স্ত্রী যেন তারই প্রতিমূর্তি। স্ত্রী পুরুষের সত্যি সত্যিই 'বেটার হাফ' নয়, ওটা পুরুষের মুখের সৌজন্যের বুলি। আসলে স্ত্রী অপকৃষ্ট অংশ। ভারি ছোট, ভারে সঙ্কীর্ণ ওদের গণ্ডি। স্বামী আর সন্তানের বেড়া দিয়ে ঘেরা ওদের ছোট সংসার। পুরুষকেও সেই ছোট গণ্ডির মধ্যে আটকে রাখতে চায়। ওদের চাওয়ার কাছে আত্মসমর্পণ করতে নেই, অবনীমোহন তা করেন নি। এই তাঁর গর্ব, এই তাঁর আত্মপ্রসাদ! তিনি তো বোকা নন। মৃগাঙ্ক কি করে না করে, তা তিনি সব জানেন, সব টের পান। কিন্তু টের পেলেও ওকে তিনি টের পেতে দেবেন না। মানুষের ক্ষুদ্রতার সঙ্গে পাল্লা দিতে নেই, তার মহত্ত্বের সঙ্গেই তাঁর প্রতিযোগিতা।

খবর পেয়ে মৃগাঙ্ক এসে বলল, 'হঠাৎ ডেকেছেন যে।' অবনীমোহন বললেন, 'হ্যাঁ, হঠাৎ-ই ডেকেছি। ডেকে না পাঠালে তো আর দেখা-সাক্ষাৎ হবার জো নেই তোমাদের সঙ্গে। পাশাপাশি ঘরে দু'জনে থাকি, তবু যেন কতদিন ধরে কথাবার্তা বন্ধ। যেন ঝগড়া করে, মামলা-মোকদ্দমা করে আলাদা হয়ে আছি।'

অবনীমোহনের ভাবপ্রবণতায় বেশ একটু লজ্জিত হোল মৃগাঙ্ক। লজ্জা নিজের জন্যে নয়, দাদার জন্যে। মাসকয়েক বাদে বাদে দাদার

এ ধরনের ভাবালুতার ঝোঁক চাপে। বাড়ির প্রত্যেককে ডেকে ডেকে অযাচিত স্নেহ প্রকাশ করেন, আবেগরুদ্ধ গলায় অন্তরের ব্যাকুলতা জানান। তারপর বোধ হয়, নিজেই লজ্জিত হন, সেই লজ্জায় আবার মাসকয়েক চুপচাপ থাকেন। হ্যাঁ, পাশের ঘরেই তো থাকে মৃগাঙ্ক। উঠতে বসতে রোজ দেখা হয়, এক-আধবার কথাও যে না হয়, তা নয়। এর চেয়ে আর বেশি কি দরকার। এমন কোন বিষয়-সম্পত্তি আছে, যা নিয়ে রোজ মন্ত্রণা-সভা বসাতে হবে। দৈনন্দিন সাংসারিক হিসাব বাজার আর ছেলেমেয়েদের জল-খাবারের ব্যবস্থা তো বউদিই করেন, সে দপ্তরে কারো নাক ঢোকাবার জো নেই, কারো কোন সাহায্যের প্রয়োজন হয় না তাঁর। তবে আর কোন্ বিষয় নিয়ে দাদার সঙ্গে আলাপ করবে মৃগাঙ্ক। দুজনের মধ্যে তো সে সম্পর্ক নয় যে, দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে ভদ্রতা জানাবে, নমস্কার করে বলবে, 'এই যে ভালো আছেন, ছেলেপুলে সব ভালো? গরমটা বড্ড বেশি পড়েছে যেন।'
আসলে দাদা তো মোটেই সামাজিক হবেন না। অফিস আর বাড়ি ছাড়া দুনিয়ায় আর কোথাও যাবেন না, কারো সঙ্গে আলাপ পরিচয় করবেন না। অফিসে নিজের ডিপার্টমেণ্টের কয়েকজন কেরানী, আর বাড়িতে স্ত্রী, এ ছাড়া তৃতীয় কারো সঙ্গে ও'র আলাপ নেই, অন্তরঙ্গতা নেই। এভাবে চললে দুনিয়া তো দু'দিনেই একঘেঁয়ে হতে বাধ্য। মাসকয়েক বাদে বাদে ও'র হয়তো একবার করে সেই একঘেঁয়েমি বোধটা আসে, আর তার জন্যেই ওই রকম ছটফট করেন।
অবনীমোহনের কথার জবাবে মৃগাঙ্ক বলল, 'আপনি অন্য মুড-এ থাকেন, হয়তো কোন কিছু চিন্তা করেন, তাই কথা বলে ব্যাঘাত করিনে।'
অবনীমোহন একটু হাসলেন, 'তাতো ঠিকই। চিন্তা তো করিই। কিন্তু কি নিয়ে যে চিন্তা করি, তা কি কেউ ভাবো? একদিনও মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করো? কাব্য-সাহিত্য নয়, রাজনীতি নয়,

পরমার্থ নয়, তোমাদের ভাত-ডাল, তেল-ননের চিন্তাতেই আমার সারা দিনরাত কাটে।'

মৃগাঙ্ক বলল, 'অত চিন্তা করবার কি আছে। অত চিন্তা আপনি কেন করতে যান।'

অবনীমোহন বললেন, 'সাধ করে কি করি? বাধ্য হয়েই করতে হয়। ভালো কথা, আর কোন চাকরি বাকরির খোঁজ কি পেলি?'

মৃগাঙ্ক এবার একটু গম্ভীরভাবে বলল, 'না এখনো পাইনি। দু'-একটা জায়গায় কথাবার্তা চলছে। দেখি কতদূর কি হয়।'

অবনীমোহন আর কিছু বললেন না। সংসার সম্বন্ধে অনবরত চিন্তা না করলে দুমাস বেকার থেকে একটি পয়সা না দিয়ে কি মৃগাঙ্ক এমন নিশ্চিন্ত থাকতে পারত?

বাসন্তী স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'নাও ভূমিকা তো হোল। এবার আসল কথাটা বলে ফেল, অনেক রাত হয়ে গেছে।'

অবনীমোহন বললেন, 'আমার আসল কথা আমি বলেছি. এবার তোমার যদি কিছু বলবার থাকে বলো।'

মৃগাঙ্ক বলল, 'ব্যাপারটা কি।'

বাসন্তী তখন সব খুলে বললেন। বৈদ্যনাথ প্রীতির যে সম্বন্ধ এনেছেন, তার খুঁটিনাটি বিবরণ দিলেন।

মৃগাঙ্ক বলল, 'বেশ তো। দেখতে চায় তারা এসে আগে দেখে যাক। আমরাও দেখি-শুনি, তারপর দুপক্ষের পছন্দ হলে কথাবার্তা চালানো যাবে।'

বাসন্তী স্বামীর দিকে তাকালেন, 'নাও ঠাকুরপোর মত তো জানা গেল, এবার তারা এসে দেখে যাক।' তারপরে মৃগাঙ্কের দিকে চেয়ে বললেন, 'ওঁর ভাবনা ছিল তোমার মত হবে কি হবে না, তুমি ভাইঝির বিয়ে দিতে চাও কি না—উনি তো আবার তোমার মুখের কথা না শুনলে এক চুলও নড়ে বসবেন না, তাই ভালো করে মতামতটা তোমার দাদাকে জানিয়ে যাও ঠাকুরপো।'

মৃগাঙ্ক উঠে দাঁড়িয়ে পরিহাসের সুরে বলল, 'দাদাকে আর আলাদা করে জানাবার দরকার হবে না। যাঁকে জানাবার তাঁকে তো জানিয়েছি। নাও, এবার খেতে টেতে দাও গিয়ে।'
বলে মৃগাঙ্ক বেরিয়ে গেল।
বাসন্তী স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'নাও, হোল তো? ওঠ এবার।' অবনীমোহন বললেন, 'হুঁ।'

মনে মনে ভাবলেন, হোল আর কই। নিজের মেয়ের বিয়ে সম্বন্ধে তিনি তো ভাইয়ের শুধু মুখের মতামতটাই শুনতে চাননি অন্তরের আগ্রহটাও দেখতে চেয়েছিলেন। শুধু হোক বললেই তো আর মেয়ের বিয়ে হয় না। তার জন্যে যথেষ্ট টাকা-পয়সা দরকার। কিন্তু মৃগাঙ্ক সে আলোচনার ধার দিয়েও গেল না। ইচ্ছা করেই এড়িয়ে গেল। পাছে ও সব কোন কথা ওঠে তাই তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল। কিন্তু অবনীমোহন তো ওর কাছে মেয়ের বিয়ের জন্যে আলাদা করে টাকা চাননি। তিনি জানেন মৃগাঙ্কের দেওয়ার শক্তি নেই, সে দিতে পারে না। মৃগাঙ্কের শক্তি-সামর্থ্যের কথা অজানা নেই অবনীমোহনের। কিন্তু সামর্থ্যই তো সব নয়। তার চেয়ে বড় হৃদয়। পরিবার সম্বন্ধে দরদ। সেই দরদের পরিচয় তো সে দিতে পারত। জিজ্ঞেস করতে পারত পরিবারের এরকম আর্থিক অবস্থায় মেয়ের বিয়ের খরচ কি করে চলবে। কি করে কোত্থেকে টাকা জোগাড় করবেন অবনীমোহন। তার জন্যে ওর আন্তরিক উদ্বেগ, চিন্তা-ভাবনা দেখলে খুশি হতেন। কোথাও যে কোন পুঁজি নেই, তা তো সে জানে। না কি ভেবেছে গোপনে গোপনে তিনি বহু টাকা সঞ্চয় করেছেন? কোন অভাব-অনটনই তাঁর নেই? সেই বিরূপতা, সেই বিদ্বেষবোধ ফের এসে জমতে থাকে অবনীমোহনের মনে। বাসন্তী বলে, 'তুমিই ওকে নষ্ট করেছ। তুমিই প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে, অতিরিক্ত ভালোমানুষিতা দেখিয়ে দেখিয়ে ওকে খারাপ করে ফেলেছে। এখন হায়-আপসোস করে আর কি হবে। যদি ভালো চাও তো

এখনো নিজের বুঝে বুঝে চল। এভাবে চললে একপাল ছেলেপুলে নিয়ে তোমাকে বুড়ো বয়সে পথে দাঁড়াতে হবে, আমি বলে দিলুম।' তা দাঁড়াতে হয় হোক। তবু তিনি ছোট ভাইয়ের কাছে ছোট হতে পারবেন না। মুখ ফুটে বলতে পারবেন না, 'তোমার কাছে টাকা চাই। তোমার টাকা ছাড়া এ সংসার আমি চালিয়ে রাখতে পারব না।' না, একথা কিছুতেই বলবেন না তিনি। কেন বলতে হবে। সে কি নিজের চোখে সব দেখতে পাচ্ছে না? দেখেও যদি তার কর্তব্যবোধ না জাগে, মমত্ববোধ না জাগে, তবে কি শুধু মুখের বলায় তা জাগবে? বাসন্তী বলে, তুমি ওকে আদর দিয়ে দিয়ে নষ্ট করেছ, কোন দিন শাসন করো নি, দায়িত্ব কর্তব্য বুঝিয়ে দাও নি, তার ফলেই এইরকম হয়েছে। ভালো চাও তো এখনো শক্ত করে চাপ দাও দুটো নরমও বল, দুটো গরমও বলে দেখবে টাকা আপনি বেরোবে।'

কিন্তু অবনীমোহন জানেন তা বেরোবে না। বরং আচমকা চাপ দিতে গেলে সব ভেঙে যাবে, তাঁর সংসার একেবারে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। মৃগাঙ্কের স্ত্রী সুরমার মনোভাব তিনি যে না বোঝেন তা নয়। আধুনিক কালের কলেজে পড়া মেয়ে। চারদিকে স্বাতন্ত্র্য-বোধের বেড়া দিয়ে ঘেরা। কেবল শক্তিতে কুলিয়ে ওঠে না তাই। নইলে আরো পরিচয় পেতেন অবনীমোহন। সেই স্বাতন্ত্র্যের আরো উগ্রপ্রকাশ দেখতে পেতেন। এই একান্নবর্তী পরিবারে থেকেও সুরমা যেন আলাদা। নিজের ঘরের মধ্যে সে ছোট এক সংসার রচনা করে নিয়েছে। বাড়ির কারো সঙ্গে বড় একটা মেশে না। ঘরের মধ্যেই থাকে। একবার বইয়ের আলমারী খোলে আর একবার কাপড়ের আলমারী। দুটি আলমারীকে ঝাড়ে পোঁছে, সাজায় গুছায়, নিজের দুটি ছেলেমেয়ের আদর-যত্ন করে, তাদের জামা-জুতো পরিয়ে দেয়। রান্নাঘরের বড় উনুন থেকে বার বার চা খেতে অসুবিধে হয় বলে মৃগাঙ্ক ওকে একটা স্টোভ কিনে দিয়েছে। সেই স্টোভ যখন তখন জ্বলে উঠে ফোঁস ফোঁস করতে থাকে। সে স্টোভে শুধু

চা-ই হয় না। মৃগাঙ্কের যখন চাকরি বাকরি থাকে, তখন তাতে কাটলেট, অমলেটও হয়। মৃগাঙ্কের বন্ধুবান্ধব আসে, শালা-শালীরা আসে তাদের হাসিগল্পের শব্দ নিজের ঘরে বসেই শুনতে পান অবনীমোহন। সবই তিনি টের পান। কিন্তু টের পেয়েও কিছু বলেন না অবনীমোহন। বলাটা সঙ্কীর্ণতা, ক্ষুদ্রতা, আত্মার হীনতার পরিচয়। বাসন্তী অবশ্য বলতে ছাড়ে না। এই নিয়ে দুই জায়ের মধ্যে মাঝে মাঝে কথান্তর মনান্তর হয়। বাসন্তী জোর গলায় চেঁচায়, সুরমা আস্তে আস্তে দু-একটা কথা বলে। কিন্তু তার সেই মৃদু আর মিতভাষণে ধার কম থাকে না, জ্বালা কম থাকে না। তবু স্ত্রীকেই ধমক দেন অবনীমোহন। স্ত্রীকেই শাসন করেন। বলেন 'ছি ছি ছি এত ছোট তুমি, এত ছোট তোমার আত্মা।' সে ধিক্কার যেন নিজেকেই ধিক্কার। বাবার মত তাঁর তো দেশ আর সমাজের বড় কর্মক্ষেত্র নেই, আছে শুধু একটি বাড়ি, একটি পরিবার। সেই পরিবারের মধ্যেও কি বড় হয়ে থাকতে পারবেন না অবনীমোহন? শুধু বয়সে আর সম্পর্কে বড় হয়েই থাকবেন? হৃদয়ের দিক থেকে বড় হতে পারবেন না? ওরা যা করছে করুক, অবনীমোহন নিজের আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হবেন না, যতক্ষণ সাধ্য আছে, যতক্ষণ শক্তি আছে, ততক্ষণ যুঝবেন, সংসারের জন্য প্রাণপাত করবেন সেও ভালো, কিন্তু নিজের পতন ঘটতে দেবেন না।

'মা!'

অরুণ এসে দোরের সামনে দাঁড়াল।

বাসন্তী নীচে নামতে যাচ্ছিলেন ছেলেকে দেখে থেমে দাঁড়িয়ে বললেন 'এই যে নান্তু, এতক্ষণে বুঝি তোর বাড়ি ফেরার সময় হোল। হাঁরে তুই যে অতুলকেও ছাড়িয়ে গেলি।'

এ অভিযোগের কোন জবাব না দিয়ে অরুণ বলল, 'তোমরা সব খেয়ে দেয়ে নিয়েছ?'

বাসন্তী বললেন, 'তোরা রাত দুপুর পর্যন্ত থাকবি বাইরে আর

আমরা খেয়ে দেয়ে নেব। তা নিই নাকি কোন দিন।'
অরুণ একটু কোমল সুরে বলল, 'না না বেশি রাত হয়ে গেলে তোমরা খেয়ে নিয়ো মা।'
বাসন্তী হেসে বললেন, 'হয়েছে, আর তোমার দরদে কাজ নেই। অত বেশি দরদ টরদ দেখাসনে নান্তু, মরে যাব রে মরে যাব।'
অরুণ মৃদু হেসে মুখ ফিরিয়ে তেতলার সিঁড়িতে পা দিয়েছে, বাসন্তী পিছন থেকে ডেকে বললেন, 'ও কি চললি যে, শোন।'
অরুণ ফিরে এসে ফের মার সামনে দাঁড়াল।
বাসন্তী বললেন, 'আজ না পয়লা তারিখ? মাইনে পেয়েছিস তো?'
অরুণ মৃদুস্বরে বলল, 'পেয়েছি।'
বাসন্তী হাত পাতলেন, 'দে। আমার তবিল একেবারে খালি। কালকের বাজারের পয়সাটি পর্যন্ত নেই।'
অরুণ নিঃশব্দে পকেট থেকে টাকা বের করে দিল।
বাসন্তী নোটগুলি হাতে নিয়ে বললেন, 'কম কম লাগছে যে, নেওয়ার সময় গুণে নিয়েছিলি তো?' বলে নিজেই নোটগুলি একখানা একখানা করে গুণতে আরম্ভ করলেন বাসন্তী।
অরুণ বলল, 'গুণে কি করবে মা। ওখানে একশ' পঁচিশ টাকা আছে।'
বাসন্তী আর্তনাদের সুরে বললেন, 'মোটে একশ' পঁচিশ? কেন বাকি টাকা কি হোল? গত মাসে তো একশ' পঁচাশি দিয়েছিলি। বাকি সবই কি তোর হাত-খরচের জন্যে লাগবে?'
অরুণ মৃদুস্বরে বলল, 'না সে জন্যে নয় টাকাটা অন্য কাজে দরকার হয়েছে।'
বাসন্তী বললেন, 'কি কাজ শুনি?'
অরুণ বলল, 'আর একজনকে কয়েকদিনের জন্যে ধার দিয়েছি।'
বাসন্তী ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'কাকে?'
অরুণ বললে, 'তাও কি তোমার জানা দরকার?'
বাসন্তী বললেন, 'দরকার বলেই তো জিজ্ঞেস করছি।'

অরুণ বলল, 'বেশ তাহলে শোন। আমার একটি বান্ধবীকে ধার দিতে হয়েছে। তার অত্যন্ত দরকার। বাড়িভাড়া বাকি পড়েছে—'
বাসন্তী বাধা দিয়ে বললেন, 'বাড়িভাড়া তো আমারও বাকি।'
অরুণ বলল, 'তা দেওয়ার অনেক লোক আছে। কিন্তু তার আর কেউ নেই।'
বাসন্তী বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বললেন, 'তাই বুঝি তুমি গিয়ে তার একমাত্র সহায়ক হয়েছ?'
অরুণ তীব্রস্বরে বলল, 'মা!'
তারপর স্থিরদৃষ্টিতে একটুকাল বাসন্তীর দিকে তাকিয়ে রইল।
ঘরের ভিতর থেকে অবনীমোহন সব শুনতে পাচ্ছিলেন, এবার দোরের সামনে এসে দাঁড়ালেন, বললেন, 'কি হয়েছে? কাকে টাকা দিয়েছে নান্তু?'
বাসন্তী স্বামীর দিকে ফিরে তাকালেন, 'আঃ, তুমি আবার কেন এলে এর মধ্যে? তোমার আসার কি দরকার?'
অবনীমোহন বললেন, 'আমার দরকার বলেই এসেছি। এতদিন না এসে এসেই তো সংসারের এই হাল। কাকে টাকা দান করে এসেছ নান্তু?'
ছেলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন অবনীমোহন।
খোঁচা খেয়ে অরুণ উদ্ধত ভঙ্গিতে বলল, 'দান নয় ধার। কাকে দিয়েছি তা মার কাছে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন।'
এই বলে অরুণ ওপরে উঠে গেল।
খানিক বাদে প্রীতি এসে ওর ঘরের সামনে দাঁড়াল, 'দাদা, তোমার ভাত বাড়া হয়েছে। খাবে চল। ও'রা সব বসে আছেন।'
অরুণ ঘরের ভিতর থেকে বলল, 'ও'দের গিয়ে বল, আমি খেয়ে এসেছি।'
প্রীতি বলল, 'এই ঝগড়াঝাটির পর সে-কথা কি কেউ বিশ্বাস করবে? সবাই ভাববে তুমি রাগ করে খেলে না। তার চেয়ে চল, দুটি খেয়েই আসবে।'

অরুণ বিরক্ত হয়ে বলল, 'আঃ বললুম যে খেয়ে এসেছি।'
প্রীতি বলল, 'সে কথা কেউ বিশ্বাস করবে না।'
অরুণ বলল, 'তার জন্যে তো আমি আর ভরা পেটে খেতে পারিনে।'
প্রীতি বলল, 'তাহলে সত্যিই তুমি খেয়ে এসেছ? কোত্থেকে খেয়ে এসেছ দাদা?'
অরুণ বলল, 'তা শুনে তোর কি দরকার?'
প্রীতি মুখ টিপে হাসল, 'না আমার আর কিছু দরকার নেই। মা জিজ্ঞেস করলে কি বলব তাই বলে দাও।'
ওর হাসি দেখে অরুণও একটু হাসল, 'কিছু বলতে হবে না, তুই যা।'
প্রীতি বলল, 'সকলের সামনে বলব না। মা যদি খুব চেঁচামেচি করে, তাহলে শুধু তাকে আড়ালে ডেকে বলব, কি বল।' বলে প্রীতি আর দাঁড়াল না।

অরুণ ভাবল কাজটা ভালো হোল না। ও যদি সত্যিই গিয়ে বলে করবীদের বাড়ি থেকে অরুণ খেয়ে এসেছে, তাহলে মার চেঁচামেচি বাড়বে ছাড়া কমবে না। সকলে আরো অনেক কিছু ভাববে, তার চেয়ে বরং অল্প করে একমুঠো খেয়ে আসা ভালো। রাত্রে তো সে অমনিতেই কম খায়। তাতে কেউ কিছু ভাববে না। রাগ করে মাঝে মাঝে অরুণ এর আগেও দু'-এক রাত্রে খায় নি। কিন্তু আজ খেয়ে এসেও না খাওয়ার ভান করতে হচ্ছে।

একটু বাদে অরুণ নিচে নেমে গেল, তারপর অবনীরা দুই ভাই যেখানে খেতে বসেছিলেন, সেখানে গিয়ে একপাশে গম্ভীর মুখে পিঁড়ি পেতে বসল।

খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকে গেলে রাত্রে ফের এসে প্রীতি দেখা করল অরুণের সঙ্গে, বলল, 'তোমার সঙ্গে কথা আছে দাদা।'
অরুণ বিছানায় শুয়ে পড়ে একটা মাসিক কাগজের পাতা ওল্টাচ্ছিল, বোনের দিকে চেয়ে বলল, 'কি কথা।'

প্রীতি একটু ইতস্তত করে বলল, ওঁরা আবার সম্বন্ধ দেখতে শুরু করেছেন। তুমি ওঁদের বারণ করে দাও। আমি কিন্তু বিয়ে করব না।'

অরুণ হেসে বলল, 'ঈস, কি কঠিন প্রতিজ্ঞা! কিন্তু আমাদের দেশের বিশেষ করে আমাদের বাড়ির মেয়েরা কোনদিনই বিয়ে করে না, তাদের বিয়ে হয়, তারা বিয়েয় বসে। তোর কোন ভয় নেই, আমরা চৌদোলা করে তোকে ঠিকমত পিঁড়িতে বসিয়ে দেব। তোর একটুও পরিশ্রম হবে না।'

প্রীতি বলল; না ঠাট্টা-তামাসার কথা নয়, আমি সত্যি বলছি। তোমরা যদি গোড়া থেকে আমার কথা না শোন, শেষে কিন্তু একটা মহা অনর্থ হবে। তুমি ওঁদের বলে দিয়ো যে আমার বিয়েতে মত নেই।'

অরুণ বলল, 'আচ্ছা, তা না হয় বললাম। কিন্তু অমতের কারণটা কি তাই বলত।'

প্রীতি বলল, 'কারণ আবার কি। অমনিই। আমি অমনিই থাকব। চাকরি বাকরি করব। সবারই যে বিয়ে করতে হবে, তার কোন মানে আছে।'

অরুণ বলল, 'তা নেই। কিন্তু চাকরি বাকরি করে বয়স যখন বেড়ে যাবে তখন বর খুঁজে পাওয়াই ভার হয়ে উঠবে।'

প্রীতি বলল, 'আমার বর তোমাদের কাউকে খুঁজতে হবে না।'

অরুণ বলল, 'কেন, তুই কি নিজেই খুঁজে নিবি নাকি? ভালোই তো।'

প্রীতির মুখ হঠাৎ যেন আরক্ত হয়ে উঠল। মুখ নামিয়ে একটুকাল চুপ করে রইল প্রীতি। তারপর বিরক্তির ভঙ্গিতে বলল, 'বললাম যে আমি কোনদিন বিয়েই করব না, তার আবার বর খোঁজাখুজি কিসের। তুমি ওঁদের বুঝিয়ে বলো।'

অরুণ বলল, 'আচ্ছা বলব। যা এবার নিশ্চিন্তে ঘুমো গিয়ে যা।'

প্রীতি আর কোন কথা না বলে উঠে চলে এল।

অরুণ দোর ভেজিয়ে দিয়ে আলনায় ঝুলানো শার্টের পকেটে হাত

ডুবিয়ে দিল সিগারেটের জন্যে। সিগারেটের বাক্সের সঙ্গে আর একটি জিনিসে হাত লাগল। মুখ-ছেড়া একখানি খাম। চিঠিখানা জামা খুলবার সময় বুকপকেট থেকে পড়ে গিয়েছিল। অরুণ তুলে নিয়ে সেখানা ফের ঝুলপকেটে রেখে দিয়েছে। সিগারেট ধরিয়ে চিঠিখানা চোখের সামনে মেলে ধরল অরুণ। আজ সকালের ডাকে চিঠিখানা পেয়ে একবার পড়েছে, অফিসে গিয়ে পড়েছে আরো একবার এই তৃতীয়বারেও যেন তা পুরোন হয়নি। হ্যাঁ করবীই লিখেছে। এবার আর দেওরের জবানীতে নয়, নিজের জবানীতে নিজের হাতের অক্ষরেই চিঠি লিখেছে করবী। খুবই সাদা-মাঠা, বৈষয়িক চিঠি। তবু অরুণ যতবার পড়েছে, ততবারই যেন তার মধ্যে বিষয়াতীতের স্বাদ পেয়েছে। করবী লিখেছে ঃ

মান্যবরেষু,

হঠাৎ বড় দরকারে পড়ে চিঠিখানা আপনাকে লিখতে বাধ্য হচ্ছি। এ ধরনের চিঠি যাতে আপনাকে না লিখতে হয় তার জন্যে এই দুদিন ধরে অনেকবার অনেক রকমভাবে চেষ্টা করে দেখলাম। কিন্তু কিছুতেই পেরে উঠলাম না। এ চিঠি আমার সেই অক্ষমতার কাহিনী, অসামর্থ্যের নিদর্শন। কিন্তু ঘুরিয়ে বলার বস্তু তো নয়, যতই ঘুরিয়ে বলি এর স্থূলতা তো কিছুতেই ঢেকে দিতে পারব না। তাই খুলেই বলি। সহজভাবে সোজা ভাষায় নিজের অভাবের কথাটা আপনাকে জানিয়ে ফেলি। চোখমুখ বুজে একবার বলে ফেলতে পারলে আর কোন চক্ষুলজ্জা থাকবে না। তখন যত লজ্জা আপনার, যত দায় আপনার, যত অসুবিধে আপনার। গোটা পঞ্চাশেক টাকা ধার দিতে পারেন? এই চার-পাঁচ দিনের জন্যে? ভারি ঠেকে পড়েছি। বাড়িওয়ালার কাছে আর হাতজোড় করতে চাইনে। তাই আপনার কাছেই হাত পাতলুম। ইতি। করবী বসু।'

রবিবার বিকেলে মেয়ে দেখার তারিখ ঠিক হোল। ছুটির দিন

পুরুষেরা সবাই বাড়ি থাকবে। ক'দিন ধ'রে দু'টি পরিবারে মেয়েদের মধ্যে কেবল এই বিয়ের প্রসঙ্গের আলোচনাই চলতে লাগল।

বাসন্তী বললেন, 'মেয়ে বড় হলে তার গয়নাপত্র সবাই সুবিধেমত দু' একখানা করে গড়িয়ে রাখে। কিন্তু আমাদের বাড়ির ধরন-ধারনই আলাদা।'

কনকলতা আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'তার জন্যে ভাবনা কি ঠাকুরঝি। টাকার ব্যবস্থা থাকলে কলকাতায় কি জিনিসের অভাব হয়। দু' ঘণ্টার মধ্যে সব ঠিক করে ফেলা যায়।'

বাসন্তী বললেন, 'টাকার জোগাড় থাকলে তো সে কথা বউদি। আমাদের মত সংসারে আগে থেকেই একটু একটু করে তৈরী হ'তে হয়। আমি কতদিন ধ'রে বলছি, কিন্তু আমার কথা কি কেউ শোনে।'

কনকলতা মুচকি হেসে বললেন, 'ভদ্রলোককে তো দিনের মধ্যে পঁচিশবার ওঠাও আর পঁচিশবার বসাও। এতেও যদি কথা না শোনা হয়—'

বাসন্তী হেসে বললেন, 'বাইরে থেকে তোমরা ওই রকমই ভাব। কিন্তু ভিতরে ভিতরে যা একখানা মানুষ তা, যাকে ঘর-সংসার করতে হয় সেই বোঝে।'

বাড়ির ছেলেমেয়েদের মধ্যেও বেশ একটা স্ফূর্তির ভাব দেখা গেল। প্রীতিদির বিয়েতে কে কোন কাজ করবে, কে কার কোন কোন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করবে, মুখে মুখে তার তালিকা পর্যন্ত ঠিক হতে লাগল।

ভুবনময়ী বললেন, 'এখন পর্যন্ত কোথায় বিয়ে তার ঠিক নেই, তোদের একেবারে ফুলশয্যা তৈরী। আগে মেয়ে দেখে পছন্দ হোক, কথাবার্তা ঠিক হোক, তবে তো—এ বাড়ির মেয়েদের বিয়ে, না আঁচালে বিশ্বাস নেই।'

সবাই কিছু না কিছু বলছে, হাসি ঠাট্টা আলাপ আলোচনা করছে, শুধু প্রীতিই নির্বাক। তার মুখ গম্ভীর। একটুও হাসি নেই তার মুখে।

তার যে বিয়ে করার ইচ্ছে নেই। সে যে সারাজীবন কুমারী থাকবার সঙ্কল্প করেছে, একথা কেবল দাদাকেই নয়, মাকেও একবার জানিয়েছে প্রীতি। কিন্তু কেউ তার কথায় আমল দেয়নি। যেন এর চেয়ে অদ্ভুত কথা অসম্ভব প্রস্তাব আর কিছু নেই।

মেয়ের কথায় বাসন্তী ধমক দিয়ে বলেছেন, 'আবদার আর কি, বিয়ে করবি না, ঘরগৃহস্থালী করবি না, সারাজীবন বুঝি এইভাবেই যাবে ভেবেছিস?'

প্রীতি জবাব দিয়েছে, 'গেলই বা, সকলের জীবনই যে একভাবে কাটবে, তার কি মানে আছে।'

বাসন্তী বিরক্ত হয়ে বলেছেন, 'আর গুণ নেই ছার গুণ আছে। দুখানা কাজকর্ম ভালো করে শিখবে তার নামে দেখা নেই, যত সব লম্বা লম্বা বুলি। আমি তখনই বলেছিলাম, দাদার মেয়ের মত ওরও সময় থাকতে থাকতে বিয়ে দিয়ে দাও, ল্যাঠা চুকে যাক। তা আমার কথা তো কারো কানে গেল না, এখন হেনতেন কত কথা শুনতে হবে।'

সেদিন সন্ধ্যার পর ছাদের কোণে বিজু চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল প্রীতি এসে পাশে দাঁড়াল। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'শুনছ তো সব?'

বিজু ফিরে তাকাল, 'কি সব?'

প্রীতি বলল, 'বাঃ, এই যে দেখা-শোনার কথা চলছে। রবিবার তারা সব দেখতে আসবে তুমি কি শোননি?'

বিজু বলল, 'শুনেছি।'

প্রীতি বলল, 'কিন্তু তোমার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় না তো যে শুনেছ। বেশ চুপচাপইতো বসে আছ দেখছি।'

বিজু প্রীতির দিকে তাকিয়ে একটু হাসল, চুপচাপ থাকবো না তো কি, সারা বাড়ি ভরে চেঁচামেচি করে বেড়াব? তাতে কি লাভ হবে কিছু?'

না, হৈ-চৈ চেঁচামেচি করবার ছেলে বিজু নয়। চিরকালই শান্তশিষ্ট লাজুক, মুখচোরা স্বভাবের মানুষ। চেঁচামেচি করবার কারণ

ঘটলেও সে চেঁচামেচি করে না, পাশ কাটিয়ে এড়িয়ে যায়। বৈদ্যনাথের স্বভাবের একেবারে বিপরীত ও। বিজু বাড়ি থাকলেও টের পাওয়া যায় না ও আছে। যতক্ষণ থাকে, ঘরের কোণে নিজের মনে বইপত্র নিয়ে কাটায়। বাড়ির সকলের সঙ্গে তার যেন আলাপও নেই। কদাচিৎ কারো সঙ্গে দু' একটা কথাবার্তা হয়। বাপ মার সঙ্গেও তেমনি। বৈদ্যনাথের সামনে মুখ তুলে সে কথা পর্যন্ত বলে না। ভালো ছেলে বলে সকলের কাছেই সুনাম আছে বিজুর। কেবল প্রীতিই জানে, সবাই যা মনে করে, বিজু শুধু তাই নয়, ওর মধ্যে লুকিয়ে আছে আরো একজন ভিন্ন ধরনের মানুষ, যে অস্থির চঞ্চল আর মোটেই ভালো ছেলে নয়। কিন্তু প্রীতিই কেবল তাকে চেনে, আর কেউ তার কোন খোঁজখবর রাখে না। যদি বা টুনু রুনুরা এক আধবার কিছু কিছু আন্দাজ করতে পারে, কোন কথা বলবার সাহস তাদের নেই। বিজুর সম্বন্ধে সেসব কথা কে বিশ্বাস করবে? এই ভালো মানুষিতার ছদ্মবেশের আড়ালে এতদিন ধরে বেশ লুকোচুরি চলছিল, কিন্তু আর বুঝি চলে না। এবার বুঝি সব ধরা পড়ে যায়। ধরা পড়লেই ভালো। প্রীতির এক এক সময় মনে হয়, তারা ধরা পড়ুক। যা হবার হয়ে যাক, তাহ'লে এই দম আটকানো ভাবটাতো শেষ হোত। কিন্তু তা সম্ভব নয়। বিজু এখন পর্যন্ত লুকিয়ে থাকতে চায়। ওর বোধ হয় ধারণা চিরকাল এভাবে লুকিয়ে থাকা যাবে, লুকিয়ে রাখা যাবে। শুধু বিজুরই বা কেন প্রীতির মনে হয় বাড়ির অনেকের মধ্যেই এই লুকোচুরি ভাবটা আছে। বিশেষ করে মা, মাসীমা, দিদিমা এ'দের কথায় মাঝে মাঝে যেন এক আধবার তার আভাস মেলে। যেন মনে হয় ওঁরা কিছু কিছু আন্দাজ করতে পারছেন। কিন্তু ওঁরা কেউ তো প্রকাশ করতে চান না। প্রীতির এক সময় বুক কাঁপে। বুঝি ওঁরা কিছু স্পষ্ট ক'রেই ব'লে ফেললেন। কিন্তু তা ওঁরা বলেন না, প্রীতি এতদিনে বুঝেছে তেমন ক'রে বলবার ওঁদের সাহস নেই। তাদের মত ওঁরাও লুকোচুরির

পক্ষপাতী। কিন্তু এবার তো আর লুকোচুরি নয়। এবারতো ওঁরা স্পষ্টই বিয়ের আয়োজন করছেন। ওঁরা ওঁদের মন স্থির করে ফেলেছেন। এখনো কি চুপ ক'রে থাকা যাবে? প্রীতি বললে, 'চেঁচামেচি করে কিছু লাভ নেই তা ঠিক। কিন্তু ও'রা তো সব একদিকে। ও'রা যদি জোর করেই সব ঠিকঠাক করে ফেলেন তখন কি করা যাবে?'

বিজু বলল, 'কিন্তু বৈঠক করবার ভার তো সব তোমার ওপর। তুমি যদি রাজী না থাক, তোমার যদি মনের জোর থাকে, কার সাধ্য জোর করে তোমাকে বিয়ে দেয়।'

প্রীতি বলল, 'তুমি পুরুষ ছেলে। তোমার পক্ষে জোর ক'রে কিছু বলা সহজ। কিন্তু আমার জোর কি টিকবে? তুমি কি কেবল জোর করার কথা বলবে, কেবল উপদেশ আর পরামর্শ দেবে? তোমার কি আর কিছু করার নেই?'

বিজু বলল, 'আছে বইকি। যখন করবার তখন করব। আগে থেকে হৈ-চৈ করলে সব পণ্ড হবে। মেয়ে দেখে গেলেই আর সব হয়ে গেল না। তারপরও তো আরো কিছু সময় পাওয়া যাবে। তাছাড়া পরীক্ষা দিয়ে পাশ করাটাই শক্ত। ফেল তো ইচ্ছা করলেই করা যায়। ওরা যাতে অপছন্দ করে, সেটুকুতো অন্তত করতে পারবে।'

ঠিক, এতক্ষণ তো একথা মনেই হয়নি প্রীতির। এই একটা ফাঁক আছে। এই একটা পথ পাওয়া গেছে এবার। বাড়ির সবাই যত অনুষ্ঠান আয়োজন করুক, ভিতরে ভিতরে সব পণ্ড করে দেওয়ার মত শক্তি আছে প্রীতির। পাত্রপক্ষ দেখে হয়তো তাকে অপছন্দ করবে না। কিন্তু সে বোকা সাজতে পারে, অতিরিক্ত ফাজিল সাজতে পারে এমন আরো অনেক কিছু করতে পারে, যার জন্যে ওরা অপছন্দ করে যাবে। তবু ভালো লাগে না, তবু সমস্ত ব্যাপারটা ভাবতেই কেমন যেন গা ঘিন ঘিন করে। এর চেয়ে যদি সোজা সরল কোন পথ থাকত।

কিন্তু না আর কোন পথ নেই। সহজভাবে কিছু করারই জো নেই— আর।

রবিবার বিকেল সাড়ে চারটেয় বিপিনবাবুরা আসবেন মেয়ে দেখতে। কিন্তু বৈদ্যনাথ সকাল থেকেই তার তোড়জোড় আরম্ভ করলেন। বাইরের বসবার ঘর ঝাড়া হয়েছে। ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করালেন। তক্তাপোশের উপর ঢালা ফরাস পাতালেন। এক দুপুর বসে দেয়ালের বড় ঘড়িটার সময় ঠিক করলেন। তেতালা থেকে একতালা পর্যন্ত ছুটোছুটি হাঁকডাক করে বাড়ির লোকজনকে তিনি প্রায় অস্থির করে তুললেন।

কনকলতা স্বামীর ব্যস্ততা দেখে বললেন, 'বাবারে বাবা, এর আগে আর কারো ভাগ্নীকে কেউ যেন কোনদিন দেখতে আসেনি। তুমিই যেন প্রথম দেখাচ্ছ। ভাব দেখে মনে হয়, কন্যাদায়টা যেন অবনীবাবুর নয়, তোমার।'

বৈদ্যনাথ বললেন, 'হুঁ, যাও যাও, কাজে যাও, ওকে একটু সাজিয়ে গুছিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা কর গিয়ে।'

কনকলতা বললেন, 'কেন, তুমি নিজে এসে সাজাও। সবইতো নিজের হাতে করছ, এটাই বা বাদ থাকে কেন। আমরা কি সাজতে সাজাতে জানি যে সাজাব।'

মুখ টিপে হাসলেন কনকলতা।

বৈদ্যনাথ বললেন, 'বাজে বোকো না, যা বলছি তাই কর গিয়ে। আর দেখ, আমাদের ঘরেই ওকে দেখাবার ব্যবস্থা কোরো, বেশ খোলামেলা আছে, ওই ঘরেই সুবিধে হবে।'

কনকলতা বললেন, 'আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে। গরজখানা যেন তোমারই বেশি দেখা যাচ্ছে। মেয়ের কাকার তো দেখাই নেই। বাপ একজন ঘরের মধ্যে ভোলানাথ হয়ে বসে আছেন। তোমার মত গরজ তো আর কারো দেখছিনে।'

বৈদ্যনাথ কোন জবাব দিলেন না, গরজ যে কেন এত বেশি তা কনকলতা

কি বুঝবে। বুঝিয়ে তাকে দরকারও নেই। যেমন করেই হোক মেয়েটাকে পার না করতে পারলে বিজুর পরীক্ষা-টরীক্ষা আর দেওয়া হবে না। দিলেও ফেল করবে। অথচ কোন দিন তাঁর ছেলে কোন একটি বিষয়ে ফেল করেনি। সব সাবজেক্টে ভালো মার্ক রেখে পাশ করে এসেছে। কোন দিন কেউ ওকে একটা পান সিগারেট পর্যন্ত খেতে দেখেনি। পাড়ার ডাক্তারবাবু প্রায়ই বলেন, 'বৈদ্যবাবু আপনার ছেলেটি একটি রত্ন। পাড়ার যা সব সংসর্গ, তার ভিতরেও ছেলেদের আপনি যেভাবে ঠিক রেখেছেন, তাতে আপনার বাহাদুরী স্বীকার করতে হয় মশাই।'

হ্যাঁ, নিজের রীতিনীতি, রুচি, আদর্শ অনুযায়ী ছেলেমেয়েদের তিনি গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। অবনীর মত গা ছেড়ে দেননি। যার যেমন খুশি, সে তেমন ভাবে চলুক সে নীতি বৈদ্যনাথের নয়। কিসে খুশি হওয়া উচিত, তা বলে দেওয়া দরকার, বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। ছেলেমেয়েদের সেইভাবেই বুঝিয়েছেন বৈদ্যনাথ। কোন বিলাসিতাকে প্রশ্রয় দেননি, সিনেমা থিয়েটার শহরের আরো পাঁচরকমের হৈ-চৈ হুজুগ যাতে ওদের মনকে না টানে, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন। ঘরভরা জায়গা আছে, বাড়িভরা জায়গা আছে, পড়াশুনা কর, খেল, ছাদের ওপর ফুল আর শাকসব্জীর চাষ কর, অবসর মত ঘর সংসারের কাজে এখন থেকেই হাতেখড়ি দাও, কাজের অভাব কি। রুটিন বেঁধে চল। ছন্দছাড়া যেমন কবিতা হয় না, নিয়ম ছাড়া তেমনি জীবনকে গড়ে তোলা যায় না। প্রথম প্রথম এই নিয়ম মানায় কষ্ট হতে পারে, পরে দেখবে নিয়ম না মানলে আরো বেশি কষ্ট। এইভাবেই তিনি বুঝিয়েছেন ছেলেদের। খুব বেশি শাসন করতে হয়নি, কিন্তু শক্ত হতে হয়েছে। বিজু আর বিনু দুজনেই সাবমিসিভ্‌। দুজনেই তাঁকে শ্রদ্ধা করে একটু হয়ত বেশি রকম ভয়ই করে। কিন্তু গুরুজনকে ভয় করা ভালো। ভয় ভেঙে গেলে কি হয়, তাতো তিনি চোখের ওপরই দেখতে পাচ্ছেন। যেমন তাঁর বড় ভাগ্নে, তেমন

মেজোটি। শিক্ষিত অশিক্ষিত দুই-ই সমান। একজন কথায় কথায় বাপের সঙ্গে তর্ক করে, আর একজন কথায় কথায় মাসল্ ফুলায়। অবনী যদি এখনো সমঝে না চলে, তাহলে বুড়ো বয়সে ওর কপালে আরো দুঃখ আছে। কিন্তু বিজু বিনু ওদের মত হয়নি। তিনি যা চেয়েছেন, ছেলেরা প্রায় সেই রকমই হয়ে উঠেছে। বিজু ফোর্থ ইয়ারে পড়লে কি হবে, আজকালকার কলেজের ছেলেদের মত কোন বিলাসব্যসন নাই, রাজনীতির হুজুগ নেই, বন্ধুবান্ধবের উৎপাত নেই। বৈদ্যনাথ ছেলেদের অনেকদিন উপদেশ দিয়েছেন পাঠ্যাবস্থায় বন্ধুত্ব-টন্ধুত্বও ভালো নয়, ওতেও পড়াশুনোর ক্ষতি করে। ছাত্র হবে যোগী। তার যোগাযোগ থাকবে শুধু বইয়ের সঙ্গে। জ্ঞানের সাধনা ব্রহ্মচারীর সাধনা, সংসারের মধ্যে থেকেও মনে করতে হবে সংসারের মধ্যে নেই।

বিজু এই উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেছে। কিন্তু যত গোলমাল বাধিয়েছে বাসন্তীর ওই মেয়েটা। মেয়েটি যে খারাপ, ফাজিল-ফক্কড় কি আড্ডাবাজ প্রকৃতির, তা নয়। বরং নিরীহ শান্তশিষ্ট ধরনেরই। তাঁর ছেলের মত মেয়েটিও ভালো। কিন্তু বয়স বিশেষে অবস্থা বিশেষে একটি ভালো ছেলে আর একটি ভালো মেয়ের বেশি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ভালো নয়, তাদের রাসায়নিক ফল খারাপ। খুব চরম কিছু যদি নাও ঘটে, পড়াশুনো কাজকর্মের ব্যাঘাত ঘটাবার পক্ষে তাই যথেষ্ট। বৈদ্যনাথ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন সেই ব্যাঘাত ঘটছে। কিছুদিন যাবৎ বিজু পড়তে পড়তে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে, কার গলার স্বর, পায়ের শব্দ শোনবার জন্যে যেন উৎকর্ণ হয়ে থাকে ও। একটু বাদেই প্রীতি যখন আসে, ওর চোখেমুখে এক অদ্ভুত আনন্দের আভাস জাগে। মেয়েটা ঘর ছেড়ে নড়তে চায় না, টুকটাক এটা ওটা করে। আর বিজু ততক্ষণ কেবল বইয়ের পাতা ওল্টায়। সে সময় এক লাইনও যে ওর পড়া হয় না, তা বৈদ্যনাথের বুঝতে বাকি থাকে না। তা ছাড়া সকলের

অসাক্ষাতে দেখা করার দিকে ওদের যে বেশ একটু ঝোঁক আছে, তা লক্ষ্য করেছেন বৈদ্যনাথ। কিন্তু হৈ-চৈ করে ব্যাপারটাকে অনর্থক ঘুলিয়ে তুললে ফল আরো খারাপ হবে। তার চেয়ে মেয়েটির যত তাড়াতাড়ি বিয়ের ব্যবস্থা করে দেওয়া যায়, ততই ভালো। অবশ্য বৈদ্যনাথের ধারণা, এখনো তেমন কিছু হয় নি। তাঁর ছেলে কোন রকম দুর্নীতি করতে পারে না। সিগারেটটা পর্যন্ত খেতে যার সাহস নেই, তার ওসব দুর্বুদ্ধি মাথায় আসবে কোত্থেকে। এসব স্নেহ-ভালোবাসাই সম্ভব। কিন্তু স্নেহের বাড়াবাড়িকেও তো প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। তাও শেষ পর্যন্ত আসক্তিতে দাঁড়িয়ে যায়। আর ছাত্রজীবনের পক্ষে যে কোন আসক্তিই খারাপ। বোন তো বোন একটা কুকুর, একটা পাখী এমন কি একটা ফুটবলের ওপরও যদি বেশি আসক্তি এসে পড়ে, পড়াশুনা মাটি করে দেওয়ার পক্ষে তাই যথেষ্ট। এ অবস্থায় কর্তব্য কি। বৈদ্যনাথ এ নিয়ে অনেক ভেবে দেখেছেন। যদি সম্ভব হোত অন্য বাড়িতে চলে যেতেন। কিন্তু এখনকার দিনে ভাড়াটে বাড়ি সুলভ নয়। অবনীদেরও সরে যেতে বলা যায় না। ওরাই বা কোথায় যাবে। এর একমাত্র সমাধান মেয়েটিকে পার করা। চোখের আড়ালে গেলেই মনের আড়ালে যাবে। তাই নিজেই গরজ করে ভাগ্নীর বিয়ের জন্যে চেষ্টা চরিত্র শুরু করেছেন বৈদ্যনাথ। এর জন্যে যদি গাঁট থেকে দু'একশ টাকা নেমে যায় সেও ভালো।

আসবার সময় কিন্তু বিপিনবাবু নিজে এলেন না। তাঁর এক জ্ঞাতি ভাই সুরেনবাবুর সঙ্গে ছেলে রণজিতকেই পাঠিয়ে দিলেন। বৈদ্যনাথ তাঁদের সযত্নে বৈঠকখানায় নিয়ে বসালেন। তারপর সুরেনবাবুর দিকে তাকিয়ে স্মিতমুখে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার দাদারই তো আসবার কথা ছিল। তিনি এলেন না যে।'

সুরেনবাবু বললেন, তিনি একটা কাজে আটকা পড়ে গেছেন। আসতে পারেন নি বলে আপনাকে চিঠি দিয়েছেন একখানা।'

বলে পকেট থেকে একখানা চিঠি বের করে বৈদ্যনাথের হাতে দিলেন

সুরেনবাবু। সহকর্মীর চিঠিখানা খুলে পড়লেন বৈদ্যনাথ। বৈষয়িক কাজের দোহাই দিয়ে বিপিনবাবু ছেলেকেই পাঠিয়েছেন। এখনকার যা দিনকাল তার সঙ্গে তাল রেখে চলাই ভালো। রণজিতের যদি পছন্দ হয়, পাকা দেখতে দেনা-পাওনার কথা বলতে বিপিনবাবুকে তো আসতে হবেই। আজ আসতে পারলেন না বলে বৈদ্যনাথ যেন ক্ষুণ্ণ না হন।

বৈদ্যনাথ মনে মনে ভাবলেন, ভদ্রলোক বেশ বিচক্ষণ বটে। কিন্তু তিনি হলে এ ধরনের আপসের মধ্যে যেতেন না। ছেলে কি ভাববে না ভাববে, সে কথা ভেবে নিজের আদর্শভ্রষ্ট হতেন না বৈদ্যনাথ। খানিক বাদে কনে দেখবার জন্য তিনি সুরেনবাবু আর রণজিতকে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন। রণজিতের বাবার সঙ্গে যে তাঁর খুবই ঘনিষ্ঠতা, খুবই বন্ধুত্ব সে কথা নানা দৃষ্টান্ত দিয়ে রণজিতকে বোঝাতে লাগলেন বৈদ্যনাথ। এই সময় টুনু এসে খবর দিল, 'মামা, একটু শুনুন তো, আপনাকে ওঁরা ভিতরে ডাকছেন একবার।'

বৈদ্যনাথ উঠে এলেন। নীরজার ঘরে বাড়ির বউ-ঝিরা প্রীতিকে ঘিরে ঘিরে দঙ্গল পাকিয়েছে। ট্রাঙ্ক থেকে বার করা শাড়ি শেমিজ, প্রসাধনের টুকিটাকি জিনিসগুলি রয়েছে এক ধারে। কিন্তু প্রীতি সেগুলি পরবেও না, যাবেও না ভদ্রলোকদের সামনে। চাপা গলায় বাসন্তী, কনকলতা সবাই নিন্দা করছেন। শাসন করছেন ভুবনময়ী, 'ছি ছি ছি, এমন একগুঁয়ে মেয়ে আমার বাপের জন্মেও দেখি নি। তুই কি মান-সম্মান কিছু রাখবিনে। ডেকে আন, ওর বাপকে ডেকে আন। যে আহ্লাদ দিয়ে দিয়ে মেয়েকে মাথায় তুলেছে, সে এসে যা করবার করুক এখন।'

বৈদ্যনাথ এসে মাকে মৃদু স্বরে ধমক দিলেন, 'তুমি চুপ করো তো। যাও সব সরে যাও। কি হয়েছে আমি দেখি।'

তাঁকে দেখে মেয়েরা সরে দাঁড়ালেন। বৈদ্যনাথ প্রীতির কাছে এসে বললেন, 'কি হয়েছে।'

সবাই ভাবল বৈদ্যনাথ যা রগচটা মানুষ, তাতে হয়ত বকেঝকে, গাল-মন্দ করে অস্থির করে তুলবেন। কিন্তু বৈদ্যনাথ সে পথ দিয়েই গেলেন না। স্নেহকোমল স্বরে প্রীতির পিঠে হাত রেখে বললেন, 'কি হয়েছে মা। ছিঃ, ওরকম করে নাকি। ভদ্রলোকেরা এসেছেন। ও'রা কি ভাববেন বলতো, তোমার কিছু ভয় নেই। ও'রা সবাই আমার পরিচিত। ও'রা তোমাকে বেশিক্ষণ আটকে রাখবেন না, দু'একটা কথা জিজ্ঞেস করেই ছেড়ে দেবেন। তা ছাড়া আমি তো সব সময়ই তোমার কাছে থাকব। ও'দের আমি নিমন্ত্রণ করে ডেকে এনেছি। এখন যদি তুমি কথা না শোন, তাহলে আমাকে অপদস্থ হতে হবে। অফিসে নিয়ে পাঁচজনের কাছে আর মুখ দেখাতে পারব না। তাই কি তুমি চাও? চল, লক্ষ্মী মা আমার, চল।'
প্রীতি ভেবেছিল অনেক কথা বলবে। কড়া কড়া, শক্ত শক্ত কথা। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেন এসব আয়োজন করা হয়েছে, তার নিজের কি কোন একটা মতামত নেই? কিন্তু কোন কথাই তার মুখ থেকে বেরুল না। বৈদ্যনাথের এই করুণ আবেদন ওর মনকে অদ্ভুতভাবে স্পর্শ করল। ভাবল বিজুর পরামর্শ নেওয়া যাক। এখন থেকে হৈ-চৈ করে লাভ নেই, পরে যা করবার তারা তো করবেই। সে তো তাদের মনে মনে ঠিক করাই আছে। এখনকার মত অনর্থক হাঙ্গামা বাড়িয়ে কি হবে।

অবনীমোহন বাড়িতেই ছিলেন। কিন্তু ঘর থেকে এ পর্যন্ত বেরোন নি। একেবারে প্রত্যক্ষ বৈষয়িক ব্যাপারগুলির মধ্যে তিনি পারত-পক্ষে এগুতে চান না। টাকা যা দরকার, তা তিনি জোগাড় করে দেবেন উপদেশ পরামর্শ দেবেন, কিন্তু হাতে-কলমে যা-কিছু করবার বাসন্তী করুক কিংবা আর কাউকে দিয়ে করিয়ে নিক। বাস্তব কাজকে ভিতরে ভিতরে যেন অবনীমোহন একটু ভয় করেন। কোথায় যেন তাঁর একটা বীতস্পৃহা আছে। একেক সময় তাঁর মনে হয়, তিনি বড় বেমানান। আবার অন্য সময় মনে হয়, তিনি এসব

খ্‌ুঁটিনাটির ঊর্ধ্বে। এসব তুচ্ছতার মধ্যে যাওয়ার কথা তাঁর নয়। তবু প্রীতি অমত করছে শুনে একবার ভাবলেন, এ সময় তাঁর যাওয়া উচিত। মেয়েকে কিছু বলা উচিত। কিন্তু মন স্থির করবার আগেই দেখলেন, সব ঠিক হয়ে গেছে। সেজে-গুজে প্রীতি গিয়ে ঢুকেছে বৈদ্যনাথদের ঘরে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে অবনীমোহন দৈনিক কাগজের পাতায় চোখ রাখলেন।

প্রীতি ভেবেছিল, ভদ্রলোকেরা শক্ত শক্ত সব প্রশ্ন করবেন। আর সে ইচ্ছা করে সেগুলির জবাব দেবে না, কিংবা ভুল জবাব দেবে। কিন্তু তেমন কিছুই হোল না। বৈদ্যনাথের নির্দেশে একটা টুল পেতে বসে প্রীতি মুখ নিচু করে রইল। অবশ্য আগন্তুকদের আড়চোখে একবার দেখেও নিল। যার সঙ্গে তার সম্বন্ধ এসেছে, তাকেও দেখল। ফর্সা রঙ, ছিপছিপে চেহারা। দেখতে মোটামুটি ভালোই। স্বভাব যে খুব গম্ভীর তা নয়, কিন্তু একটা গাম্ভীর্যের ভান করে রয়েছে। চোখ দুটি চঞ্চল। বছর পঁচিশ ছাব্বিশের বেশি বয়স হবে না। কাকাটির চেহারা অন্য রকম। ভাইপোর সঙ্গে তাঁর মিল নেই। বছর চল্লিশেক বয়স। রং খুবই কালো। মোটা বেঁটেখাট চেহারা। একটু দূরে দুজনে পাশাপাশি বসেছেন। কুদর্শন প্রৌঢ় কাকার পাশে ভাইপোটিকে হঠাৎ ভারি সুন্দর মনে হয়। অবশ্য যতটা সুন্দর দেখা যায়, আসলে ততটা সুন্দর নয়। খুঁৎ আছে চেহারায়। রঙ শ্যামবর্ণ হলেও বিজু এর চেয়ে অনেক সুপুরুষ, অনেক বেশি লাবণ্যময়।

সুরেনবাবুই প্রথমে কথা বললেন, 'আপনি ভালো হয়ে বসুন। কোন সঙ্কোচ করবেন না! সঙ্কোচের কি আছে।'

প্রীতি যেভাবে ছিল, সেইভাবেই বসে রইল।

সুরেনবাবু একটু ইতস্তত করে বললেন, 'কোন ক্লাস অবধি পড়েছেন আপনি—'

প্রীতি বলল, 'ফরটি সিক্সে ম্যাট্রিক পাশ করেছি।'

সুরেনবাবু বললেন, 'তারপর বুঝি আর—'
প্রীতি কিছু বলবার আগেই বৈদ্যনাথ বললেন, 'না, তারপর আর কলেজ টলেজে আমরা দিইনি। কি হবে মশাই দিয়ে। পড়াশুনো কি হয় না হয়, তাতো দেখতেই পাচ্ছেন। মিছামিছি স্বাস্থ্য খোয়ানো, আমাদের মধ্যবিত্ত ঘরের বাঙালী মেয়েদের যা শরীরের অবস্থা, তার ওপর একরাশ বই চাপিয়ে ওদেরকে চিরকালের জন্যে একেবারে পঙ্গু করে দেওয়া হয়। বুঝলেন সুরেনবাবু, এ সব মোহ ছাড়া কিছু নয়। উচ্চ শিক্ষার মোহ। উচ্চ নিচ বুঝিনে, প্রকৃত শিক্ষা চাই। জীবন গঠনের পক্ষে সংসারের সেবার পক্ষে যে শিক্ষা উপযোগী—'
রণজিতের ইঙ্গিতে সুরেনবাবু বললেন, 'তাতো ঠিকই।'
তারপর তাড়াতাড়ি প্রীতির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'পড়াশুনা ছাড়া আর কি আপনার ভালো লাগে। ধরুন গান বাজনা।'
প্রীতি মৃদু কিন্তু স্পষ্ট স্বরে বলল, 'না, গান আমি জানিনে।'
বৈদ্যনাথ বললেন, 'একেবারে যে না জানে তা নয়, কিন্তু বড় শাই। প্রীতি, একখানা গান গেয়ে ওঁদের শোনাও না। লজ্জা কি। ওরে হারমনিয়মটা নিয়ে আয় তো এদিকে।'
সুরেনবাবু বললেন, 'হাঁ, লজ্জার কি আছে।'
প্রীতি বলল, গান না জানায় লজ্জার কিছু নেই। কিন্তু ভালো না জেনে গাইতে যাওয়াটা নিশ্চই লজ্জাকর।'
কথাটা বলে বেশ একটু আত্মপ্রসাদ বোধ করল প্রীতি। এতক্ষণে সে উদ্ধত হতে পেরেছে, নিজের অনিচ্ছাকে প্রকাশ করতে পেরেছে। যদি ওঁদের বুদ্ধি থাকে, ওঁরা বুঝে নিন যে, এসব ব্যাপারে প্রীতির মোটেই সম্মতি নেই।

কিন্তু ফল হোল উল্টো। ততক্ষণ রণজিত যেন উদাসীনের মত ছিল। এবার সে নেড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল এবং আর একটু উৎসুক দৃষ্টিতে তাকাল প্রীতির দিকে।
সুরেনবাবু রণজিতের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এবার তুমি যদি কিছু

জিজ্ঞেস করতে চাও কর।'

রণজিত হেসে বলল, 'আপনার জিজ্ঞাসা কি সব শেষ হয়ে গেল সোনাকাকা?' সুরেনবাবু বললেন, 'হাঁ, আমরা কি আর জিজ্ঞেস করব। তোমরা আধুনিক ছেলে—'

রণজিত বলল, 'আধুনিক ছেলেরা জিজ্ঞাসাবাদের বেশি ধার ধারে না। তারা আলাপ করে। কিন্তু তেমন আলাপের স্থান কাল তো এটা নয়। ওঁকে এবার যেতে দিন।'

প্রীতি উঠে দাঁড়িয়েছিল। সুরেনবাবু বাধা দিয়ে বললেন, 'একটু দাঁড়ান। এই কাগজটুকুতে ইংরেজী বাংলায় আপনার নাম ঠিকানাটা—' বলে পকেট থেকে একটুকরো কাগজ আর ফাউণ্টেন পেনটা প্রীতির দিকে তিনি এগিয়ে দিলেন।

রণজিৎ বলল, 'আঃ, আবার অত হাঙ্গামা করছেন কেন। ম্যাট্রিক পাশ করেছেন শুনলেন তো। নাম স্বাক্ষরটা নিশ্চয়ই করতে পারবেন।'

সুরেনবাবু গলা নামিয়ে বললেন, 'তবু হাতের লেখাটা তো দেখা যাবে।'

রণজিৎ আরো নীচু গলায় বলল, 'হাতের লেখায় আর একজনকে কতটুকু দেখা যায়।'

কথাটা কানে গেল প্রীতির। দ্রুত হাতে তাড়াতাড়ি নাম সই করে কাগজখানা সুরেনবাবুকে ফিরিয়ে দিয়ে ওঁদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত নমস্কার জানিয়ে ঘর থেকে সে চলে গেল।

খানিকবাদে চা জলযোগ শেষ করে সুরেনবাবুরা বিদায় নিলেন। সদর দরজার কাছে অবনীমোহনের সঙ্গেও পরিচয় আর নমস্কার বিনিময় হোল। যাওয়ার সময় সুরেনবাবু বলে গেলেন, মতামত তাঁরা পরে জানাবেন।

বৈদ্যনাথ পরদিন অফিসে গিয়ে বিপিনবাবুর কথাবার্তার ধরনে বুঝতে পারলেন মেয়ে রণজিতের পছন্দ হয়েছে, অবশ্য পাত্রপক্ষের অনুকূল মনোভাবের কথা তিনি আগেই আন্দাজ করেছিলেন। এবার

পরিষ্কার বিপিনবাবুর মুখ থেকেই শুনলেন। বৈদ্যনাথ বললেন, 'তাহলে চলুন একদিন তিনজনে বসে বিষয়টা একেবারে পাকাপাকি করে ফেলা যাক। শুভকাজে কালহরণ করতে নেই।'
শুভ কাজটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলায় বিপিনবাবুর গরজও কম নয়। এই ফাল্গুন মাসের মধ্যেই ছেলের বিয়ে দেওয়া তাঁর ইচ্ছা। চৈত্র মাসে বিয়ে-থা হয় না। বৈশাখ মাসেও বাধা আছে। বিপিনবাবুর স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা। চৈত্র-বৈশাখের যে কোন সময় হাসপাতালে আটকে পড়তে পারেন।
বৈদ্যনাথ খবরটা গিয়ে অবনী আর বাসন্তীকে জানালেন।

অবনীমোহন বললেন, 'কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কি সব জোগাড় করা সম্ভব হবে। সপ্তাহ দুই সময় পাওয়া যাবে মোটে।'
বৈদ্যনাথ বললেন, 'দু'সপ্তাহ কম হোল নাকি। তুমি আমার ওপর ভার দাও। দুদিনের মধ্যে আমি সব ঠিক করে দেব।'
বাসন্তী বললেন, 'দাদা ইচ্ছা করলে তা পারে। অণিমার বিয়ের সময়ও তো পনের বিশ দিনের মধ্যে দাদা সব গুছিয়ে ফেললো। তবে তুমি আগে থেকেই একটু একটু করে তৈরী হচ্ছিলে দাদা, কিন্তু তোমার মত তো ওঁরা নয়। তাহলে আর ভাবনা ছিল কি।'
বৈদ্যনাথ উৎসাহ দিয়ে বললেন, 'হবে হবে। তোর কিছু ভাবতে হবে না।'
বহুদিন পরে দাদার মুখ থেকে আশ্বাসের কথা শুনলেন বাসন্তী। আগেকার সেই আন্তরিক স্নেহের স্বাদ পেলেন। বিয়ের প্রসঙ্গকে উপলক্ষ্য করে দুই পরিবারে ফের আলাপ-আলোচনা মেলামেশা চলতে লাগল।

বিপিনবাবু একদিন এসে দেনা-পাওনার কথাও বলে গেলেন। বেশির ভাগ কথাই অফিসে বৈদ্যনাথের সঙ্গে হয়েছে। বাড়িতেও বৈদ্যনাথই কথাবার্তা চালালেন। মৃগাঙ্ক একবার এসে জরুরী কাজে বেরিয়ে

গেল। অবনীমোহন সারাক্ষণ বসে রইলেন। কিন্তু কথা যা বলবার বললেন বৈদ্যনাথই। বিপিনবাবু বাড়ি-খরচ বাবদ আটশ' টাকা চেয়েছিলেন। বৈদ্যনাথ তাকে ছ'শতে নামিয়ে আনলেন। গয়না এবং অন্যান্য যৌতুকের পরিমাণও যুক্তিতর্কে, অনুরোধে, উপরোধে বিপিনবাবুকে অনেক কমে রাজী করালেন বৈদ্যনাথ। ঠিক একদিনে যে পারলেন তা নয়। অফিসে গিয়েও কাজের ফাঁকে ফাঁকে বিপিনবাবুর সঙ্গে তিনি দেনা-পাওনার আলোচনাই করতে লাগলেন এবং অনুনয় বিনয় আর আদর্শবাদের বক্তৃতায় বিপিনবাবুর চড়া দরকে ক্রমেই একটু একটু করে নামিয়ে আনলেন। মেয়ে পক্ষের ওপর বেশি চাপ দেওয়া রণজিতের নিজের ইচ্ছা নয়। সে কথা সে বাবাকে জানিয়ে দিয়েছে। বিপিনবাবু মনে মনে হাসলেন। আসলে মেয়ে বেশি রকম পছন্দ হয়ে গেছে বাবাজীর। তাই এই অতিরিক্ত ঔদার্য। মেয়ে বিপিনবাবু নিজেও দেখেছেন। লক্ষ্মীশ্রীযুক্ত চেহারাই বটে, সুন্দরীও। বিপিনবাবুর স্ত্রী শুনে বলেছেন, 'তা যদি হয়, তাহলে করে ফেল। টাকা পয়সা, গয়না-গাঁটি কখনো আসে, কখনো যায়। যাকে ঘরে আনবে সেই হোল আসল।'

চারদিকের চাপে বিপিনবাবু নরম হলেন। দ্বিধা ত্যাগ করে শুভদিন দেখে কনেকে পাকা দেখার আশীর্বাদও করে গেলেন।

ফাল্গুন মাসের ঊনত্রিশ তারিখে দিন স্থির হয়ে গেল।

প্রীতি বিজুর পরামর্শে হৈ-চৈ না করে চুপ করেই ছিল। বিজু বলেছে, 'নিজেদের মতলব আগে থেকে ওদের জানতে দিয়ো না। আমরা যা করবার তা করবই। যেমন করে পারি এই চক্রব্যূহ থেকে দুজনে বেরিয়ে পড়ব।'

প্রীতি বলল, 'দেখ, ব্যাপারটা আমার ভালো লাগছে না। ক্রমেই দিন ফুরিয়ে আসছে। ফাঁস শক্ত হচ্ছে। এর পর কি আর বেরুতে পারব। তার চেয়ে ওদের স্পষ্ট জানিয়ে দিলে হয় না?'

বিজু বলল, 'কিন্তু স্পষ্ট জানিয়ে দিলেই ওরা তা মানতে চাইবে কেন।

এমনভাবে জানাতে হবে, যাতে ওরা মানতে বাধ্য হয়। ওরা দলে ভারি বলে তো ওদের সঙ্গে পারব না। কৌশলই আমাদের বল। আমি ভেবে দেখেছি প্রীতি, পালান ছাড়া আমাদের আর পথ নেই।'

পালান! কথাটা ভাবতেই আশঙ্কায় উত্তেজনায় শ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসতে চায় প্রীতির। কোথায় পালাবে? কি করে পালাবে? চারদিকে হৈ-চৈ পড়ে যাবে। তাদের তালাসে লোকজন ছুটবে। বাড়ির ছেলে-বুড়ো কারোরই আর কিছু টের পেতে বাকি থাকবে না। বিয়ের উদ্যোগ আয়োজন সব বন্ধ হবে। দশজনের কাছে হেঁট হয়ে যাবে বাপ-মার মুখ। বিশেষ করে বাবার মুখের কথা ভাবলে ভারি কষ্ট হয় প্রীতির। কিন্তু এ ছাড়া কি আর কোন পথ নেই? এখনো কি ও'দের বুঝিয়ে শুনিয়ে বিয়েটা বন্ধ করে দেওয়া যায় না? প্রীতি না হয় কোন দিন না-ই বিয়ে করল। সবারই যে বিয়ে করতে হবে তার কি মানে আছে?

বিয়ের আলাপ আলোচনায় উদ্যোগ আয়োজনে বাড়ির সবাই ব্যস্ত থাকায় তাদের সতর্ক দৃষ্টির পাহারা অনেক শিথিল হয়েছে। এমন কি, ভুবনময়ীও আর বেশি খিট খিট করেন না। প্রীতির ওপর বৈদ্যনাথের মেজাজ প্রসন্ন, ভাষা স্নেহকোমল। আহা, দুদিন বাদে তো মেয়েটি পরের ঘরে চলেই যাচ্ছে, আর কেন ওকে মিছামিছি শাসন করা।

সেদিন বিজুর কলেজ ছুটি ছিল। সারা দুপুরভরে দুজনে কি পরামর্শ করল। তারপর প্রীতি বাসন্তীর কাছে গিয়ে বলল, 'মা, বিজুদার এক বন্ধুর স্টেশনারী দোকান আছে বউবাজার স্ট্রীটে, সেখান থেকে কিছু জিনিস কিনে নিয়ে আসি। কি বল, যাই?'

বাসন্তী বুঝতে পারলেন, জিনিস কেনার নামে দুজনে এ[illegible] বেড়িয়ে আসতে চায়, আসুক। স্বাধীনভাবে ঘোরাঘুরি [illegible] আর কদিনই বা পাবে। মেয়ের কথার জবাবে হেসে বললেন, 'আচ্ছা, আয় গিয়ে। বেশি দেরি করিসনে যেন। কি গরজ! নিজের বিয়ের

কেনাকাটা বুঝি নিজেই করতে হবে। আমরা যে এত করছি তাতে মন উঠছে না! জিনিস কিনবি তো টাকা পাবি কোথায়। টাকা আছে সঙ্গে?'

প্রীতির একবার ইচ্ছা হোল কিছু টাকা চেয়ে নেয়, টাকার তো দরকার হবে। কিন্তু কেমন যেন সঙ্কোচ হোল চাইতে। টাকার ব্যবস্থা যা করবার বিজুই করবে। বলল, 'আজ টাকার দরকার হবে না। আজ শুধু পছন্দ করে আসব। পরে একদিন গিয়ে কিনে আনলেই চলবে।'

বাসন্তী বললেন, 'আচ্ছা, তাহলে আয় ঘুরে। বেশি যেন দেরি করিস নে।' দু'এক মিনিট আগে পিছে দুজনে বেরিয়ে এল। ট্রাম-স্টপেজের কাছে দাঁড়িয়ে বিজু জিজ্ঞেস করলে, 'কোথায় যাবে?'

প্রীতি বলল, 'তোমার যেখানে ইচ্ছা। তোমার কোন এক বন্ধুর কথা বলেছিলে—'

বিজু বলল, 'না না, সে আজ নয়।'

প্রীতিও যেন একটু [illegible]বস্ত হোল। ক'দিন ধরেই বিজু বলছে ব্যাপারটা তার এক [illegible]াবে। তার মতামত খুব উদার। এ বিষয়ে তার কাছ[illegible]া সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু প্রীতি রাজী হ[illegible] এক সঙ্কোচ বোধ করছে সে, ছি ছি দুজনের কথা [illegible]উকে জানান কেন। সে কি মনে করবে। বিশেষ করে [illegible]র্কের কথা শুনলে সে নিশ্চয়ই মনে মনে হাসবে। ত[illegible]া গোপন রাখাই ভালো। অপর কাউকে জানিয়ে ক[illegible]

বিজু বল[illegible]ন পর্যন্ত বলার সুযোগ পাই নি। চল এক জায়গায় [illegible]া করি, এখন কি করা যায়।'

কেবল [illegible] আলোচনা। ক'দিন ধরেই তো তারা আলোচনা করছে [illegible] ঠিক করে উঠতে পারছে কই। কাউকে সাহস প্রীতি [illegible] করে বলতে পারছে না। পাড়ায় দু'চারটি বান্ধবী বিজু বলল [illegible] কিন্তু তাদের বিশ্বাস করবে এমন ভরসা কই।

বিজুরও সেই অসুবিধে। একথা সে কাউকে বলতে পারে না, নিজের গোপন মন যার কাছে খুলে ধরতে পারে, তেমন মানুষ যেন দুনিয়ায় আর কেউ নেই। কলেজে সহপাঠী বন্ধু অনেক আছে। কিন্তু তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তেমন নিবিড় নয়, তারা যদি হাসে, তারা যদি পরিহাস করে সব উড়িয়ে দেয়, কোন রকম সাহায্য করতে যদি এগিয়ে না আসে, তাহলে অনর্থক মুখ হারিয়ে লাভ কি।

ইডেন গার্ডেনে ঢুকে এক জন-বিরল জায়গা খুঁজে ওরা ঘনিষ্ঠভাবে পাশাপাশি গা ঘেঁষে বসল, হাতের মধ্যে রাখল হাত। খানিকক্ষণ দুজনে চুপচাপ বসে রইল। একটু বাদে প্রীতি বলল, 'কই কিছু ঠিক করলে না? এদিকে সন্ধ্যা হয়ে এল যে।'

বিজু বলল, 'হোক, সন্ধ্যা হোক, রাত হোক, কিছুকে আর ভয় করিনে। আমরা আর ফিরব না।'

প্রীতির বুকের ভিতর টিপ টিপ করে উঠল, 'যা, কি যে বল। ফিরব না তো থাকব কোথায়। এই ইডেন গার্ডেনে তো আর সারারাত কাটাতে দেবে না।' বিজু বলল, 'সারারাত নয়; এখন থেকে সারা জীবনের কথা ভাবতে হবে আমাদের। সারা জীবনের প্রোগ্রাম ঠিক করে ফেলতে হবে। ধর আমরা যদি আজই পালাই।

বিজুর এই অদ্ভুত কথায় প্রীতি একটু হাসল, 'আজই কি করে পালাব। আমরা কি সেভাবে তৈরী হয়ে এসেছি। টাকা পয়সা সঙ্গে নিয়ে এসেছি যে পালিয়ে যাব? এতো আর ঝোপ ঝাঁড়ের মধ্যে লুকিয়ে থাকা নয় যে, খানিকক্ষণ তার আড়ালে গিয়ে বসে রইলাম।'

কিছু করতে হলে, কোথাও সরে যেতে হলে টাকার দরকার বিজু তা ভেবে দেখেছে। কিন্তু সেই দরকারী টাকা কোথায় পাওয়া যাবে ভেবে কিছু কূল-কিনারা পায়নি। কলেজের মাইনে আ[illegible]তাহের হাত-খরচ বাবার কাছ থেকে বিজু পায়, আর বই কেনা[illegible]সময় [illegible]যায় পরীক্ষার ফীস দেওয়ার সময় কিছু বেশি টাকা তার [illegible]র

এ ছাড়া টাকার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। টাকা সে কোত্থেকে জোগাড় করবে। এমন কোন বড়লোক বন্ধু নেই, যার কাছে ধার চাইবে সে। ধার চাইবার অভ্যাসই তার নেই। কোনদিনই সে চায় নি। একমাত্র পথ আছে মায়ের গয়নার বাক্স ভাঙা, কি দেরাজ থেকে সংসারী খরচের টাকা চুরি করে পালানো। ছিঃ, তা সে পারবে না। অতটা হীন হতে পারবে না সে। অনেকবার নিজের মনে সে মহড়া দিয়েছে অনেকবার ঘুরে ঘুরে গেছেও দেরাজের কাছে, মায়ের বড় ট্রাঙ্কের কাছ দিয়ে ঘোরাঘুরি করেছে, কিন্তু কিছুতেই তার বেশি এগোতে পারেনি। তাড়াতাড়ি সরে এসেছে। ছি ছি ছি মায়ের গয়না, বাবার টাকা সে কি করে চুরি করবে?

এসব চিন্তা ভাবনার কিছুরই দরকার ছিল না, যদি প্রীতির বিয়েটা না হোত, যদি ওর বিয়েটা বন্ধ করা যেত। তাহলে তারা যেমন ছিল তেমনই থাকতে পারত। শুধু দিনান্তে একবার করে দেখা, দুটি একটি কথা বলা, এর বেশি কিছু তার কাম্য ছিল না। এতেই সে খুশি থাকতে পারত। কিন্তু এতেও যে বাধা পড়ছে! সে যে চাকরি-বাকরি জোগাড় করে প্রয়োজনমত টাকার ব্যবস্থা করবে তার সময় পর্যন্ত নেই। মাঝখানে মাত্র একটি সপ্তাহ আছে। এর মধ্যে সব চিরদিনের জন্য ঠিক হয়ে যাবে। আর তার কোন নড়চড় চলবে না, রদ-বদল হবে না। কিন্তু যেমন করে পারুক একে যে ঠেকাতেই হবে, বাধা না দিলে সব হারাবে বিজু, একেবারে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

অসহায়ের মত বিজু বলল, 'তাহলে কি করা যায় বলতো?'

প্রীতি বলল, 'এতদিনের মধ্যে কিছু যখন আর করা গেল না, তখন আর কিছু করা যাবে বলে মনে হচ্ছে না।'

বিজু বলল, 'তার মানে তোমার বিয়ে হয়ে যাবে? তুমি তাহলে মন স্থির করে ফেলেছ?'

প্রীতি অদ্ভুত একটু হাসল, 'তা খানিকটা করেছি বইকি।'

বিজু বলল 'বিয়েতে তাহলে তোমার মত আছে?'

প্রীতি বলল, 'আছে, কিন্তু তা ওই রণজিত টনজিত কারুও সঙ্গে নয়।'
বিজুর বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগল, বলল, 'তবে কার সঙ্গে?'
প্রীতি বলল, 'যমের সঙ্গে। সে ছাড়া জীবনে দ্বিতীয় কোন পুরুষ আমাকে ছুঁতে পারবে না।'
বিজু নিজের মুঠির মধ্যে শক্ত করে ওর হাত চেপে ধরল, 'এ সব তুমি কি বলছ?'
প্রীতি বলল, 'ঠিকই বলছি। আমি ভালো করে ভেবে দেখেছি, এ ছাড়া আমার আর পথ নেই।'
বিজু একটু চুপ করে থেকে বলল, 'তা যদি হয় তাহলে আমারও সেই পথ।'
প্রীতি বলল, 'তা কেন। তুমি পুরুষ ছেলে। তুমি কোন দুঃখে মরতে যাবে।'
বিজু বলল, 'মানুষ কি কেবল দুঃখেই মরে? মরার মধ্যে কি সুখ নেই প্রীতি? একসঙ্গে মরার সুখ, একসঙ্গে পালানোর সুখ?'
প্রীতি বলল, 'তা আছে। তুমি তাহলে আসবে আমার সঙ্গে?
বিজু বলল, 'নিশ্চয়ই, আমরা কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারব না। দুজনে একসঙ্গে থাকব। কিন্তু একসঙ্গে বেঁচে থাকায় অনেক বাধা, অনেক হাঙ্গামা। একসঙ্গে মরায় তো তা নেই। আমরা একসঙ্গে মরব প্রীতি। মরে সবাইর ওপর শোধ নেব।'
আরও খানিকক্ষণ পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে বসে রইল দুজনে। সঙ্কল্পকে আরও দৃঢ় করে নিল। আর তাদের কোন ভয় নেই। আর কারো কোন শাসন কি রক্তচক্ষুকে তারা গ্রাহ্য করবে না। সবাইর ওপর তারা শোধ তুলতে পারবে। আশ্চর্য এত সহজ পথ থাকতে কেন এতক্ষণ তারা পথ হাতড়ে মরছিল, ভেবে এত আকুল হচ্ছিল কেন। কত সহজ সরল পথ পড়ে রয়েচে। আর তাদের ভাবনা কি, এ পথে আর কারো বিশেষ কোন সাহায্য নিতে হবে না।

তাদের এই মিলনে কোন ঠাকুর পুরোহিত লাগবে না, কারো অনুমোদন লাগবে না, আইন-কানুনের অনুকূলতার দরকার হবে না। যা করবার তারা নিজেরাই করবে। সমস্ত সমস্যার এই সহজ সমাধানে আসতে পেরে দুজনে ভারি তৃপ্তি বোধ করল, এতক্ষণ বাদে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে দুজনে। এখন মৃত্যুর উপায়টা শুধু বেছে নিতে হবে। সে এমন কিছু কঠিন হবে না। বেছে নেওয়ার এখনো ঢের সময় আছে। মাঝখানের এই কয়েকদিন তারা বাঁচবে, বেপরোয়াভাবে বাঁচবে।

দুজনে যখন বাড়ি ফিরল, তখন সন্ধ্যা উৎরে বেশ খানিকটা রাত হয়েছে।

বাসন্তী মেয়ের দিকে তাকিয়ে গম্ভীরভাবে বললেন, 'এত দেরি করলি যে। বললাম না সকাল সকাল আসিস।'

প্রীতি কোন জবাব না দিয়ে নিজের ঘরে ঢুকল।

ভুবনময়ী বলতে লাগলেন, 'যত সব অনাসৃষ্টি কাণ্ড। আজ বাদে কাল যে মেয়ের বিয়ে, সে নাকি এমন টৈ টৈ করে সারা শহর ঘুরে বেড়ায় ছি ছি ছি। লোকে দেখলেই—বরপক্ষও তো বেশি দূরে থাকে না। চেতলা তো এই শহরের মধ্যেই। যদি তাদের কারো চোখে পড়ে যায়, তাহলে মেয়ের এই ধিঙ্গিপনা দেখে তারা কি ভাববে। আস্কারা দিয়ে দিয়ে ছেলেমেয়েদের সব মাথায় তুলে দিয়েছে। এখন বুঝুক মজা।'

নিজের অপছন্দমত কিছু একটা হলে শুধু যে একজনকেই দোষারোপ করেন ভুবনময়ী তা নয়, বাড়ির সমস্ত লোকের ঘাড়েই দোষ চাপিয়ে দেন। আগে আগে কেউ না কেউ এর জবাব দিত, কিন্তু এখন সকলেরই কানে সয়ে গেছে। ভুবনময়ী নিজের মনেই খানিকক্ষণ বক্ বক্ করতে করতে শ্রান্ত হয়ে আপনিই এক সময় থেমে পড়েন।

মাঝখানে দিন তো বড় আর বেশি নেই। বিয়ের উদ্যোগে আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন বাসন্তী। অবনীমোহন টাকার জোগাড় করে দিয়েই

খালাস। তাঁকে দিয়ে আর কোন কাজ হয় না। সব ব্যাপারে সহায় বৈদ্যনাথ। দুই ভাই-বোনে মিলেই যা ব্যবস্থা করবার সব করেন। জিনিসপত্রের ফর্দ, নিমন্ত্রিতদের তালিকা তৈরী করা হয়। আলোচনা আর পরামর্শের সময় অবনীমোহন উপস্থিত থাকেন, দু'একটা মন্তব্য, কি গ্রহণযোগ্য দু' একটি সদুপদেশ যে মাঝে মাঝে না দেন তা নয়, কিন্তু তার বেশি আর কোন সহায়তা তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যায় না। দাদাকে সঙ্গে নিয়েই বাসন্তী কাপড়-চোপড়, জিনিসপত্র পছন্দ করতে বেরোন, তাঁর পছন্দ অপছন্দের ওপরই অনেকখানি নির্ভর করেন। সত্যিই খুব কাজের লোক বৈদ্যনাথ। কাজে তিনি যথেষ্ট আনন্দ পান। অফিসের খাটুনির পর এত যে ছুটোছুটি করছেন, তাতে যেন কোন ক্লান্তি নেই তাঁর।

শুধু স্বামী নয়, নিজের ছেলেমেয়ের কাছ থেকেও তেমন যেন সহযোগিতা পান না বাসন্তী। বাড়িতে এত কাজ, কিন্তু ওরা যেন মা আর মামার ওপর সব ভার চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা নিশ্চিন্ত হয়ে আছে। সবাই ফাঁকিবাজ। সবাই কাজকে, ঝক্কি-ঝামেলাকে ভয় করে —ওরা প্রত্যেকেই বাপের ধারা পেয়েছে।

সেদিন বড় ছেলেকে কাছে ডেকে বাসন্তী বললেন, 'তোরা কি ভাবলি বল তো, সবাই কি অতিথ এলি নাকি বাড়িতে?'

অরুণ হেসে বলল, 'এলামই বা। বিয়ে বাড়িতে অতিথ-কুটুম বুঝি আসে না? নিজেদের বাড়িতে মাঝে মাঝে কুটুম্ব হয়ে থাকতে মন্দ লাগে না মা। মনে করো আমি তোমার বাপের বাড়ির তরফের একজন কেউ। মেজো পিসে কি ছোট খুড়ো। খড়ম পায়ে হুকো হাতে সারা বাড়ি তদারক করে বেড়াচ্ছি।'

বাসন্তীও হাসলেন, 'বাঁদর ছেলের কথা শোন। আমার বাপের বাড়ির কেউ অমন ধারা নয়। তারা সবাই কাজের লোক।'

অরুণ বলল, 'আর আমরা বুঝি অকাজের? কাজের সময় আসুক, তখন দেখ কিরকম খাটতে পারি। এখন আর আমাদের করবার কি

আছে। দুই দাদা-বোনে মিলে কেবল তো বৈঠকের পর বৈঠক চলছে এখন। তার মধ্যে আর কেউ মাথা গলায় সাধ্য কি।'

বাসন্তী বললেন, 'হুঁ, মাথা গলাবার কত যেন গরজ তোমাদের। ভালো কথা, তোর বন্ধু-বান্ধব কাকে কাকে বলবি ঠিক করেছিস?'

অরুণ বলল, 'কাউকেই বলব না।'

বাসন্তী বললেন, 'কেন?'

অরুণ বলল, 'কেন আবার। নিজের বন্ধুদের নিজের বিয়েতে বলব। বরযাত্রী হয়ে অন্যের বাড়িতে খেয়ে আসবে। খবরটা পরের ওপর দিয়ে যাবে। এখন বলে ব্যয় বাড়িয়ে লাভ কি।'

বাসন্তী হেসে বললেন, 'খুব তো হিসেবী হয়েছিস দেখছি। তবু দু'একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে কি বলতে হয় না?'

অরুণ বলল, 'বন্ধুদের মধ্যে আমার সবাই ঘনিষ্ঠ, আবার কেউ ঘনিষ্ঠ নয়; সেদিক থেকে কাউকেই বলবার দরকার হবে না।'

বাসন্তী একটুকাল চুপ করে ছেলের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'আচ্ছা একটা কথা বলি, সেই মেয়েটিকে বলবি? করবীই তো বুঝি নাম। তাকে একবার বললে হয় এই উপলক্ষে।'

অরুণ স্থির দৃষ্টিতে তাকাল, তারপর তীক্ষ্ণস্বরে বলল, 'মা!'

বাসন্তী বললেন, 'আচ্ছা অমন করছিস কেন। মানুষের বাড়িতে কি মানুষ আসে না? আমার বড় দেখতে ইচ্ছা করে মেয়েটিকে। আহা, এই বয়সে কি দুঃখই না পেয়েছে মেয়েটি। বল না তাকে নান্তু।'

বাসন্তীর গলায় অনুনয়ের সুর ফুটে উঠল।

অরুণ বলল, 'তুমি সত্যি বলছ মা? তাকে বললে তুমি খুশি হও?'

বাসন্তী বললেন, 'বাঃ, খুশি হই বইকি! বলিস তাকে। আমার নাম করে বলিস, বুঝলি।'

অরুণ যেতে যেতে বলল, 'আচ্ছা, ভেবে দেখি।'

মনে-মনে ভাবল, বললেই কি সে আর আসবে, না তার পক্ষে আসা সম্ভব হবে।

বিকেলের দিকে অতুলকেও পাকড়াও করলেন বাসন্তী। এক বাণ্ডিল ছিট-কাপড় নিয়ে সে ব্যস্তভাবে বেরোচ্ছিল, বাসন্তী আটকে ধরলেন। বললেন, 'কোথায় যাচ্ছিস?'

অতুল সংক্ষেপে জবাব দিল, 'কাজে।'

বাসন্তী বললেন, 'কাজ যে কত, তাতো দেখতেই পাচ্ছি। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়াচ্ছ। ব্যবসা না ছাই। কেবল আড্ডা আর আড্ডা। এই ছ' মাসের মধ্যে তো একটা পয়সা হাত উপড়ে করে দিতে পারলিনে। কি করিস না করিস তুই-ই জানিস।'

অতুল বলল, 'জানিই তো। এতো চাকরি নয় মা। এর নাম বিজনেস। এতে অপেক্ষা করতে হয়, ধৈর্য ধরতে হয়। এতে টাকা ঢাললে তবে টাকা আসে।'

অতুলের ব্যবসার খোঁজ-খবর যে বাসন্তী একেবারে না রাখেন, তা নয়। গোবিন্দের সঙ্গে মিলে একটা ফুট-মেসিন কিনেছে অতুল। কেশব-বাবুদের বৈঠকখানায় সেটাকে বসিয়ে এক দর্জির দোকান খুলেছে সেখানে। রাতদিন প্রায় সেখানেই থাকে। কেবল খাওয়ার সময় আর শোওয়ার সময় আসে। টাকাটা বেশির ভাগ গোবিন্দের। খাটুনিটা অতুলের। ঘুরে ঘুরে অর্ডার নিয়ে আসে। বিক্রীর বন্দোবস্ত করে, আর ভিতরের বিধি-ব্যবস্থা করে কেশববাবুর স্বামীত্যাগিনী মেয়েটা। আসলে সেই সব চালায়। টাকা-পয়সা সব তার কাছেই থাকে। এই নিয়ে পাড়ায় যে মাঝে মাঝে কানা-ঘুষা না চলে তা নয়। কিন্তু অতুলের যেন তা নিয়ে ভ্রূক্ষেপ নেই। এ সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত করলে চটে উঠে বলে 'কোন শালা বলেছে এ কথা? আমার সামনে এসে বলুক তো দেখব তার কত বড় বুকের পাটা।' তা ঠিক। সামনে কেউ কিছু বলতে পারে না। এমনকি, আড়াল-আবডাল থেকেও যদি কারো কোন আপত্তিকর মন্তব্য কানে যায়, দুই বন্ধু মিলে তাকে দারুণ শাসন করে। পাড়ায় সবাই ওদের ভয় করে চলে। গুণ্ডার দলের সঙ্গেও ওদের ভাব, থানা-পুলিশের সঙ্গেও ওদের

অন্তরঙ্গতা। অতুল-গোবিন্দের দলকে সবাই খাতির করে।
নিজের বাড়িতে দোকান খোলায় কেশববাবু প্রথম প্রথম আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু গোবিন্দ সে আপত্তি কানে তোলেনি। বাপ বেশি বকাবকি করায় মাস দুই খরচ বন্ধ করে দিয়েছিল সংসারের। কেশববাবুকে বাধ্য হয়ে আপোস করতে হোয়েছে।
রমাও উগ্রচণ্ডী স্বভাবের মেয়ে। কারো কানা-ঘুষায় সে কান দেয় না। নিজের মনে কাজ করে যায়। সংসারের কাজও করে, আবার ভাই আর বন্ধুতে মিলে যে দর্জির দোকান দিয়েছে, সাধ্যমত তারও সাহায্য করে। রাস্তায় চলতে ফিরতে মাঝে মাঝে দেখেছেন বাসন্তী। দেখলেই মনে হয়, একগুঁয়ে খাণ্ডারনী ধরনের মেয়ে। ওদের মনে রাগ আছে, হিংসা দ্বিষ আছে, কিন্তু অন্য কোন ময়লা নেই। তাছাড়া অতুলের চেয়ে বয়সেও তো রমা বড়। দিদির মত। তাই ওদের সম্বন্ধে কোন কানা-ঘুষাকে তেমন বিশ্বাস করেন না বাসন্তী। তেমন চিন্তা কি উদ্বেগ যেন হয় না। তাছাড়া চিন্তা-ভাবনা করে করবেনই বা কি। ছেলেমেয়ে একবার বড় হয়ে গেলে তো হাতের মুঠোর বাইরে চলে গেল। না পাওয়া যায় তাদের মনের খবর, না বোঝা যায় তাদের চাল চলন। নইলে এই প্রীতির কথাই ধর না। বয়সের মেয়ে। বিয়ের কথায় কিরকম আনন্দ-আহ্লাদ হবে তা নয় মুখের কালি যেন ঘুচতেই চায় না। সেই যে গুম মেরে রয়েছে তো রয়েইছে।
অতুল চলে যাচ্ছিল, বাসন্তী তাকে ফের ডেকে বললেন, 'অন্য সময় কিছু না দিস নাই দিলি, কিন্তু প্রীতির বিয়েতে বার কর না দু' চারশ'। দেখি এতদিন ধরে কি ব্যবসা করছিস।'
অতুল যেতে যেতে বললে, 'উহুঁ, এখন নয় মা, পরে, এটিকে তোমরা নামাও, পরের দুটির বেলায় আমি আছি।' বলে অতুল বেরিয়ে গেল। বাসন্তী ওর ভঙ্গি দেখে মনে মনে হাসলেন। এই এক ছেলে। পারুক না পারুক, কারো কাছে ঘাড় নোয়াবে না। মাথা হেঁট করবে না কখনো।

দেখতে দেখতে ঊনত্রিশে ফাল্গুন এসে গেল। বিয়ের উৎসবে সমস্ত বাড়ি মুখর হয়ে উঠেছে। গিজ গিজ করছে লোকজন। মেয়ে আর শিশুদের সংখ্যাই তার মধ্যে বেশি। আনব না আনব না করেও কুটুম্ব-স্বজন কম আনেননি বাসন্তী। দাদার শাশুড়ী আর শালাবউকে আনিয়েছেন। জা নীরজার মার শরীর ভালো না থাকায় তিনি আসতে পারেননি। তার দুই বউদি এসেছেন ছেলেপুলে নিয়ে। বেলেঘাটা থেকে ভুবনময়ীর খুড়তুতো বোন এসেছেন আর পাথুরিয়াঘাটা থেকে জেঠতুতো ভাইয়ের স্ত্রী। একদল কিশোরী মেয়ের কালোচ্ছ্বাসে সাড়া বাড়ি উচ্ছল হয়ে উঠেছে।

ভুবনময়ী তাঁর স্থূল দেহ নিয়ে রান্নাঘর আর ভাঁড়ার ঘরে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছেন আর নানা কাজের খুঁৎ ধরছেন। বাসন্তীকে ডেকে বললেন, 'তরকারীগুলি কুটলিনে। ওগুলি কি পড়েই থাকবে?'

বাসন্তী হেসে বললেন, 'কিছু পড়ে থাকবে না মা, তুমি ব্যস্ত হয়ো না, তুমি বরং তোমার বেয়ানদের সঙ্গে খানিকক্ষণ বসে গল্পটল্প কর।

ভুবনময়ী বললেন, 'হুঁ, গল্প করবারই সময় আমার। যেদিকে না দেখব, সেদিকেই তো গোলমাল।' বলে নিজেই তরকারী কুটতে বসে গেলেন ভুবনময়ী।

বৈদ্যনাথের শাশুড়ীকে ডেকে বললেন, 'আসুন বেয়ান, এখানে বসে গল্প করি।'

ফলে হেমবালাকেও আর একখানা বঁটি নিয়ে বসতে হয়।

কিন্তু বেশিক্ষণ স্থির থাকতে পারেন না ভুবনময়ী। খানিকবাদেই উঠে চলে আসেন রান্নাঘরে। এ ঘরের দেখাশোনার ভার নিয়েছেন কনকলতা। ভুবনময়ী গিয়ে বলেন, 'বউমা, অন্নর নাতি দুটিকে এবার বসিয়ে দাও। ওরা শুকনো মুখে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

অন্নপূর্ণা ভুবনময়ীর খুড়তুতো বোন।

কনকলতা একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'এই তো ছেলেমেয়েরা সবাই খেয়ে গেল। তখন যদি এসে বসত।'

ভুবনময়ী বললেন, 'এসে বসত! ওরা কি কখনও এ বাড়িতে এসেছে যে দলের সঙ্গে বসে খাবে। তোমারই উচিত ছিল ডাক-খোঁজ করে বসানো। আমার আপন বোন নেই। অন্ন আমার আপন বোনের চেয়েও বাড়া। ছেলেবেলায় একসঙ্গে কত খেলেছি। দেখলে কেউ বলতে পারত না মায়ের পেটের বোন নয়।'
খানিকবাদে কলাপাতার ঠোঙায় করে কিছু ফুল নিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকল বিজু। আর কাউকে সামনে না পেয়ে নারায়ণ পুজোর জন্যে ভুবনময়ী বিজুকেই বলেছিলেন ফুল আনতে। নাতির হাত থেকে ফুলগুলি তুলে রাখতে রাখতে ভুবনময়ী বললেন, 'দাদা আমার লক্ষ্মী। যা বলছি তাই করছে।'
হেমবালার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'জানেন বেয়ান, এ ছেলেকে ঘরের কোণ থেকে অন্য সময় কেউ নড়াতে পারে না। বই নিয়ে পড়ে আছে তো আছেই। কিন্তু প্রীতির বিয়েতে আমার বিজুই সবচেয়ে বেশি খাটছে। আর যাদের নিজের বোনের বিয়ে তাদেরই পাত্তা নেই। প্রীতিকে বিজু ভারি ভালোবাসে।
হেমবালা বললেন, 'বাসবে না কেন। ভালোবাসারই যে সম্পর্ক।'
বিজু চলে যাচ্ছিল, কিন্তু ভুবনময়ী তার হাত ধরে টেনে বললেন, 'উঁহু গেলে হবে না। বোস এখানে, এই বুড়ীদের কাছে বোস। আরে তাতে লাভ আছে। রাঙা বউ জোগাড় করে দিলে আমরাই দেব। বাবা-মায়ে সহজে দেবে না। বেয়ান, আমার জন্যে একটি মেয়ে দেখে দিন। খুব যেন সুন্দরী হয় দেখতে। আসছে বোশেখ জ্যৈষ্ঠেই একটি নাতবউ ঘরে আনা চাই আমার।'
হেমবালা বলেন, 'বলেন কি, এত তাড়াতাড়ি। বিয়ের কি বয়স হয়েছে নাকি বিজুর।'
ভুবনময়ী বললেন, 'হয়েছে বেয়ান, হয়েছে। মুখচোরা মানুষ আর বর্ণচোরা আম এদের চেনা বড় শক্ত। বিজুর একটি বিয়ে দিতে পারলে আমি নিশ্চিন্ত হই।' বিজু চমকে উঠে ভুবনময়ীর দিকে তাকাল।

এ কথার মানে কি, ঠাকুরমা কি কিছু টের পেয়েছেন? পেয়ে যদি থাকেন তো পেয়েছেন। তাতে বিজুর আর কিছু এসে যায় না।
ভুবনময়ী সান্ত্বনার ছলে বললেন, 'আহা, ছেলেবেলা থেকে এক সঙ্গে খেলেছে বেড়িয়েছে। ছাড়াছাড়ির সময় মন খারাপ হয় না? নিশ্চয়ই হয়। এই যে আমার জেঠতুতো ভাই। এক-অন্নে ছিলাম আমরা ঠিক আপন ভাইবোনের মত। ব্যস, বিয়ের পরদিন, যখন শ্বশুরবাড়ি রওনা হলাম, দাদার দিকে তাকিয়ে আমি কাঁদি, আমার দিকে তাকিয়ে দাদা চোখের জল ছেড়ে দেয়। আর এখন। ন'মাসে ছ'মাসেও একবার দেখা হয় না। দুনিয়ার এই নিয়ম।'
বৈরাগ্যের ভঙ্গিতে একটু দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন ভুবনময়ী। তারপর নাতির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'অবশ্য তোদের তা হবে না। আমাদের, মত তো আর সাত সমুদ্দুর তের নদীর ব্যবধান থাকবে না। বিয়ের-পর আমি শহরের শ্বশুর বাড়িতে চলে এলাম, দাদা রইল গাঁয়ে। টাকা-পয়সার জোর ছিল না। ইচ্ছে করলেও আসতে পারত না। কিন্তু এদের তো আর তা হবে না বেয়ান, এরা কত যাবে আসবে, খাবে দাবে! ভগ্নীপতি তো ইয়ার বন্ধুর মত। কি বলেন বেয়ান?'
হেমবালা বললেন, 'তা তো ঠিকই।'
ভুবনময়ী বললেন, 'আশ্চর্য নিয়ম দুনিয়ার। নিজের ঘরের মেয়েকে পরের ঘরে পাঠাতে হয়। পরের ঘরের মেয়েকে আনতে হয় আপন ঘরে।'
হেমবালা হেসে বললেন, 'তা তো হয়ই। কিন্তু আপনার যদি সেটা পছন্দ না হয় নাতনীকেই নাতবউ ক'রে রাখুন না।'
ভুবনময়ী হেসে বললেন, 'সে নিয়ম যদি থাকত বেয়ান—'
বলেই থেমে গেলেন ভুবনময়ী। একটা যেন দীর্ঘশ্বাস চাপলেন।
বিজু আর দাঁড়াল না। উঠে চলে গেল নিজের ঘরে। সিঁড়ির মুখে দেখল একদল মেয়ের সঙ্গে অণিমা প্রীতিকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করছে।

বিজুকে দেখে অণিমা বলল, 'প্রীতি কয়েকদিন ধরে ভারি লক্ষ্মী হয়েছে দাদা। যে যা বলছে তাই শুনছে। আসলে আগের অনিচ্ছা আর একগুঁয়েমি ছিল লোক-দেখানো। ভিতরে ইচ্ছেটা পুরোপুরি।'
বিজু পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে মৃদু হেসে বলল, 'হুঁ।'
প্রীতির ইচ্ছা অনিচ্ছার খবর তার জানতে বাকি নেই। দুজনের মধ্যে বোঝাপড়া হয়ে গেছে। বাইরের আচার অনুষ্ঠানে কেউ আর কোন অবাধ্যতা প্রকাশ করবে না। সকলের কথা শুনতে সবাইকে মেনে চলবে। তারপর সেই চরম মুহূর্তে সব অমান্য করবে।
প্রথম দিনকয়েক ভারি ইতস্তত করেছে বিজু। বলেছে, 'থাক প্রীতি, দরকার নেই ওসব।'
প্রীতি বলেছে, 'তোমার দরকার না থাকতে পারে, কিন্তু আমার আছে। তুমি পুরুষ ছেলে। তোমার তো কোন অসুবিধে নেই। কিন্তু যত যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে আমাকে। যাকে ভালোবাসিনে, ভালোবাসতে পারব না তার ঘর করতে হবে, সারাজীবন তার আদর সোহাগ সহ্য করতে হবে। আমি তা কল্পনাও করতে পারিনে। না না আমি তা কিছুতেই পারব না তুমি যদি আমাকে সাহায্য না কর আমি নিজের পথ নিজে দেখব। ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ব, আর না হয় গলায় দড়ি দেব। কেউ আমাকে বাধা দিতে পারবে না।'
বিজু বলেছে, 'না না ওসব করতে যেয়ো না। যা করবার আমরা দুজনে মিলে করব। একসঙ্গে একই পথে—'
প্রীতির বিয়ে হয়ে যাবে, সে অন্য পুরুষের ঘর সংসার করবে এ চিন্তা বিজুর কাছেও অসহ্য। প্রাণ থাকতে তা সে হ'তে দিতে পারবে না। জীবন্ত প্রীতিকে কেউ নিতে পারবে না তার কাছ থেকে। ওর শবদেহ, নেয় নিক্। বিজু তা দেখতে আসবে না। তারপর থেকে পরিত্রাণের নিশ্চিত উপায়কে মুঠোয় আনতে চেষ্টা করেছে বিজু। সাফল্য সহজে আসেনি। বার বার হাত কেঁপেছে,

বুক কেঁপেছে। আর ব্যর্থ হয়ে বিজু ফিরে ফিরে এসেছে। যতবার বিফল হয়েছে প্রীতি তত তাকে উপহাস করেছে, নিষ্ঠুর বিদ্রূপে বিদ্ধ করেছে, 'তোমার দ্বারা কিছু হবে না। তোমার ক্ষমতায় কুলোবে না। তুমি ওসব চেষ্টা ছেড়ে দাও, আমার পথ আমি নিজেই করব।'

কিন্তু বিজু চেষ্টা ছাড়েনি। শেষ পর্যন্ত নিজেদের কলেজের লেবরেটরী থেকে সংগ্রহ করেছে সেই অমোঘ মরণাস্ত্র। এনে প্রীতিকে খবর দিয়েছে। প্রীতি সঙ্গে সঙ্গে উল্লসিত হয়ে বলেছে, 'দাও, আমাকে দাও।'

বিজু জবাব দিয়েছে, 'এখন না পরে। সময়মত দেব।'

সেই সময় এল সন্ধ্যার পর। বোনদের আর সমবয়সী প্রতিবেশিনী-দের হাত এড়িয়ে হঠাৎ এক সময় উঠে এল প্রীতি, বলল, 'তোরা বোস, আমি আসছি এক্ষুণি।'

গঙ্গাজলের ট্যাঙ্কের আড়ালে ছাদের কোণে ফের দেখা হোল দু'জনের। বাড়ি-ভরা লোক গিজ গিজ করছে। যে কোন মুহূর্তে যে কেউ দেখে ফেলতে পারে। তা ফেলুক। আজ আর ওদের ভয় নেই, আজ ওরা নিঃশঙ্ক। সমস্ত শঙ্কা, নিন্দা, শাসনের আজ ওরা ওপারে চলে যাবে।

দু'জনে মুখোমুখি দাঁড়াল। কনের সজ্জা এখনো সম্পূর্ণ হয়নি। প্রীতির সারা মুখ ঘিরে চন্দনের ফোঁটা। সারা গায়ে একরাশ গয়না। কিন্তু পরণের শাড়িখানা বদলায়নি। কোরা, লালপেড়ে, হলুদের ছোপ লাগা আটপৌরে শাড়িখানা এখনো পরে আছে প্রীতি। কিন্তু এই বিচিত্র বেশে ওকে আরো অপরূপ দেখাচ্ছে। বিজুর মনে হোল প্রীতির এমন রূপ সে আর কোনদিন দেখেনি।

বিজুর গায়ে একটা ছিটের হাফ সার্ট, কোঁকড়ানো চুলগুলি উস্কো খুস্কো। মুখের ভাব স্থির গম্ভীর।

প্রীতি মৃদুস্বরে বলল, 'কই দাও তাড়াতাড়ি। এর পর হয়ত আর

সময় পাওয়া যাবে না। কেউ এসে পড়বে।' বিজ্ু পকেটের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে এক মুঠো বেল ফুল তুলে প্রীতির হাতে দিয়ে বলল, 'আর কিছু নাই বা দিলাম।'

প্রীতি বলল, 'ছিঃ, এত ভয় তোমার। তুমি কেন পুরুষ হয়ে জন্মেছ। তুমি যদি না দাও, আমি সব কেড়ে নেব।'

বিজু অগত্যা ছোট একটা শিশি ওর হাতের মুঠোয় গুঁজে দিল।

প্রীতি বলল, 'বাকিটাও দাও আমাকে।'

বিজু বলল, 'না. ওই যথেষ্ট।'

প্রীতি কি বলতে যাচ্ছিল, ছাদের সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে আড়াল থেকে সরে এল প্রীতি। পরমুহূর্তে কনকলতা এসে সামনে দাঁড়ালেন, বললেন, 'ওমা, প্রীতি তুই এখানে, আর সারা বাড়ি ভরে আমরা তোকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। চল নীচে চল। বরযাত্রীরা একদল এসে গেছে। বরও এসে পড়ল বলে।' তারপর ছেলের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন, 'তুই এখানে কি করছিস বিজু ?'

বিজু বলল, 'কি আবার করব।'

কনকলতা বললেন, 'কি আবার করব। কাজের বাড়ি। কত কাজ রয়েছে। উনি তোকে একটু আগেও ডাকাডাকি করছিলেন। আর তুই এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছিস, আচ্ছা আক্কেল। গল্প করবার সময় পরে পাবি। এখন যা। কেন ডাকছেন শুনে আয়। নইলে উনি রাগারাগি করবেন।'

বিজু অদ্ভুত একটু হেসে বলল, 'যাই মা।' প্রীতিও বিজুর সঙ্গে সঙ্গে নেমে গেল। কনকলতা ওর দিকে তাকিয়ে মনে মনে একটা অদ্ভুত বিদ্বেষ বোধ করলেন। মেয়েটা যে বিজুর মাথা খাচ্ছে, তা আর বুঝতে তাঁর বাকি নেই। একথা কাউকে বলাও যায় না, সওয়াও যায় না। এখন ভালোয় ভালোয় বিয়েটা চুকে গেলে জঞ্জাল যায়।

বিয়েটা নির্বিঘ্নেই চুকল। রাত ন'টার মধ্যে বরযাত্রীরা খেয়ে দেয়ে বিদায় নিয়ে গেল। তারপর পঞ্জিকার লগ্নের সঙ্গে কাঁটায় কাঁটায় ঘড়ির সময় মিলিয়ে বিয়ের অনুষ্ঠান আরম্ভ হোল। প্রীতির মনে হতে লাগল, এর যেন আর শেষ নেই। কিন্তু ধৈর্য ধরে আর তাকে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে মাত্র। তারপর সব শেষ হবে। এদের সব উৎপীড়ন অত্যাচারের ওপর ছেদ টেনে দেবে প্রীতি। শুভদৃষ্টির সময় ইচ্ছে ক'রেই প্রীতি রণজিতের দিকে তাকাল না। লোকটি তার পক্ষে মূর্তিমান অশুভ। ওর সঙ্গে দৃষ্টিবিনিময়ের জীবনে আর প্রয়োজন হবে না প্রীতির।

বাসরের ব্যবস্থা হোল কনকলতার ঘরেই। তিনি নিজেই ভদ্রতা ক'রে প্রস্তাবটি করলেন। বাসন্তী বললেন, 'তোমার অসুবিধে হবে বৌদি। এত বড় একটা ঘর এজন্যে আটকে রাখলে আর সব লোক শোবে কোথায়।'

কনকলতা বললেন, 'কেন তোমার ঘরে শোবে, নীরজার ঘরে শোবে। বাড়ি ভরে এত জায়গা রয়েছে, ছাদ রয়েছে, শোয়ার অসুবিধে হবে কেন। আর যদি হয় তো হোলই বা এক রাত্রের তো ব্যাপার। আমার ঘরেই বাসরের ব্যবস্থা করে দাও ওদের। বেশ খোলামেলা আছে। এখানেই সুবিধে হবে। তোমার ঘর তো জিনিষপত্রে ঠাসা।'

কিশোরী কুমারীর দলে বাসর ঘর ভরে গেল। দিদিমা ঠাকুরমা সম্পর্কিত কয়েকজন প্রৌঢ়াও এসে ঘরের মধ্যে ভিড় করলেন। বিপুল বপু টানতে টানতে একসময় দোরের পাশে এসে দাঁড়ালেন ভুবনময়ী। তাঁর মুখে প্রসন্নতার হাসি।

অণিমা বলল, 'এসো ঠাকুরমা, ভিতরে এসো।' ভুবনময়ী বললেন, 'ভিতরে আসবার বয়স কি আর আমাদের আছে। ভিতরে তোরা আছিস, তোরাই থাক। আমরা দোরের কাছে একটু দাঁড়াতে পারলেই যথেষ্ট।'

অণিমা বলল, 'তা ঠিক। দোরের ভিতর দিয়ে ঢুকতে পারলে তো ঢুকবে।'
অণিমার মামাতো বোনেরা ভালো রবীন্দ্র-সঙ্গীত গায়। খানিকক্ষণ অনুরোধ উপরোধের পর একজন একজন করে গলা খুলল। তাদের গান শেষ হলে অণিমা বলল, 'এবার আপনার একখানা হোক, রণজিতবাবু।'
রণজিত হেসে বলল, 'একখানা কেন, একশখানা শোনাতে রাজী আছি। কিন্তু তার আগে বিশেষ একখানা হোক। প্রথম দিন তো অনুরোধ ক'রে ধমক শুনেছি, আজ যদি অন্য কিছু শুনতে পারি।' বলে মৃদু হেসে আড়চোখে প্রীতির দিকে তাকাল রণজিৎ। কিন্তু রাঙা চেলীপরা প্রীতির মুখে রঙ নেই, হাসি নেই। সে মুখ স্থির গম্ভীর, ভাবলেশহীন।
খানিকক্ষণ ধরে অণিমারা তাকে গান গাইবার অনুরোধ করল। কিন্তু প্রীতি কিছুতেই রাজী হোল না। অণিমারা শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, 'এত লোকজনের মধ্যে ওর বোধ হয় গান শোনাবার ইচ্ছে নেই। ওর যা শোনাবার একজনকেই শোনাবে। আপনার একখানা গান অন্তত আমরা শুনি। বাকি নিরানব্বইখানা আপনি স্ত্রীর জন্যে রাখুন।'
রণজিৎ বলল, 'আপনারা গান জানেন, কিন্তু গণিত জানেন না। একশ থেকে এক মুখে নিলে নিরানব্বই থাকে না, থাকে শূন্য। নিজের ভাগে যা পড়ে পড়ুক আর কারো ভাগে সে শূন্য না পড়লেই হোল।'
রাত বারটার সময় ভুবনময়ী এসে তাড়া লাগালেন, 'তোরা ওঠ এবার। ওদের একটু ঘুমুতে দে।'
অণিমা ঠোঁট টিপে হাসল, 'ওরা বুঝি আজ ঘুমুবে। ঠাকুরমা তুমি সব ভুলে গেছ।'
ভুবনময়ী বললেন, 'তা তো ভুলেইছি। কিন্তু তোর যে সব মনে

আছে। ধরন-ধারন দেখে তাই বা বুঝতে পারছি কই। ওদের রেহাই দে এখন। অনেক রাত হয়ে গেছে।'

আরো কিছুক্ষণ বাদে অণিমারা বিদায় নিল। রণজিৎ পকেট থেকে সিগারেট কেস বের ক'রে একটা ধরাবার আগে বলল, 'তোমার কি কোন অসুবিধে হবে ?'

প্রীতি সংক্ষেপে বলল, 'না।'

রণজিতের এই আনুষ্ঠানিক ভদ্রতায় মনে মনে হাসি পেল প্রীতির। যে সারাজীবনের জন্যে অসুবিধার সৃষ্টি করে রাখল, সে জিজ্ঞেস করছে সিগারেটের ধোঁয়ায় তা অসুবিধে হবে কিনা। আচ্ছা, এখন যদি সব ওকে খুলে বলে প্রীতি তা হ'লে কি হয়। আর খানিকক্ষণ বাদেই যখন সব কিছু শেষ হয়ে যাচ্ছে তখন আর কি ভয় তার। এখন ইচ্ছা করলেই সব বলতে পারে প্রীতি। বলতে পারে এই বিয়ে মিথ্যে। এ বিয়েতে তার মত ছিল না। জোর করে ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে বাধ্য করা হয়েছে। পরিষ্কার বলতে পারে সে আর একজনকে ভালবাসে। আর তার সেই প্রিয়জন, প্রিয়তম জন আছে এই বাড়িতেই। যদি বলে তাহলে কি হয়। নিশ্চয়ই লোকটি আর তাহলে এমন নিশ্চিন্তে বসে বসে সিগারেট টানতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে তাহলে তড়াক করে লাফিয়ে উঠবে। হাত থেকে সিগারেট মাটিতে পড়ে যাবে। কিন্তু থাক, কি দরকার বলে। আহা বেচারা, কত সখ করে বিয়ে করতে এসেছে। ওর এক রাত্রের বাদশাগিরি ভেঙ্গে দিয়ে লাভ কি ?

এই ঘরে বাসরশয্যা পাতায় ভালোই হয়েছে। কারণ, এই শয্যাই তার শেষ শয্যা। আর এ ঘর বিজুর ঘর। আজ রাত্রে বিজু এ ঘরে নেই। কিন্তু ওর স্মৃতিতে ঘর ভরে আছে, মন ভরে আছে প্রীতির। দেয়ালে টাঙানো রয়েছে ওর ফটো। আলনায় ওর জামা কাপড়। এক কোণে বইয়ের র‍্যাক। কাল ভোরে এর সবই থাকবে। শুধু তারা দুজনই থাকবে না। একসঙ্গে দুজনে

মুছে যাবে। কোথায় যাবে কে জানে। কিন্তু যেখানেই যাক্ একসঙ্গে তো যেতে পাবে। ব্লাউজের ভিতরে বুকের কাছে ছোট একটি শিশির অস্তিত্ব অনুভব করল প্রীতি। যে বুক এখনো ধুক ধুক করছে, ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠছে মাঝে মাঝে, খানিক বাদেই তার শেষ হবে, সব যন্ত্রণার অবসান হবে একটু পরে। বিজুর কাছে শুনেছে এ জিনিসের গুণ। এই হাইড্র-সাইনিক এসিডে সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি ঘটবে। পাশের লোকটি কিছু জানতে পারবে না, অস্ফুট কোন আর্তনাদের শব্দ বেরোবে না। সেদিক থেকে কোন ভয় নেই। এখন লোকটি ঘুমিয়ে পড়লেই হয়।

কিন্তু রণজিতের ঘুমোবার কোন লক্ষণ নেই। স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করার জন্যে যেন ও উৎসুক হয়ে রয়েছে। বার বার নড়েচড়ে প্রীতির মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করছে। এবার শুধু অঙ্গভঙ্গি নয় কথাও বলল রণজিৎ, 'তোমার শরীর কি খুব খারাপ লাগছে?'
প্রীতি মুখ না ফিরিয়েই বলল, 'হুঁ।'

রণজিৎ সহানুভূতির স্বরে বলল, 'শরীরেরই বা দোষ কি। বিয়ের নামে আচার নিয়মের যা অত্যাচার সহ্য করতে হয় কদিন ধরে। কিন্তু তুমি কি সত্যিই উপোস করে আছ নাকি? মুখ দেখে মনে হচ্ছে খুব ক্ষিদে পেয়েছে তোমার।'

প্রীতির এবার হাসি পেল, 'তাই নাকি?'
রণজিৎ বলল, 'তাছাড়া কি, যেভাবে ছটফট করছ ক্ষিদে ছাড়া কেউ তা করে না।'
প্রীতি চুপ করে রইল।

রণজিৎ বলল 'তা এক কাজ কর। তোমাদেরই তো বাড়ি ঘর— কোথায় কি আছে না আছে নিশ্চয়ই জানো। বোনদের ডেকে যদি ব্যবস্থা করতে পার তো ভালোই, না হলে তো আপন হাত জগন্নাথ আছেই।'

রণজিতের কথার ভঙ্গিতে প্রীতি এবারও একটু হাসল, কিন্তু কোন জবাব দিল না।

রণজিৎ বলল, 'লজ্জা করে লাভ নেই। উঠে চলে যাও। এ ঘরে তো খাবার মত কিছু দেখছিনে। এক আমার পকেটে সিগারেট ছাড়া। কিন্তু তা কি তোমার রুচবে। অভ্যেস আছে?'

প্রীতি হাসি চেপে বলল, 'না। তোমার ব্যস্ত হতে হবে না, আমার ক্ষিদে পায়নি।'

রণজিৎ বলল, 'তবে কি পেয়েছে?'

প্রীতি বলল, 'ঘুম, ভয়ঙ্কর ঘুম পেয়েছে।'

রণজিৎ বলল, 'একেবারে ভয়ঙ্কর ঘুম, বল কি?'

প্রীতির কাছ থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

রণজিতের মনে হোল হয়ত মেয়েটি একটু বেশি লাজুক। একটু বেশি রকম আড়ষ্টতা আছে। সাহেবী ভদ্রতা করে যত বেশি এই আড়ষ্টতাকে প্রশ্রয় দেবে রণজিৎ তত ঠকবে, বন্ধুদের সুপরামর্শ তার মনে পড়ল। বরং এ ব্যাপারে একটু গ্রাম্য হওয়া ভালো। যেমন করেই হোক মেয়েটির অনিচ্ছা আর অসহযোগিতা তাকে ভাঙতেই হবে। পুরোহিতের ছাড়পত্র যখন হাতে আছে তখন আর ভাবনা কি।

রণজিৎ বলল, 'কিন্তু যত ভয়ঙ্কর ঘুমই হোক আজ রাত্রে একা একা তুমি ঘুমুতে পারবে না। আজকের নিয়ম তা নয়।'

প্রীতি বলল, 'আজকের নিয়মটা তাহলে কি?'

রণজিৎ বলল, 'দুজনে একসঙ্গে ঘুমুতে হয় আজ।'

একসঙ্গে ঘুমুতে হয়। একসঙ্গেই তো ঘুমুবে প্রীতি। চিরদিনের জন্যে ঘুমুবে। সে ঘুম রণজিতের সঙ্গে! কিন্তু লোকটি যদি না ঘুমোয় তাহলে তো সেই মহাঘুমের ব্যবস্থা করা যায় না। এদিকে রাত যে ক্রমেই বেশি হচ্ছে। রাত যে ভোরের দিকে চলেছে। প্রীতি বলল, 'বেশ তো তুমি ঘুমোও না।'

রণজিৎ বলল, 'ঘুমটা তো মুখের কথায় আসে না, আসে চোখে! তার জন্যে সাধ্য-সাধনার দরকার হয়। চুলের মধ্যে কেউ একটু হাত বুলিয়ে দিলে আমি খুব তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ি। দাওনা একটু।'

হঠাৎ এগিয়ে এসে রণজিৎ ওর হাত ধরল, 'তুমি অমন করছ কেন বল তো? এমন কেউ করে না। তোমার মনে কি কোন অশান্তি আছে? তোমার কি হয়েছে আমাকে সত্যি করে বল।'

এই সুযোগ। এই মুহূর্তে প্রীতি বলতে পারে। বলতে পারে, আমাকে মুক্তি দাও। কিন্তু বলে কি কিছু লাভ হবে? তা ছাড়া কেন মিছামিছি অন্যের কাছে সে মুক্তিভিক্ষা করতে যাবে। নিজের উপায় তো ওর নিজের কাছেই আছে। কিন্তু লোকটিকে আগে ঘুম পাড়ানো দরকার। নইলে সব ভেস্তে যাবে।

মন স্থির ক'রে ফেলে প্রীতি। ঘরের উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলো নিবিয়ে দিল। এক কোণে ক্ষীণশিখায় নিবু নিবু ভাবে জ্বলতে লাগল পিতলের পিলসুজে মঙ্গল-দীপ।

প্রীতি এগিয়ে এসে রণজিতের মাথার কাছে বসল, তারপর তার ঘন কালো চুলের মধ্যে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, 'ঘুমোও।'

রণজিৎ প্রথমে ওর হাতখানা নিজের মুঠির ভিতরে চেপে ধরল, তারপর জোর করে ওকে বুকের কাছে টেনে নিল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে ঘুমিয়ে পড়ল রণজিৎ। নানাভাবে প্রীতি পরীক্ষা করে দেখল, হ্যাঁ সত্যিই ঘুমিয়েছে। এবার তার নিজের ঘুমের ব্যবস্থা করতে হবে।

বুকের ভিতর থেকে সেই ছোট শিশিটা বের করল প্রীতি। এই একটু আগে একটি সম্পূর্ণ অপরিচিত পুরুষ তাকে বুকের সঙ্গে চেপে ধরেছে, চুমু খেয়েছে জোর করে। লোকটি নির্লজ্জ বর্বর কিন্তু ভারি দুঃসাহসী। কোন দ্বিধা সংকোচের ধার ধারে না। প্রীতিকে মুখ বুজে সব মানতে হয়েছে। প্রীতি ইচ্ছা করে ওর

সব অত্যাচার সহ্য করেছে শুধু পথের বাধা দূর করবে বলে, শুধু ওকে তাড়াতাড়ি ঘুম পাড়াবে বলে। কিন্তু আশ্চর্য সাহস লোকটির, আশ্চর্য শক্তি। বিজুর যদি এরকম সাহস থাকত। তাহলে প্রীতিকে অকালে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হোত না। ভারি সুন্দর পৃথিবী, মধুর পৃথিবী। এখান থেকে কি সহজে কারো যেতে ইচ্ছা করে। কিন্তু ইচ্ছা না করলেও উপায় নেই। যেতেই হবে প্রীতিকে। শুধু যাওয়ার আগে আর একবার পৃথিবীকে প্রীতি দেখে নেবে। প্রীতি আস্তে আস্তে জানালার কাছে এসে দাঁড়াল। যতদূর চোখ যায় অন্ধকারে বাড়িগুলি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওপরে ছড়ানো আকাশ। তাতে চাঁদ নেই, অসংখ্য তারা জ্বল জ্বল করছে। কি সুন্দর তারা। কি সুন্দর আকাশ। প্রীতি কোনদিন এ আকাশ আর দেখবে না। আচ্ছা, বিজু এখন কি করছে। সেও কি এমন দ্বিধা করছে, এমন ক'রে সংশয়ে দুলছে। তারও কি কষ্ট হচ্ছে পৃথিবী ছেড়ে যেতে। নিশ্চয়ই তাই। বিজু যা দুর্বল, বিজু যা ভীরু তাতে কিছুতেই সে খেতে পারবে না, খেতে নিশ্চয়ই সে ভয় পাবে। ভয় যদি হয়, তাহলে তোমার খেয়ে আর কাজ নেই, তোমার মরে কাজ নেই বিজু। তুমিও তাহলে মরো না, আমিও মরব না। কেন মরব, কোন দুঃখে মরব, কোন লজ্জায় মরব। বিয়ে হয়েছে তো তাতে কি এসে গেল। আমরা অন্য কোথাও পালিয়ে যাব। এ বিয়েকে আমরা স্বীকার করব না। আমরা নতুন ক'রে বিয়ে করব, নতুন সংসার পাতব। তবু মরব না, মরব না।

প্রীতি ফিরে এল নিজের বিছানায়। শিশিটিকে রাখল বালিশের তলায়। বিজুও নিশ্চয়ই খেতে পারেনি, বিজুও নিশ্চয়ই মন স্থির করতে পারেনি। তার আর বিজুর মন তো একই সুরে বাঁধা। একই ভাব আর ভালোবাসায় ভার। প্রীতি যা করছে, বিজুও নিশ্চয়ই তাই করছে। বিজু নিশ্চয়ই মরতে পারবে না, মরবে না। আর সে যদি

না মরে প্রীতিই একা একা মরবে কেন। বোকার মত মরবে কেন। বেঁচে থাকায় যখন এত আনন্দ এত সম্ভাবনা, এত যখন স্বাদবৈচিত্র্য জীবনের। তাহলে কেন সে মরবে কেন তারা মরবে।

বালিশে হাতের তালুতে মাথা রেখে প্রীতি ভাবতে লাগল মরা ছাড়া নিশ্চয়ই উপায় আছে। সেই উপায়ের সন্ধান করতে হবে। ভোরে উঠেই সেই উপায়ের সন্ধান দিতে হবে বিজুকে। মত পরিবর্তন করতে পেরে হঠাৎ ভারি তৃপ্তি বোধ করল প্রীতি। সদ্য মৃত্যুর মুখ থেকে প্রীতি যেন ফিরে এসেছে। নতুন জন্ম, নতুন জীবন লাভ করেছে যেন প্রীতি। নিজেকে সে ধন্যবাদ দিল একটুর জন্যে সে সর্বনাশ করে বসেনি। রাতটা আর একটু কাটুক। ভোর ভোর সময় সে চলে যাবে বিজুর কাছে। গিয়ে বলবে, 'অনেক বোকামি হয়েছে, আর নয়। চল পালাই। তারপর যা হয় হবে, যে যা বলে বলবে। আমরা না খেয়ে মরব সেও ভালো, কিন্তু বিষ খেয়ে মরব না।'

রণজিতের হাতঘড়ির মৃদু শব্দ কানে আসছে। প্রীতি নিমেষ গুণতে লাগল কতক্ষণে রাত ভোর হবে।

দুর্বোধ্য একটা গোলমালের শব্দে প্রীতির ঘুম ভেঙে গেল। ঘরে তখন রোদ এসে পড়েছে। বাড়ির সমস্ত লোকজন যেন ক্ষেপে গিয়ে হঠাৎ হৈ চৈ ছুটোছুটি আরম্ভ করেছে। ব্যাপার কি। চোখ রগড়াতে রগড়াতে বিছানায় উঠে বসল প্রীতি, নিজের মনেই বলল, 'হোল কি।'

প্রথমে বৈদ্যনাথেরই চোখে পড়ল।

ভোরে উঠে ছাদের আলসের ওপর সারি সারি সাজানো ফুলের টবগুলিতে জল দিতে গিয়েছিলেন বৈদ্যনাথ। হঠাৎ চোখে পড়ল গঙ্গাজলের ট্যাঙ্কের পিছনে কে যেন শুয়ে আছে। আরও দু'পা এগিয়ে গেলেন তিনি। বিজুকে দেখতে পেয়ে বললেন, 'হুঁ, যা ভেবেছিলাম তাই। তুমি ছাড়া এমন চমৎকার জায়গায় আর কে এসে শোবে। ওঠ, এই বিজু ওঠ।' আর একটু গলা চড়ালেন বৈদ্যনাথ।

কিন্তু খালি একটা মাদুরের ওপর বিজু পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে তো আছেই।
'এত করে ডাকছি, তোর কি কানেই যাচ্ছে না! কি আশ্চর্য, মরণ ঘুমে পেয়েছে নাকি তোকে?' অসহিষ্ণু বৈদ্যনাথ এবার ছেলের হাত ধরে টান দিলেন। কিন্তু আশ্চর্য, অবাধ্য ছেলে তবুও উঠে এল না, তবুও সাড়া দিল না। বৈদ্যনাথ ওকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ছেড়ে দিতেই ও ধপাস করে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বৈদ্যনাথের সর্বাঙ্গ যেন ঘেমে উঠল। হৃদপিন্ডের স্পন্দন থেমে গেল যেন। মুখ থেকে অস্ফুট একটা আর্তনাদ বেরোল, 'ওরে বিজু বুঝি সর্বনাশ করেছে রে। তোরা এদিকে আয়।'
মিনিট কয়েকের মধ্যেই বাড়ির সমস্ত লোক এসে ছাদে জড়ো হোল। চিৎকার চেঁচামেচিতে বাড়ি ভরে গেল।
ভুবনময়ী সিঁড়ি বয়ে ওপর উঠতে পারলেন না। নিচে থেকেই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, 'ওরে কি হয়েছে তোরা আমাকে বল। আমাকে বল। আমাকে নিয়ে চল ওপরে।'
কিন্তু কেউ তাঁকে হাত ধরে ওপরে নিয়ে গেল না, কেউ তাঁকে স্পষ্ট করে কোন কথা বললও না।
তবু ব্যাপারটা মোটেই অস্পষ্ট রইল না। অরুণই গিয়ে পাড়ার ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এল। তিনি পরীক্ষা করে বললেন, 'শেষ রাত্রে মৃত্যু হয়েছে।'
বিজুর গায়ে সেই ছিটের হাফ সার্ট। ঝুল পকেটে ছোট একটি শূন্য শিশি। আর বুক পকেটে একটুকরো কাগজ। তাতে স্পষ্ট সুন্দর অক্ষরে লেখা 'আমার মৃত্যুর জন্য আমার দুর্বলতাই দায়ী।'
খানিক বাদে পুলিশ এসে সেই চিঠি আর শিশি দুইই দখল করল। গোলমাল গণ্ডগোলের মধ্যে প্রীতি এসে একবার দাঁড়াল ছাদের কাছে। বাড়ির আর সব মেয়েদের মত বিজুর মৃতদেহ দেখে সে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল না। ঝাঁপিয়ে পড়ল না ওর শবদেহের ওপরে। শুধু

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েই রইল। যেন শ্বেতপাথরের একখানি প্রতিমূর্তি। পরমুহূর্তেই প্রীতি তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল। ঘরে গিয়ে বালিশের তলায় পাগলের মত কি যেন খুঁজতে লাগল প্রীতি। রণজিৎ যে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিল তা সে লক্ষ্যই করে নি। ঘরে যে আর কেউ আছে তা সে প্রথম টের পেল রণজিতের কথা শুনে। সিগারেটের টুকরোটা জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রণজিৎ স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল 'শিশিটা ওখানে নেই। আমি নর্দমায় ফেলে দিয়েছি।'
প্রীতি অস্ফুট স্বরে বলল, 'তুমি ফেলে দিয়েছ! কেন ফেললে?'
রণজিৎ ওর দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত একটু হাসল, 'তাই তো ভাবছি, কেন ফেললাম।' তারপর আর একটা সিগারেট ধরাল।
বাড়ি ভরে কান্নার রোল উঠেছে। সকলের কান্না ছাপিয়ে যাচ্ছে কনকলতার বিলাপ, 'সর্বনাশী রাক্ষুসী আমার ছেলেকে খেয়ে এখন সেজেগুজে শ্বশুরবাড়ি চলল। ভগবান তুমিই এর বিচার করো ভগবান'—কনকলতার বউদি এসে কাছে বসলেন, বললেন, 'ছি ছি ছি, চুপ কর ঠাকুরঝি, চুপ করো। কিন্তু কনকলতা চুপ করলেন না, চুপ করতে পারলেন না।
নমো নমো করে বাসি বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ করা হোল্। ঘনিষ্ঠ আত্মীয় যে দু-একজন ছিলেন তাদের তাড়াতাড়ি বিদায় করে দিলেন বিপিনবাবু, নিজে জল স্পর্শ করলেন না। গম্ভীর স্বরে বললেন, 'আমাদের যাত্রার আয়োজন করে দিন অবনীবাবু। আর বেশি বিলম্ব করা তো সঙ্গত হবে না।'
অবনীমোহন বললেন, 'না, আর বিলম্ব কি।'
একদিকে বিজুর শবযাত্রার আয়োজন চলতে লাগল। আর একদিকে প্রীতির শ্বশুরবাড়ি যাত্রার উদ্যোগ আয়োজন করতে লাগলেন আত্মীয় কুটুম্বিনীরা।
থানার সঙ্গে জানাশোনা ছিল অবনী বৈদ্যনাথের। ইনস্পেক্টরকে কিছু

দক্ষিণান্ত করবার পর বিশেষ কিছু গোলমাল হোল না। তা ছাড়া বিজুর স্পষ্ট স্বীকারোক্তি তো রয়েইছে।

বিজুর শবদেহ নিয়ে শ্মশানযাত্রীরা আগে বেরিয়ে গেল। তার খানিক বাদে পুত্র পুত্র-বধূকে নিয়ে বিপিনবাবু মোটরে উঠে বসলেন।

বাসন্তী চোখ মুছতে মুছতে রণজিতের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওর ভালো-মন্দ ভবিষ্যতের সব ভার তোমার ওপর রইল বাবা, তুমি ওকে দেখো।'

রণজিৎ কোন কথা বলল না, শুধু মাথা নাড়ল। প্রীতির দেহে যেন প্রাণ নেই। ওর স্বাধীন কোন ইচ্ছা নেই। একটা নিষ্প্রাণ পুতুলের মত অন্য পাঁচজনের নির্দেশে ও চলাফেরা করছে। তাদের নির্দেশেই, জমকালো শাড়ি গয়নায় সেজে সিঁথিতে সিন্দুর মেখে প্রীতি গাড়িতে উঠে বসল। একটু দূরে পাশাপাশি গম্ভীর মুখে বসে রয়েছে রণজিৎ আর তার বাবা। দুজনের মুখই গম্ভীর। দুজনের দেহই যেন পাথরে তৈরী। এরা কে? প্রীতি কি এদের চেনে? এদের কারো সঙ্গে কি তার কোন পরিচয় আছে? কিংবা কোন দিন কোন পরিচয় হবে?

ভাড়াটে ট্যাক্সি একটা অজানা অপরিচিত শহরের ভিতর দিয়ে ডাইনে বাঁয়ে বেঁকে বেঁকে কোথায় চলেছে কে জানে। ড্রাইভারটাকে মনে হচ্ছে জহল্লাদের মত। শুধু একটি জহল্লাদ নয়, আরো দু দুজন জহল্লাদ তার পাশে বসে রয়েছে। সবাই মিলে তাকে কি বধ্যভূমিতে নিয়ে চলেছে? নিক তাই নিক। সে নিজে তো মরতে পারল না, অন্য সবাই তাকে মেরে ফেলুক। কিন্তু তা কি কেউ মারবে? তাকে কি মারতে দেবে? সারা জীবন ধরে সে তিলে তিলে দগ্ধ হবে তবু মরবে না, সবাই তাকে তিলে তিলে দগ্ধ করবে তবু মারবে না। বিজুর মত সেও শ্মশানে চলেছে, বিজুর চিতা নিববে, কিন্তু তার চিতা জীবনে নিববে না। বিজু মরে বাঁচল আর সে সারা জীবন বেঁচে মরে থাকবে। বিজুর জন্যে শোক নয়, শোকের ক্ষমতা এই মুহূর্তে তার লোপ পেয়েছে। নিজের পরিণাম আর ভবিষ্যৎ ভেবেই আতঙ্কিত

হয়ে উঠল প্রীতি। এ কোথায় চলেছে সে? কাদের কাছে কাদের সংসারে চলেছে? তারা তার সব কলঙ্ক সব অপবাদের কথাই এতক্ষণে টের পেয়েছে। তাদের চোখে প্রীতির কোন দাম নেই, কোন মর্যাদা নেই, তাদের মনে প্রীতির জন্যে কোন ক্ষমা, কি সহানুভূতি নেই নিশ্চয়ই। তাহলে প্রীতি এদের সঙ্গে কোথায় চলেছে, কেন চলেছে? নিমতলা ঘাট থেকে বিজুর শেষ-কৃত্যের জন্য পুরুষেরা সবাই বেরিয়ে গেছেন। অরুণই শুধু শ্মশানে যায় নি। বাড়ি আগলাবার ভার তার ওপর। শোকার্ত মেয়েদের সান্ত্বনা দেওয়ার দায়িত্ব সবাই তার ওপর দিয়ে গিয়েছিলেন। সে দায়িত্ব পালন করবার কিছুমাত্র চেষ্টা বৃথা। কোন মোহমুদ্গর আবৃত্তি করে মা, মামীমা, দিদিমার এই সদ্যশোকের উপশম ঘটানো যাবে না। সময় ছাড়া এর আর কোন সান্ত্বনা নেই, বিস্মরণের আর কিছুমাত্র পথ নেই। সময়ই সব সারাবে সব ভুলাবে। কিন্তু এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে এই অশ্রান্ত কান্না অনন্তকাল ধরে চলবে, এই অবিরল শোকাশ্রু কোনদিন শুকাবে না। অরুণের একবার ইচ্ছা হোল বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোথাও চলে যায়। মামীমার বিলাপ তার কাছে অসহ্য লাগছে। আর এতো সহজ মৃত্যুর সহজ শোক প্রকাশ নয়। প্রত্যেকটি খেদোক্তির সঙ্গে বাসন্তী আর প্রীতিকে কুৎসিতভাবে জড়িয়ে দিচ্ছেন কনকলতা। নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে অভিশাপ দিচ্ছেন। শান্ত নিরীহ বিজু বড় বীভৎসভাবে মরছে আর তার চেয়েও বীভৎসতর অবস্থায় রেখে গেছে সবাইকে। এভাবে মরল কেন বিজু? তার লেখা স্বীকৃতিটুকু অরুণের আর একবার মনে পড়ল। 'আমার মৃত্যুর জন্যে আমার দুর্বলতাই দায়ী।' এ দুর্বলতা কিসের? এ কি ওর মন স্থির করতে না পারার দৌর্বল্য না কোন মেয়েকে ভালোবাসাকেই শেষ পর্যন্ত দুর্বলতা বলে চিনে গেছে, স্বীকার করে গেছে বিজু? প্রেম কি তাহলে শুধু শক্তিমানের জন্যে? দুর্বল পুরুষকে কি তা শুধু দুর্বলতর করে? অস্তিত্ব পর্যন্ত মুছে নিয়ে তার শোধ নেয়? প্রেম সম্বন্ধে এই শিক্ষাই কি

দিয়ে গেল বিজু? তার শেষ শিক্ষা?

আশ্চর্য বিজু নামে একটি ছেলে এই বাড়িতে ছিল, তা কদাচিৎ অরুণের চোখে পড়েছে, তার অস্তিত্ব কদাচিৎ অরুণের অনুভূতিকে ছুঁয়ে গেছে। একটি লাজুক মুখচোরা ভালো ছেলে ঘরের কোণে আত্মগোপন করে থাকত, আর ইদানীং প্রীতির সঙ্গে কথা বলত। এ ছাড়া অরুণের কাছে বিজুর অন্য কোন সত্তা ছিল না। এর চেয়ে তার কাছে বেশি অস্তিত্ববান ছিল না বিজু। শুধু অরুণের কাছেই বিজু ছিল ক্ষীণ অস্তিত্বের লোক। কিন্তু আজ মৃত্যুর আঘাতে সবাইকে চকিত করে দিয়েছে বিজু। বাড়ি ভরে পাড়া ভরে সকলের মুখেই আজ তার কথা। কেউ আর তাকে ভুলতে পারছে না। তার সম্বন্ধে উদাসীন থাকতে পারছে না। সকলেই তার সম্বন্ধে উৎসুক আর কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। মরে গিয়ে হঠাৎ যেন অতিমাত্রায় বেঁচে উঠেছে। এতদিন বেঁচে থেকেই সে যেন মরেছিল আর আজ মরে গিয়ে বেঁচেছে।

বিকেলের দিকে অরুণ নিচে নামল। বাড়িটা এতক্ষণে খানিকটা শান্ত হয়েছে। থেমে গেছে চিৎকার চেঁচামেচি। কনকলতা তাঁর নিজের ঘরে মেঝের ওপর মূর্ছিতার মত পড়ে আছেন। ছোট ছেলে-মেয়েগুলি ঠিক যেন এক একটি মোমের পুতুলের মত। তাদের মুখে কথা নেই হাসি নেই কান্না নেই। অঙ্গভঙ্গিতে স্বাভাবিক চাঞ্চল্য নেই। মারাত্মক কিছু একটা যে ঘটেছে তা তারা সবাই বুঝতে পেরেছে, কিন্তু কী ঘটেছে সে সম্বন্ধে তাদের পরিষ্কার কোন ধারণা এখনো হয়নি।

নীরজা আর তার বউদি কোন রকমে ডাল ভাত নামিয়ে সকলের খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে। বিবাহ বাসরে যে সব আত্মীয় কুটুম্বেরা এসেছিলেন এই শ্মশানপুরী থেকে তারা প্রায় সবাই আস্তে আস্তে সরে পড়েছেন। যাঁরা আছেন, তাঁদের অস্তিত্বও টের পাওয়ার জো

নেই। বাড়িটা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যেন এক ভূতুড়ে বাড়িতে পরিণত হয়েছে।
দিদিমার ঘরের সামনে এসে একটু থেমে দাঁড়াল অরুণ। আশ্চর্য, রাধাকৃষ্ণের আসনের সামনে বসে গীতা পড়ছেন ভুবনময়ী। জলচৌকির ওপর রাধাকৃষ্ণের একখানা বাঁধানো পট। তার সামনে একখানা সুলভ সংস্করণের পকেট গীতা। সচন্দন তুলসী পড়ে তার ওপরের মলাটটা বিবর্ণ হয়ে গেছে। সেই গীতাখানা আজ আবার তুলে নিয়েছেন ভুবনময়ী। স্বামীর মৃত্যুর পর প্রথম কিছুদিন নিয়মিত পড়তেন। শেষের দিকে পাঠ আর হোত না, গীতার ওপর তুলসী দিয়েই কর্তব্য শেষ করতেন আজ ফের পাঠে মন দিয়েছেন।
খানিকক্ষণ আগেই ভুবনময়ীর সবিলাপ উচ্চ কান্নার শব্দে সারা বাড়ি মুখর হয়ে উঠেছিল। দু' একজন আত্মীয়া আর প্রতিবেশিনী তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করে ফিরে গেছেন। এখন নিজেই নিজেকে সান্ত্বনা দিতে শুরু করেছেন ভুবনময়ী।
অরুণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল। অল্প শিক্ষিতা অশুদ্ধ উচ্চারণে গীতা আবৃত্তি করে যাচ্ছেন ঃ
বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরানি।
তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥
কিন্তু জীর্ণ বাস তো ভুবনময়ীর নিজের। বিজুর দেহবাস তো জীর্ণ হয়নি, জীর্ণ ছিল না। তবু কেন সে তা ত্যাগ করে গেল? নাকি ভিতরে ভিতরে নিজের জীর্ণতার কথা টের পেয়েছিল বিজু। জীর্ণ মন জীর্ণ দেহ তার অস্তিত্বকে অসহনীয় করে তুলেছিল? অরুণ আত্মাকেও বিশ্বাস করে না, আত্মার নবদেহ ধারণেও নয়। তবু গীতার এই কয়েকটি শ্লোক তার বেশ ভালো লাগে। শ্লোক কয়েকটি বেশ শ্রুতি-মধুর! ভারি কবিত্বপূর্ণ। কোন ধর্মে তার বিশ্বাস নেই, কিন্তু কাব্যধর্মে প্রীতি আছে।

শ্মশান থেকে বৈদ্যনাথরা ফিরলেন সন্ধ্যার পরে। সকলেরই ভিজে

কাপড়, ভিজে গামছা। ভুবনময়ী এগিয়ে এসে ছেলের দিকে চেয়ে বললেন, 'দাঁড়া, আগেই ঘরে ঢুকিসনে। লোহা আর আগুন ছুঁয়ে নে। অবনী অতুল, সবাই একবার করে লোহা আর আগুন ছোঁও তোমরা।'

যে গেছে সে তো গেছেই। যারা আছে তাদের মঙ্গল বিধানের জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ভুবনময়ী।

একটু বাদে বৈদ্যনাথ শুকনো কাপড় পরে ঘরে ঢুকলেন, তারপর শোকার্তস্বরে ডাকলেন, 'মা'। এতক্ষণ সম্পূর্ণ অবিচল ছিলেন বৈদ্যনাথ। ভাগ্নীর বিয়ের অনুষ্ঠানের মত ছেলের শ্মশানকৃত্যেও নিজেই নেতৃত্ব নিয়েছেন। কারো কোন ভুল, ত্রুটি, শৈথিল্য ঘটলে তাকে তিরস্কার করেছেন। সবাই তার দৃঢ়তা দেখে বিস্মিত হয়ে গেছেন। বৈদ্যনাথের চোখে জল আসে নি, গলার স্বর কিছুমাত্র বিকৃত হয়নি। কিন্তু মায়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অকস্মাৎ তাঁর সব বাধ ভেঙে গেল। কোন লজ্জা নেই, আর, কোন সঙ্কোচ নেই, সশব্দে কেঁদে উঠলেন বৈদ্যনাথ, 'মা আমি যে আর থাকতে পারছিনে মা।' মেঝের ওপর বসে আর্তস্বরে ছেলেকে কাছে ডাকলেন ভুবনময়ী। এতক্ষণ নিজে কেঁদেছেন এবার ছেলের কান্না থামাতে হবে। মায়ের কোলের মধ্যে শিশুর মত মুখ গুঁজে প্রৌঢ় বৈদ্যনাথ ডুকরে কেঁদে উঠলেন, 'আমি যে আর থাকতে পারছিনে মা। কিছুতেই পারছিনে। আমার বুক যে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে।'

ভুবনময়ী ছেলের পিঠে আলগোছে হাত বুলাতে লাগলেন, 'অমন করিসনে বাবা, অমন করিসনে।'

কতকাল, কত যুগ পরে নিজের ছেলের স্পর্শ যেন পেলেন ভুবনময়ী। তাঁর দুর্বিনীত রূঢ়ভাষী কঠোর স্বভাব ছেলে অসহায় শিশুর মত ফের তাঁর কোলে ফিরে এসেছে। বৈদ্যনাথের চুলে কিছু কিছু পাক ধরেছে। আর ভুবনময়ীর প্রায় সব চুলই পেকে গেছে। ছেলের কাঁচা

পাকা চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে ভুবনময়ী ফের মৃদুস্বরে বললেন, 'অমন করিসনে।'

বৈদ্যনাথ কান্না মিশানো স্বরে বললেন, 'আমি তো ভেবেছিলাম মা, আমি অমন করব না। আমি তার জন্যে শোক করব না। সে আমার কুপুত্র। দুশ্চরিত্র, সে কাপুরুষ। সে আমার শোকের যোগ্য নয় মা। সে পৃথিবীর কারোরই শোকের যোগ্য নয়, তবু কেন আমার বুক পুড়ে যাচ্ছে, তবু কেন আমি স্থির থাকতে পারছিনে। মনে হচ্ছে আমার সব শূন্য হয়ে গেছে, আমার সব শূন্য করে দিয়ে সে চলে গেছে।'

ভুবনময়ী আস্তে আস্তে বললেন, 'আবার সব ভরে উঠবে, তোর আবার সব ভরে উঠবে বাবা। তুই অমন করিসনে। তোর কোন দুঃখ থাকবে না। মনে আছে ছেলেবেলায় মেলা থেকে বড় একটা মাটির ঘোড়া তোকে কিনে দিয়েছিলাম। অসাবধানে হাত থেকে কি করে যেন সেটা ভেঙে গেল। মনে আছে তোর? সারাদিন তুই সেই রাঙা ঘোড়া নিয়ে কাঁদলি। আছড়ে আছড়ে ভাঙলি আরো কত খেলনা, আরো কত কাজের জিনিস। সে দিনও ঠিক এই রকমই আমার কোলের মধ্যে মুখ গুঁজে তুই ফুঁপিয়ে কেঁদেছিলি। কিন্তু সেই কান্না কি তোর মনে আছে? সেই মাটির ঘোড়ার দুঃখ কি তোর মনে আছে? এ মাটির ঘোড়ার দুঃখও একদিন যাবে। তুই মনকে শক্ত কর বাবা, বুককে শক্ত কর।'

দিন দুই বাদে কনকলতা শোকশয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। স্বামীকে বললেন, 'আমি এ বাড়িতে একদণ্ডও আর থাকব না, অন্য বাড়ি দেখ। কুঁড়ে হোক, বস্তী হোক যেখানে নিয়ে যাও সেখানে যাব। কিন্তু এ বাড়িতে আর এক মুহূর্ত নয়।'

বৈদ্যনাথ বললেন, 'কেন, আমরা কেন যাব। আমি কোন অন্যায় করিনি। যারা করেছে তারা যাক। তারা এ বাড়ি ছেড়ে পালাক। আমি এক পাও এখান থেকে নড়ব না। আমি শোধ নেব তবে ছাড়ব।'

কনকলতা কাতর স্বরে বললেন, 'কি শোধ নেবে তুমি! শোধ তুমি কেবল আমার ওপরই নিতে পারছ, আর কারো ওপর পারবে না।' তারপর চোখের জল ছেড়ে দিলেন কনকলতা, 'ওগো তোমার শরীরে কি একটুও দয়ামায়া নেই? তুমি কি আমার মনের দিকে কোনদিনও তাকাবে না? চিরজীবন নিজের জেদ আর গোঁয়ার্তুমি নিয়েই থাকবে? এই খালি ঘরে, খালি বাড়িতে আমি যে আর এক মুহূর্তও থাকতে পারছিনে। আমার যে দম আটকে আসছে, বুক ভেসে যাচ্ছে। তোমার দু'টি পায়ে পড়ি, তুমি আমাকে নিয়ে চল, আর কোথাও নিয়ে চল। আমি যে আর টিকতে পারছিনে।'

বলতে বলতে স্বামীর পায়ের কাছে সত্যিই হুমড়ি পড়লেন তিনি। বৈদ্যনাথ স্ত্রীর হাত ধরে টেনে তুললেন। তার শোকশীর্ণ মুখের দিকে একটুকাল তাকিয়ে কোমল স্বরে বললেন, 'আচ্ছা, আমরা অন্য বাড়িতেই যাব।'

সপ্তাহখানেক পরে নতুন বাসা ঠিক হোল কনকলতাদের। কেবল বাড়িই ছাড়লেন না বৈদ্যনাথ, পাড়াও ছাড়লেন। কালীঘাটে হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রীটে দু'খানা ঘর পাওয়া গেল। একতালা পুরোন বাড়ি। তার পিছনের দিকের দু'খানা ঘর। ভাড়া পঞ্চাশ টাকা।

অবনীমোহন একবার বললেন, 'ধীরে সুস্থে ভালো বাড়ি দেখে উঠে গেলেই হোত। ঘর তো শুনছি ভালো নয়, এদিকে ভাড়াও বেশি।'

বৈদ্যনাথ শুধু বললেন, 'হুঁ।'

তিনি যা করবেন তা করবেনই। কেউ নেই তাকে বাধা দেয়।

ভুবনময়ী বলেছিলেন, 'অত দূরে বাসা ঠিক করলি বৈদ্য। কাছে পিঠে কোথাও পেলিনে?'

বৈদ্যনাথ বললেন, 'কাছে পিঠে থাকবার ফল তো হাতে হাতে পেলাম। বেশ তোমার মন যদি যেতে না চায় মা, তুমি থাকো তোমার মেয়ের কাছে; আমি তাতে আপত্তি করব না।'

ভুবনময়ী আর কোন কথা বললেন না।

দোরের সামনে লরী এসে দাঁড়াল। বৈদ্যনাথ নিজের হাতে টেনে টেনে মাল বোঝাই করলেন। ছোট ছেলেমেয়েদেরও কেউ কেউ উঠল সেই লরীতে। আর একখানা ট্যাক্সীতে নিজেরা যাবেন। উঠে বসবার জন্যে স্ত্রীকে বার বার তাড়া দিতে লাগলেন।

বাসন্তী এগিয়ে এসে কাঁদ কাঁদ স্বরে বললেন, 'সর্বনাশ তোমার একারই হয়নি বউদি, আমারও হয়েছে। বিজুও তো আমারই বাপের বংশের ছেলে। তবু তোমরা এমন করে চলে যাচ্ছ। মনে আছে এক সঙ্গে এ বাড়িতে ঢুকেছিলাম—'

কনকলতা ক্ষমাহীন কঠিন স্বরে বললেন, 'হ্যাঁ, এক যাত্রায় যে এমন পৃথক ফলে হবে তা আর ভাবিনি।'

সিঁড়ির কাছাকাছি গিয়ে হঠাৎ ফিরে এলেন কনকলতা। কি মনে করে অবনীমোহনের ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে অনুচ্চ স্বরে বললেন 'আমরা যাচ্ছি অবনীবাবু।'

অবনীমোহন তক্তপোষ থেকে নেমে এসে দোরের সামনে কনকলতার মুখোমুখি দাঁড়ালেন, তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'না গেলেই কি চলত না? মনে আছে এর আগেও কত ভালো ভালো বাড়ি আমি পেয়েছি। তবু যাইনি। তুমিই যেতে দাওনি। মনে আছে সে কথা?'

সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল কনকলতার। সেই প্রথম যৌবনের অতীত যেন কথা বলে উঠল। রূপ ধরে এসে দাঁড়াল অবনীমোহনের মধ্যে। হাসি-ঠাট্টার ভিতর দিয়ে তাঁরা তখন পরস্পরের অনেক কাছে গিয়ে পৌঁছেছিলেন। মনে মনে দুজনেই তা জানতেন, দুজনেই তা স্বীকার করতেন। কিন্তু তার চেয়ে বেশি কিছু করার সাহস তাঁদের ছিল না। সেই ভীরুতা তাঁদের সন্তানের মধ্যে সংক্রামিত হয়েছে। ওরাও তাঁদের মতই ভীরু, তাঁদের চেয়েও ভীরু।

কনকলতার ঠোঁট দুটি কেঁপে উঠল, অস্ফুট স্বরে বললেন, 'আছে। এতদিনে তার প্রায়শ্চিত্ত হোল।'

কনকলতা তাড়াতাড়ি নেমে গিয়ে ট্যাক্সীতে স্বামীর পাশে উঠে বসলেন।

ড্রাভইার গাড়িতে স্টার্ট দিল।

শুধু বৈদ্যনাথ বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন, আর সবাই তো রয়েছে, তবু সারা বাড়িটাই কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা মনে হয় বাসন্তীর। কনকলতাদের ঘরের দিকে যেন আর তাকানো যায় না। ঘরখানা তেমনি ফাঁকাই পড়ে রয়েছে। কেউ ঢোকেনি। এমনকি কোন ছেলে মেয়েও খেলাচ্ছলে সে ঘরের ভিতরে যায়নি। আর যায়নি ছাদে। অথচ ছাদ ছেলেপুলেদের এত প্রিয় জায়গা ছিল। সারাদিন তাদের ছাদ থেকে নামানো যেত না। একখানা কাপড় মেলবার জন্যে পর্যন্ত সেই ছাদে ওদের কাউকে পাঠান যায় না। বিজুর অশরীরী প্রেতাত্মা যেন সেই ছাদ ভরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সারা বাড়ি ভরে নড়ে বেড়াচ্ছে। ছেলেমেয়েদের দোষ দেবেন কি, বাসন্তীর নিজেরই মনে হয় যেন বিজুর ছায়া তিনি দেখতে পান। দুহাতে চোখ রগড়ে ফেলেন বাসন্তী। এসব কথা ছেলেমেয়েদের কাউকে বলা যাবে না। ওরা এমনিতেই দিনরাত ভয়ে ভয়ে বেড়াচ্ছে। ওকথা শুনলে আর রক্ষে থাকবে না।

ছেলেমেয়েদের না বললেও স্বামীকে না বলে পারেন না বাসন্তী। বলেন, 'দাদারা গেছে না বেঁচেছে এই অলুক্ষুণে বাড়ি আমাদেরও ছেড়ে দিতে হবে বুঝেছ? আমার আর কিছুতেই এখানে মন টিকছে না।'

অবনীমোহন মনে মনে ভাবলেন মন কারই বা টিকছে। কিন্তু স্ত্রীকে কথাটা বললেন না। বরং খানিকটা আশ্বাসই দিলেন অবনীমোহন, 'ও কিচ্ছু না। দু'চার দিন বাদেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

বাসন্তী বললেন, 'দু চারদিন! কি জানি আমার তো মনে হয় দু' চার বছর এমনকি সারা জীবনেও দাদা কি মা আমার আর কোন খোঁজ নেবেন না, কোন সম্পর্ক রাখবেন না আমার সঙ্গে। বিজুর কথা কি

ওরা কেউ জীবনে ভুলতে পারবেন?'

অবনীমোহন বললেন, 'জীবনে অনেক কথাই ভুলতে হয়। তুমি ভেব না। সময়ে সবই ঠিক হয়ে যাবে।'

একটু বাদেই তিনি অন্য কথা পাড়লেন, বললেন, 'শুভরাত্তির-টাত্তির গেল, প্রীতির শ্বশুড় আমাদের একটা খবর পর্যন্ত দিলেন না, দেখলে কাণ্ড?'

অবনীমোহন গম্ভীর মুখে বললেন, 'খবর না দেওয়াটাই তো স্বাভাবিক।'

বাসন্তী বললেন, 'স্বাভাবিক না ছাই। এই কি ভদ্রলোকের মত ব্যবহার? মেয়েটার ভাগ্যে যে কি আছে ভগবানই জানেন। যাকগে। তারা ভদ্রতা না করলেও আমরা তো আর না করে পারব না। শত হলেও মেয়ে তো আমাদেরই। আমি বলি কি দশ বর্জনে মেয়ে-জামাইকে নিমন্ত্রণ করবার জন্যে তুমিই যাও। বুঝিয়ে-সুজিয়ে দু'কথা বলতেও পারবে।'

অবনীমোহন তাতে রাজী হলেন না। বললেন, 'দশ বর্জন-টর্জন দিয়ে আর কাজ নেই। দিন কয়েক চুপচাপ থাক। তাদেরও চুপ করে থাকতে দাও।'

বাসন্তী বললেন, 'ওমা কথা শোন। আমরা খোঁজ-খবর না নিলে তারা কি ভাববে জানো আমাদের নিজেদেরই কোন দোষ আছে। তারা খোঁজ নিক আর না নিক মেয়ে যখন আমাদের তখন আমাদেরই এগিয়ে গিয়ে তত্ত্বতালাস করতে হবে। তাছাড়া যেমন করেই হোক বিয়ে যখন হয়ে গেছে, শাস্ত্রের বিধি মানতে হবে না?'

অবনীমোহন বললেন, 'বেশ মানতে হয় মানো। কিন্তু আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব হবে না।'

মৃগাঙ্কও সেই কথাই বলল। তার যাওয়ার সময় নেই। তা ছাড়া এসব ছেলে-ছোকরাদেরই কাজ। জামাই মেয়েকে নিমন্ত্রণ করার জন্যে অরুণ কি অতুলকে পাঠিয়ে দিলেই তো হয়। দেওরের আচরণে

অনেক কড়া কড়া কথাই মনে এল বাসন্তীর। কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। সময় খারাপ পড়েছে, এখন একটু ধৈর্য ধরে থাকাই ভালো।

চিলা কোঠার ঘরে গিয়ে এবার বড় ছেলের শরণ নিলেন বাসন্তী, 'নান্তু, তোকে একটা কাজ করতে হবে বাবা।'

মেঝেয় বসে সামনে আয়না নিয়ে অরুণ সেফটি রেজরে দাড়ি কামাচ্ছিল, বাসন্তীর কথা শুনে বলল, 'কি কাজ মা।'

কাজের ধরণটা খুলে জানালেন বাসন্তী।

অরুণ বলল, 'আর যাই কর মা, ও সব নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণের মধ্যে আমাকে যেতে বল না। ওগুলি আমি পারিনে।'

বাসন্তী রাগ করে বললেন, 'বাঃ রে, তুই পারবিনে, তোর বাবা কাকারা কেউ পারবে না, তবে কি এসব কাজও আমি নিজে গিয়ে করব? তাছাড়া শত হলেও নিজেরই তো বোন। বিয়ের পর তোরা যদি কোন খোঁজ-খবর না নিস লোকে ভাববে কি। আর মেয়েটাই বা কি মনে করবে। ভাববে আমার সব থাকতেও কেউ নেই। হ্যাঁরে, তোরা কি সবাই একেবারে দয়ামায়া রহিত হয়েছিস, একটু দুঃখ হয় না তার জন্যে?'

অরুণ বলল, 'দুঃখ হবে না কেন মা, হয়। কিন্তু যা সব ঘটে গেল তারপর ওর মুখের দিকে কি করে যে তাকাব তাই আমি ভাবতে পারিনে। কটা দিন যেতে দাও মা, তারপরে আমি একদিন যাব।'

বাসন্তীর মনে হোল এসব বাজে কথা। আসলে তাঁর মেয়েকে কেউ ভালোবাসে না, সবাই ঘৃণা করে। তার আপনজনেরাই সব পর হয়ে গেছে। কিন্তু নান্তু তো তার নিজেরই দাদা। বোনের দিক থেকে সেও কি মুখ ফিরিয়ে থাকবে? দোষ-ঘাট করলেও কি নিজের বাপ-ভাইর কাছ থেকে সে ক্ষমা পাবে না? এরাই যদি তাকে ক্ষমা করতে না পারে, তার স্বামী-শ্বশুর কি করে ক্ষমা করবে। মেয়েটার ভাগ্যে না জানি কি দুর্গতিই আছে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লেন বাসন্তী।

নীচে নেমে তিনি রান্নাঘরে ঢুকতে যাচ্ছিলেন, অতুল পিছন থেকে ডেকে বলল, 'কই মা, চায়ের পাট-টাট একেবারে শেষ করে ফেলেছ নাকি, না এক-আধ কাপ আছে আমার জন্যে?'

বাসন্তী মুখ ফিরিয়ে ছেলের দিকে তাকালেন, 'কথা শোন। তোর জন্যে চা কবে না রাখি বলতো। আয়, ভিতরে আয়।'

অতুল রান্নাঘরের ভিতরে এসে নিজেই একখানা পিঁড়ি পেতে বসল। বাসন্তী ওর সামনে রুটি আর চায়ের কাপ এগিয়ে দিলেন।

অতুল চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল, 'ও'রা চলে যাওয়ায় বাড়িটা একেবারেই যেন খালি হয়ে গেছে, না মা। দিদিমার জন্যে তোমার মনটা খুব পোড়ে, না?'

ছেলের কথার ভঙ্গিতে বাসন্তী একটু হাসলেন, 'পুড়লেই বা আর কি করব বল।'

অতুল আশ্বাস দিয়ে বলল, 'দাঁড়াও, যাক কটা দিন। আমি বুড়িকে গিয়ে ফের নিয়ে আসব। তোমার দাদারও সাধ্য নেই যে আমাকে বাধা দেয়। দিদিমা তো শুধু তাঁরই মা নয়, আমার মারও মা।'

বাসন্তী বললেন, 'দাদার সম্বন্ধে আর তুই অমন যা-তা বলিসনে অতুল। তার কথা ভাবলে আমার দুঃখে বুক ভেঙে যায়। আহা, অমন যোগ্য ছেলে—'

অতুল উত্তেজিত হয়ে বলল, 'থাম মা থাম। শুধু পড়াশুনো শিখলেই যোগ্য ছেলে হয় না। আমার মতে, ও ছিল চূড়ান্ত রকমের অযোগ্য। মামার জন্যে আমার দুঃখ হয়, কিন্তু বিজুর কথা ভাবলে এখনো আমার সমস্ত শরীর রাগে জ্বলে যায়। নেহাৎ মরে গিয়ে সামনে থেকে সরে গেছে। নাহলে হাতের কাছে পেলে আচ্ছা করে ওর ঘাড় ধরে একবার ঝাঁকুনি দিতাম। আচ্ছা, মরে ওর লাভটা কি হোল! কেলেঙ্কারি যা হবার, তা তো হোলই। তার চেয়ে আমার কাছে যদি বলত, অতুলদা কাণ্ড তো একটা বাধিয়ে বসেছি, এবার কি ব্যবস্থা করবে কর। তাহলে আমি আর গোবিন্দ মিলে নিশ্চয়ই

একটা ব্যবস্থা করতে পারতাম। গোপনে গোপনে এমন কত বিয়ে আমরা দিয়েছি।'
বাসন্তী বললেন, 'চুপ চুপ। কি যা-তা তুই বলছিস অতুল। তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? বিজু তোর কাছে সব খুলে বললে তুই ওদের বিয়ে দিয়ে দিতিস? এরকম বিয়ে কি হয়?'
অতুল বলল, 'যখন-তখন হয় না। কিন্তু দরকার পড়লে হতে দিতে হয় মা। তোমার কি মনে হয় না, মরে গিয়ে কেলেঙ্কারি করার চেয়ে ওদের বিয়ে করে কেলেঙ্কারি করা অনেক ভালো ছিল।'
গোঁয়ার ছেলের এই স্পষ্টবাদিতায় বাসন্তী কিছুক্ষণ অবাক হয়ে থেকে বললেন, 'তোর কথাবার্তা সবই সৃষ্টিছাড়া অতুল। যাক, যা হবার তা তো হয়ে গেছে। এবার এক কাজ কর। প্রীতির একটা খোঁজ নিয়ে আয়।'

অতুল বলল, 'এত লোক থাকতে আমাকে যে কাজে ডাকছ, ব্যাপারটা কি। আমি তো জানতাম, আমি তোমাদের সব কাজের বাইরে।'
বাসন্তী এবার ছেলের কাছে দুঃখের কথা সব খুলে বললেন। এত লোক আর কই। প্রীতিকে আনবার জন্যে জনে জনে সবাইকেই তিনি সেধেছেন। কিন্তু কেউ একটু গা পর্যন্ত করেনি। আচ্ছা, দোষ-ঘাট কি কারো হয় না? তাই বলে বাড়ির একটা লোকও মেয়েটার একটা তত্ত্ব নিয়ে যাবে না? এই-বা কোন ধারা বিচার?'
অতুল বলল, 'বেশ যদি বল আমি যেতে পারি।'
বাসন্তী খুশি হয়ে বললেন, 'যাবি? সত্যি বলছিস! তাহলে তো খুবই ভালো হয়।' তারপর একটু চিন্তা করে বললেন, 'কিন্তু তোমাকে কোন জায়গায় পাঠাতে আমার ভয়ও করে বাপু।'
অতুল বলল, 'ভয়! কিসের ভয় মা?'
বিপিনবাবু সন্ধ্যার আগেই অফিস থেকে ফিরে এলেন। বৈঠকখানা ঘরে ঢুকে অতুলকে দেখে ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'আপনি—
অতুল আত্মপরিচয় দিয়ে বলল, 'আমি রণজিৎবাবুদের নিতে এসেছি।

মা বিশেষভাবে বলে দিয়েছেন।'

বিপিনবাবু একটু হাসলেন, 'দিয়েছেন বুঝি? কিন্তু রণজিৎ তো যাওয়ার সময় করে উঠতে পারবে না।'

অতুল বলল. 'কেন সময় না পাওয়ার কি আছে। আজ গিয়ে কালই তো চলে আসতে পারবেন।'

বিপিনবাবু বললেন, 'বেশ তো, আপনি বসে দেখুন। ও এক্ষুণি এসে পড়বে।'

খানিক বাদে রণজিৎও অফিস থেকে ফিরল। বিপিনবাবু অতুলের পরিচয় দিয়ে বললেন. 'ছেলেটি তোমাদের নিমন্ত্রণ করতে এসেছে রণজিৎ। তুমি ওর সংগে আলাপ করো।'

বলে বিপিনবাবু ভিতরের দিকে চলে গেলেন।

অতুল বলল, 'তাহলে আর বেশি দেরি করে লাভ কি রণজিৎবাবু আপনি তৈরী হয়ে নিন্। প্রীতিকেও তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিতে বলুন।'

রণজিৎ অতুলের দিকে তাকিয়ে কঠিন স্বরে বলল. 'দেখুন বেশি কথাবার্তা বাড়িয়ে লাভ নেই, আমাদের কারো পক্ষেই যাওয়া সম্ভব হবে না। আমার মনে হয় আপনাদের নিজেদেরই তা বুঝতে পারা উচিত ছিল।'

অতুল বলল, 'কেন যাওয়াটা অসম্ভব কিসে?'

রণজিৎ বলল, 'আপনারা সব জেনেও যদি না জানার ভাণ করেন, তাহলে আর উপায় কি। কিন্তু এ সব নোংরা ব্যাপার নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করবার সত্যিই আমার ইচ্ছে ছিল না।'

অতুল মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে বলল, 'সে ইচ্ছে আমারও নেই। কিন্তু যে দুর্ঘটনা ঘটে গেছে তার কথা ভুলে যাওয়াই আমাদের সকলের পক্ষে ভালো। এখন যদি ব্যাপারটাকে স্বাভাবিকভাবে নেওয়া যায়—'

রণজিৎ বলল, 'স্বাভাবিকভাবে নেওয়ার ইচ্ছা থাকলেই কি সব সময়

নেওয়া সম্ভব হয় ?'

অতুল বলল, 'আপনি ইচ্ছে করলেই তা সম্ভব করে তুলতে পারেন। আপনি আজকালকার ছেলে—'

রণজিৎ একটু হাসল, 'দেখুন আপনি বয়সে আমার চেয়ে ছোটই হবেন। ওসব উপদেশ দেওয়া যত সহজ, নিজে মানা তত সহজ নয়। কিন্তু আমরা মানতে—মানিয়ে নিতেই চেষ্টা করছি। দোহাই আপনাদের—এর মধ্যে আপনারা আর মাথা গলাতে আসবেন না। তাতে সকলেরই ক্ষতি।'

অতুল ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করতে লাগল। রণজিতের কথার কোন যোগ্য উত্তর দিতে না পেরে ও রূঢ় স্বরে বলল, 'বেশ প্রীতিকে ডেকে দিন। আমি তার সঙ্গে একবার দেখা করে চলে যাই। নাকি দেখা করার অনুমতিও দেবেন না আপনারা ?'

রণজিৎ বলল, 'আপনি মিছামিছি রাগ করছেন। আসুন আমার সঙ্গে।'

অতুল রণজিতের পিছনে পিছনে তাদের শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকল। অতুলদেরই দেওয়া যৌতুকপত্রে সে ঘর সাজানো। পূর্বদিকের দেয়াল ঘেঁষে ডবল বেডের খাটখানা পাতা হয়েছে। একধারে ড্রেসিং টেবিলে মেয়েদের প্রসাধনের টুকিটাকি সরঞ্জাম। তার সামনের চেয়ারখানা দেখিয়ে রণজিৎ বলল, 'বসুন।'

অতুল চেয়ারে বসে পড়ল। একজন দীর্ঘ বলিষ্ঠ পুরুষের ছায়া পড়ল আয়নায়। মনে মনে এক ধরণের আত্মপ্রসাদ বোধ করল অতুল।

খানিক বাদে প্রীতি এসে ঘরে ঢুকল। ওর সিঁথির সিঁদুর যত উজ্জ্বল, মুখখানা তত উজ্জ্বল নয়, অতুলের মনে হোল যেন ও অনেকদিন রোগে ভুগে উঠেছে। সমস্ত চেহারায় কিসের এক ক্লান্তির ছাপ। দুই চোখে একটা দুর্বোধ্য ভয়ার্ততা। প্রীতি অতুলের

দিকে চোখ তুলে তাকাল না। একটু দূরে মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।
ওর অসহায় ভঙ্গি দেখে হঠাৎ বোনের ওপর ভারি মমত্ব বোধ করল অতুল। কোমল স্নেহার্দ্র স্বরে বলল, 'দাঁড়িয়ে রইলি কেন, বোস ওখানে। কেমন আছিস।'
প্রীতি কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে রইল।
রণজিৎ ভাবল, তার সামনে প্রীতি কোন কথা বলতে চায় না। একটু ইতস্তত করে অতুলের দিকে তাকিয়ে রণজিৎ বলল, 'আপনারা ততক্ষণ আলাপ করুন অতুলবাবু, আমি সিগারেট নিয়ে আসছি।'
ঘর থেকে পরক্ষণেই বেরিয়ে গেল রণজৎ।
কিন্তু প্রীতি তেমনি চুপ করেই রইল।
অতুল বলল, 'কি ব্যাপার। একেবারে বোবা বনে গেলি নাকি। কথা বলছিস না যে।'
প্রীতি মৃদু স্বরে বলল, 'কি বলব।'
অতুল বলল, 'কেমন আছিস তাই বলবি।'
প্রীতি বলল, 'ভালোই আছি।'
অতুল প্রীতির দিকে তাকাল, 'ভালো আছিস! কিন্তু চেহারা দেখে তো তেমন ভালো মনে হচ্ছে না।'
প্রীতি অদ্ভুত একটু হাসল, 'চেহারা দেখেই বুঝি সব বোঝা যায়?'
অতুল বলল, 'বোঝা যায় না? দেখ দেখি আমার চেহারা। কেউ বলতে পারবে আমি খারাপ আছি। শোন, আমি তোদের নিতে এসেছিলাম। কিন্তু এঁরা বলছেন, তোদের নাকি যাওয়া সম্ভব নয়। তুই একটু ভালো করে বুঝিয়ে বল না তোর শ্বশুর শাশুড়ীকে।'
প্রীতি বিস্মিত হয়ে বলল, 'আমি বলব। তোমার বলাতেই হোল না ছোড়দা, আর আমার বলায় হবে। আমি বললে ওঁরা শুনবেন?'
অতুল বলল, 'শুনবেন না কেন? তুই এ বাড়ির বউ, তোর একটা

জোর নেই ? তোর একটা দাবী নেই ? তেমন করে বলতে পারলে তোর সাধ-আহ্লাদ ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা শুনবেন না ? বল না গিয়ে।'

প্রীতি তেমনি মৃদুস্বরে বলল, 'না ছোড়দা আমি তা পারব না। সেই সেই শূন্য বাড়িতে গিয়ে আর কি হবে। তার চেয়ে এই বেশ আছি।'

শূন্য বাড়ি কথাটা কেমন লাগল অতুলের। প্রীতির দিকে তাকাতে গিয়ে দেখে সেও লজ্জায় মুখ নীচু করে রয়েছে। বাপ মা ভাই বোন সবাই থাকতেও একমাত্র বিজু নেই বলে সত্যিই কি সে বাড়ি প্রীতির কাছে শূন্য হয়ে গেছে ? এতই যদি বিজুকে ভালোবাসত প্রীতি, সে কেন স্বামীর ঘর করতে রাজী হোলো ! কেন এই বিয়ে অস্বীকার করল না ! কেন সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে চলে এল না। আশ্চর্য মেয়েদের মন আর তাদের ভীরু অসহায় ভালোবাসা। প্রীতির পাশাপাশি আর একটা মেয়ের মুখ মনে পড়ল অতুলের। সে ভীরু নয়। সে আলাদা জাতের, কিন্তু তার মনে কি ভালোবাসা আছে ? সংসারে ভীরু ছাড়া কি কেউ ভালোবাসতে পারে না !

অতুল বলল, 'প্রীতি তুই আমার সঙ্গে চল। তুই যদি ইচ্ছা করে না যাস, আমি তোকে জোর করেই নিয়ে যাব।'

প্রীতি এবার অতুলের দিকে মুখ তুলে তাকাল, তারপর একটু অদ্ভুত হেসে বলল, 'জোর করতে হবে না ছোড়দা। যাওয়ার দিন যদি আসে আমি নিজেই যাব। আর কারো কাছে নয় তোমার কাছে গিয়েই সবার আগে দাঁড়াব ছোড়দা। তখন কিন্তু দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়ো না।'

অতুল বলল, 'তার মানে ?'

প্রীতির মুখ একটু যেন আরক্ত হয়ে উঠল, 'মানে কিছু নেই।' বলে সে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অতুল মুহূর্তকাল স্তম্ভিত হয়ে গেল। ওর ছেলেপুলে হবে না

তো! সেই কথা টের পেয়েই কি ও স্বেচ্ছায় এই অপমান, এই গ্লানি মাথা পেতে নিয়েছে! নিজের সঙ্গে সকলের সঙ্গে এখন লুকোচুরি করছে। কিন্তু এ সব করেও কি প্রীতি নিজেকে বাঁচাতে পারবে? না কি এখন আর সে নিজে বাঁচতে চায় না, ছলে বলে কৌশলে আর একজনকে বাঁচিয়ে রাখা, নিরাপদে রাখাই তার একমাত্র লক্ষ্য!

অতুল আস্তে আস্তে উঠে পড়ল। মনে মনে ভাবল হয়ত এসব তার মিথ্যে আশঙ্কা। এর মূলে কোন সত্য নেই। কিন্তু যদি সত্যও হয়, আর প্রীতি যদি এখানে না টিকতে পেরে তার আশ্রয় নেয়, অতুল বোনকে কিছুতেই ফেলে দেবেনা তাকে নিয়ে আলাদা বাসা করে থাকলেও থাকবে।

রণজিৎ অতুলকে বড় রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে এল। বাসে উঠবার আগে তার দিকে তাকিয়ে অতুল রূক্ষ স্বরে বলল, 'আপনারা যে অভদ্র ব্যবহার করলেন তা আমার চিরদিন মনে থাকবে।' রণজিৎ একটু হাসল, 'অভদ্র ব্যবহার! আর আপনারা নিজেরাই বুঝি খুব ভদ্র ব্যবহার করেছেন?'

অতুল বলল, 'নিশ্চয়ই। অনেক গুণে ভদ্র। আজ আমি যাচ্ছি। কিন্তু ফের আমি একদিন খোঁজ নিতে আসব। যদি দেখি ও কষ্ট পাচ্ছে, ওর কোন অসুবিধে হচ্ছে, আপনারা ওকে যেতে দিন আর না দিন ও নিজে যেতে চাক আর না চাক ওকে জোর করে নিয়ে যাব। আমরা সবাই যদি খেতে পাই ও-ও পাবে। আমি অত ঘোর-প্যাঁচ বুঝিনে। আমি সোজা কথার মানুষ, সোজা পথের মানুষ। স্পষ্টই বলে দিলাম আপনাকে।'

রণজিৎ বলল, 'আর একদিন কেন, আজই নিয়ে যান না।'
কিন্তু বাস ততক্ষণ ছেড়ে দিয়েছে। কথাটা কানে গেল না অতুলের।

বাড়িতে এসে মার কাছে ঘটনাটা সবিস্তারে জানাল অতুল। বাসন্তী সব শুনে বললেন, 'আমি জানতাম। মেয়েটাকে ওরা আস্তে আস্তে মেরে ফেলবে। তাই ওদের মতলব।'

অতুল প্রতিবাদ করে বলল, 'কি যে বল। মেরে ফেলা অতই সহজ কিনা। আমি রণজিৎকে বেশ করে শাসিয়ে দিয়ে এসেছি। প্রীতিকে যদি কষ্ট দেয়, যদি খারাপ ব্যবহার করে আমরা সহজে ছাড়ব না। যদি বনিবনাও হয় ভালোই, না হয় প্রীতিকে আমি বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে আসব। তুমি কিছু ভেব না, আমি যদি খেতে পাই ওরও দু'মুঠো জুটবে।'

বাসন্তী একটু হাসলেন, 'তোর তো সবই কেবল মুখের বড়াই' রোজগার করে তো কত ভরে দিচ্ছিস। তাছাড়া দু'মুঠো খেতে পারাটাই তো মেয়েদের সব নয়। শুধু খাওয়া-পরার দুঃখ সারলেই তো তাদের সব দুঃখ সারে না।'

অতুল বলল, 'দুঃখ মনে করলেই দুঃখ, আবার না মনে করলেই দুঃখ নয়। বনিবনাও না হলেও যে মেয়েদের শ্বশুরবাড়িতে পড়ে থাকতে হবে, সব রকম অপমান, নির্যাতন সহ্য করতে হবে, তার কি মানে আছে। তেমন হ'লে রমা—রমাদি যা করেছে তাই করাই ভালো।'

বাসন্তী ছেলের দিকে তাকালেন, 'ভালো? রমা যা করেছে তা তুই সমর্থন করিস? নিজের ঘর-গৃহস্থালী ছেড়ে এসে এইভাবে—'

অতুল বলল, 'ঘর-গৃহস্থালী যদি সবারই ধাতে না পোষায় তাহ'লেও কি তা করতেই হবে? সংসারে কি আর কোন কাজকর্ম নেই?'

বাসন্তী বললেন, 'আর কি কাজ আছে? কাজের মধ্যে তো পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া।'

অতুল বলল, 'মোটেই নয়। আড্ডা দেওয়ার সময় তার নেই। গোবিন্দদের সংসারের সমস্ত ভারই তো তার হাতে। যেটুকু অবসর পায় মেসিনের সামনে গিয়ে বসে। না জেনে না শুনে মানুষের

উপর দোষারোপ করা, তার নামে নিন্দা রটানো তোমাদের অভ্যাস হ'য়ে গেছে মা।'

বাসন্তী বিরক্ত হ'য়ে বললেন, বেশ বেশ, আমাদেরই অভ্যাস খারাপ, স্বভাব খারাপ, কেবল রমার মত ভালো মেয়েই দুনিয়ায় নেই, হোল তো? কিন্তু তোমাকে পুনঃ পুনঃ বারণ করছি বাপু, অত ভালো মেয়ের সঙ্গে তুমি বেশি মেলামেশা করতে যেয়ো না। অন্য কাজকর্ম জোটে ভালো, না জোটে তুমি বাড়ি বসে থেক। সেও আমার সইবে। কিন্তু ওই সংসর্গে মিশে তোমার আর দরকার নেই। তোমরা সবাই যদি একই রকম হও, একই ধারায় চল, তাহলে সংসারের যে কি উপায় হবে আমি তাই ভাবি।'

অতুল বলল, 'তোমার এত ভাবনা চিন্তার কি হয়েছে আমি তো কিছু বুঝতে পারছিনে।'

বাসন্তী বললেন, 'না তাতো ঠিকই। তোমাদের ভবিষ্যতের ভাবনা আমি ভাবব না ভাববে এসে পাড়ার লোকে। তোমরা সবাই মিলে সংসারখানাকে যা ক'রে তুলেছ তাতে আর এক মুহূর্তও এখানে আমার থাকতে ইচ্ছে করে না। একেক সময় ভাবি, যেদিকে দুই চোখ যায় চলে যাই।'

রাতের খাবারের জন্যে রুটি বেলতে বেলতে কথা বলছিলেন বাসন্তী। দু'দিন আগে বাপের অসুখের খবর পেয়ে জা নীরজা দমদম চলে গেছে। সংসারের কাজকর্ম একাই করতে হচ্ছে বাসন্তীকে। শরীরটা ভালো না। মনেও নানা কারণে শান্তি নেই। মার কথার ভঙ্গিতে মনটা যেন কেমন করে উঠল অতুলের। ভালো করে আর একবার তাকিয়ে দেখল মা'র মুখের দিকে। কপালে নীল নীল দুটি রগ জেগে উঠেছে। চোয়ালের হাড়গুলো স্পষ্ট। অতুল বলল, 'মা, তোমার শরীর দিনের পর দিন এত খারাপ হয়ে যাচ্ছে কেন বলতো। কি হয়েছে তোমার। দাঁড়াও, কালই আমি ডাক্তারবাবুকে ডেকে নিয়ে আসব।'

বাসন্তী একটু হাসলেন, 'ডাক্তার কবরেজ এসে আমার কি করবে শুনি।'
অতুল বলল, 'কি আবার করবে। ডাক্তারেরা যা করে তাই করবে। চিকিৎসা করবে। ওষুধ দেবে।'
বাসন্তী বললেন, 'শত ওষুধ পথ্যেও আমার কিছু হবে না। হাজার ডাক্তারও আমার রোগ সারাতে পারবে না অতুল।'
অতুল বলল 'বেশ ডাক্তারদের ওপর তোমার বিশ্বাস না থাকে, করবেজ দেখাও। ভালো ভলো কবরেজও তো আছে শহরে।'
বাসন্তী ফের একটু হাসলেন, 'ডাক্তারও নয়, কবরেজও নয়। তাদের কারোরই সাধ্য নেই। তারা কেউ আমার রোগ সারাতে পারবে না। আমার সব অসুখ সারাতে পারিস কেবল তোরা, পারিস কেবল তুই।'
অতুল বিস্মিত হয়ে বলল, 'আমি পারি?'
বাসন্তী বললেন, 'পারিসই তো, তুই যদি আমার কথা শুনিস, ভালোভাবে চলিস, দশজনে যদি তোকে ভালো বলে, দেখবি দুদিনে আমার শরীর ভালো হয়ে গেছে। কোন রকম অশান্তি নেই।'
অতুল বাসন্তীর দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে বলল, 'এত অল্পেই যদি তোমার সব অশান্তি দূর হয় মা তাই করব। কিন্তু দশজনের ধার আমি ধারিনে। আমি কি করলে, কিভাবে চললে তোমার ভালো লাগে তাই বল। দেখি চেষ্টা করে পারি কিনা।'
ভালোত্বের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে একটু যেন মুশকিলে পড়লেন বাসন্তী, খানিক বাদে বললেন, 'না পারবার কি আছে। আমি তো তোকে বি এ, এম এ পাশ করতেও বলছিনে, জজ ম্যাজিস্ট্রেট হতেও বলছিনে। অত বড়লোক হবার সাধ আমার নেই। সাধ্যমত কাজকর্ম জোগাড় করে নিলি, পাঁচ আনিস পাঁচ খেলি, দশ পারিস দশ, ভাইবোনদের মানুষ করলি, পাড়াপড়শীর আপদে-বিপদে দেখলি, ভালো লোকের সংসর্গে রইলি, দশজনে

ভালো বলল, এই তো আমি বুঝি বাপু।'

অতুল হেসে বলল, 'ফের দশজন?'

বাসন্তীও হাসলেন, 'বাঃ দশজন ছাড়া চলে নাকি সংসারে? তোদের যদি দশজনে ভালো বলে তাহ'লেই তো আমার সুখ।'

অতুল বলল, 'তাতো বুঝলাম। কিন্তু সেই দশজনের মধ্যে ক'জন সত্যি সত্যি ভালো তা বুঝি খোঁজ নিয়ে দেখবে না? যারা নিজেরা ভালো নয়, ভিতরে ভিতরে জোচ্চোর, মিথ্যেবাদী বদমাস তারা ভালো বলুক আর না বলুক আমার কিছু এসে যায় না। কিন্তু আমি সাদা জামা-পরা ভদ্রলোক সাজলেই যদি তোমার সব অসুখ সারে, বেশ তাই হব, তাই সাজব।'

বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে বিছানার ওপর আড় হয়ে শুয়ে পড়ল অতুল। এতক্ষণে বেশ যেন একটু ক্লান্তি লাগছে। সত্যি, অনর্থক সময় নষ্ট করছে। দিনের পর দিন যাচ্ছে অথচ কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। সঙ্গী-সাথীরা সবাই কিছু না কিছু কাজকর্ম জুটিয়ে নিয়েছে। সেই শুধু বেকার। বেকার ছাড়া কি? কাটা কাপড়ের ব্যবসায়ে বিশেষ কিছুই থাকে না। নিজের হাত-খরচাটা বাদে কিছুই পায় না অতুল। এদিক থেকে গোবিন্দ বেশ সেয়ানা। বলে, রোস রোস। অত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন। কারবারটা দাঁড়াক। তারপর যা দরকার নিস্।'

কিন্তু এভাবে তো সত্যি দিন কাটবে না। নিজের পায়ে নিজেকে দাঁড়াতেই হবে। কলকারখানায় যেখানেই হোক কিছু একটা জুটিয়ে নিতেই হবে অতুলকে। আর সে অনর্থক সময় নষ্ট করবে না।

'অতুল বাড়ি আছিস্, অতুল!'

বাইরে গোবিন্দের গলা শোনা গেল। অতুল একটু বিস্মিত হোল। গোবিন্দ সাধারণত ওদের বাড়ি পর্যন্ত আসে না। ক্লাবে কিংবা চায়ের দোকানেই দেখা-সাক্ষাৎ সেরে নেয়। ব্যাপার কি! আজকে এত গরজ কিসের ওর?

জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল, 'হ্যাঁ, আছি। কিন্তু শরীরটা তেমন ভালো নেই গোবিন্দ। আজ যা। কাল সব হিসেবপত্র বুঝিয়ে দেব।'

গোবিন্দ বলল, 'হিসেবপত্রের জন্যে নয়। অন্য কথা আছে।'

অতুল বিরক্ত হয়ে বলল, 'কি কথা বলেই ফেল না।'

গোবিন্দ বলল, 'এতকাল বাদে জামাইবাবু ফের এসে চড়াও হয়েছেন। এসেই হৈ হল্লা করে বাড়ি একেবারে মাথায় করে তুলেছেন। বেরিয়ে আয় সব বলছি।'

এ কথা শুনে অতুল তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। জামাটা গায়ে দিয়ে বেরুতে বেরুতে বলল, 'চল।'

গোবিন্দদের বাড়ির সামনে আসতেই ভিতর থেকে একটা গোলমালের শব্দ শোনা গেল। কে যেন তারস্বরে বলছে, 'বেশ সহজে না যেতে চায়, আমি পুলিস দিয়ে নেওয়াব। এখানে বসে বসে পাড়ার ছেলেদের নিয়ে বৃন্দাবন-লীলা চালাবে আমি বেঁচে থাকতে তা সহ্য করব না।'

আর একজন চাপা গলায় তাকে শান্ত করবার চেষ্টা করছে, 'আঃ থাম হীরেন, থাম। এসব কি যা তা বলছ তুমি। লোকে শুনে কি বলবে।'

হীরেন জবাব দিল, 'লোকের দেখবার-শোনবার কিছু বাকি আছে নাকি? ও যাবে কিনা, ওকে আপনারা পাঠাবেন কিনা স্পষ্ট বলে দিন।'

'আঃ শোন।'

বাইরের বসবার ঘরে বসে কথাবার্তা হচ্ছিল। কেশববাবু জামাইকে যুক্তিতর্ক দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন, গোবিন্দ আর অতুল এসে ঘরে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে রমার স্বামী হীরেন তাদের দিকে ফিরে তাকাল, ব্যঙ্গ করে একটু হেসে বলল, 'এটি আবার কে? গোবিন্দ কি আমাকে ভয় দেখাবার জন্যে গুণ্ডা নিয়ে এল সঙ্গে করে?'

গোবিন্দ বলল, 'গুণ্ডা হবে কেন। ও আমার ছেলেবেলার বন্ধু অতুল। ভয় তো আপনিই দেখাচ্ছেন জামাইবাবু, চেঁচিয়ে সারা বাড়ি মাথায় করে নিয়েছেন বাইরে পাড়ার লোক জমে যাচ্ছে।'

হীরেন বলল, 'জমবেই তো। লোক জমাবার কাণ্ড করলে লোক জমবে না? আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাইনে। তোমার দিদিকে বলো—এই মুহূর্তে তৈরি হয়ে নিক। আমি আজই ওকে নিয়ে যাব। এক মুহূর্তও এখানে আমি ওকে রাখতে চাইনে।'
গোবিন্দ বলল, 'পাঁচ বছর তাকে এখানে ফেলে রাখতে পারলেন, আর পাঁচ মিনিট আপনার সইবে না? বেশ তো দিদিকে বুঝিয়ে বলুন, সে যদি যেতে চায়, আমাদের আপত্তি করবার কি আছে।'
'সে যাবে না তার ঘাড়ে যাবে।' বলে তক্তপোষ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল হীরেন, তারপর স্ত্রীর সঙ্গে আরও একবার বোঝা-পড়া করবার জন্যে দোতলার ঘরে চলে গেল।
'এ কি কাণ্ড বল তো, রাতদুপুরের সময় এ কি কেলেঙ্কারী' বলতে বলতে কেশববাবু গেলেন তার পিছনে পিছনে।
অতুল বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'ব্যাপার কি গোবিন্দ।'
গোবিন্দ বিরক্ত হয়ে বলল, 'কেন মিছামিছি ন্যাকামি করছিস অতুল। ব্যাপার কি তুই জানিসনে? ব্যাপার তো চোখের ওপর দেখলিই।'

ব্যাপার অবশ্য অতুল জানে। কিছু গোবিন্দের কাছ থেকে শুনেছে, কিছু কিছু রমাও বলেছে তাকে। সিনেমা ডিরেক্টর শচীরঞ্জন চক্রবর্তীর সঙ্গে যোগ দেওয়ার পর থেকে দেখতে দেখতে হীরেনের ভাগ্য খুলে গিয়েছিল। অভিনেতা হিসেবে নাম ছড়িয়ে পড়েছিল হীরেনের। নতুন নতুন কোম্পানী তার সঙ্গে কনট্রাক্ট করবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠেছিল। কিন্তু শচীরঞ্জন তাকে ছাড়েন নি। বলেছেন, 'আমি তোমাকে সব দিক থেকে পুষিয়ে দেব। আর কোথাও তোমাকে যেতে হবে না।'
পুষিয়ে যাচ্ছিলও। শুধু অভিনেতা নয়, শচীরঞ্জন তাকে প্রধান সহকারীও করে নিয়েছিলেন। উৎসবে ব্যসনে পেশায় নেশায় হীরেন হয়ে উঠেছিল শচীরঞ্জনের সবচেয়ে অন্তরঙ্গ। কিন্তু কয়েক বছরের

মধ্যেই চাকা ঘুরে গেল। পর পর দু'তিনখানা ছবিতে মার খেলেন শচীরঞ্জন। জনপ্রিয়তা হারালেন। পুনরাবৃত্তির অপবাদ রটল তাঁর নামে। হীরেনের ভাগ্যও একই চাকায় বাঁধা। অন্য দু'একটি কোম্পানীর সঙ্গে কনট্রাক্ট হোল। কিন্তু গোটা দুই ছবি শেষ পর্যন্ত হতে হোল না। মাঝপথে আটকে গেল। যে ছবিতে পুরোপুরি অভিনয়ের সুযোগ পেল হীরেন, তাতে যশও পেল না, অর্থও নয়। হতাশ হয়ে পুরোন বন্ধুর কাছেই ফিরে এল। শচীরঞ্জন তাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'সবুর কর, আমরা ফের ছবি করছি।'

কিন্তু পানপাত্র সামনে নিয়ে দুজনের মধ্যে বছরের পর বছর জল্পনা-কল্পনাই চলতে লাগল, ছবি আর হোল না। এদিকে পুঁজি নিঃশেষ হয়ে এল, বেশবাস জীর্ণ। মহাজনদের সংখ্যা বৃদ্ধি হতে লাগল। ভাগ্যলক্ষ্মীর মত হীরেনের অঙ্কলক্ষ্মী যশস্বিনী শমিতা দেবীও চঞ্চলা হয়ে উঠলেন। অন্যান্য ডিরেক্টর বন্ধুদের সঙ্গে তার আনাগোনা শুধু কানেই শুনল না, হীরেন চোখেও প্রত্যক্ষ করল।

হীরেন এসে শরণ নিল শচীরঞ্জনের, বলল, 'আর তো পারা যাচ্ছে না দাদা, যাতে সব ভোলা যায় তেমন কিছু একটা পথ বাৎলে দাও তো।'

শচীরঞ্জন হেসে বললেন, 'মকার ছাড়া মুক্তি কোথায়?'

হীরেন বলল, 'মকারের তো কিছু আর আর বাকি রইল না। পঞ্চ মকার তো কবে পার হয়ে গেছি।'

শচীরঞ্জন বললেন, 'তাতে কি হয়েছে। পাঁচেই তো আর সমস্ত মকার শেষ হয়ে যায় নি। এবার তোমাকে ষষ্ঠ মকারে দীক্ষা দিচ্ছি।'

হীরেন বলল, 'সেটি কি?'

শচীরঞ্জন বললেন, 'মর্ফিয়া।'

হীরেন দিন দুই একটু ইতস্তত করল, তৃতীয় দিনে স্বেচ্ছায় এসে অংশীদার হোল শচীরঞ্জনের। প্রতিদিন সূচের ফোঁড়ে দুজনের বন্ধুত্ব গাঁথা হতে লাগল। অন্তরঙ্গতা আরো ঘনিষ্ঠতায় গিয়ে পৌঁছল। 'একজনের চোখে আর একজনের প্রতিবিম্ব একজনের কণ্ঠে

আর একজনের প্রতিধ্বনি।

কিন্তু বড় ব্যয়সাপেক্ষ এই যৌথ-যাত্রা। তার কিছু অংশ তো হীরেনকে বহন করতে হয়। শচীরঞ্জন একা পেরে উঠবেন কেন। তিনিও তো বেকার। হীরেন অবিবেচক নয়। কিন্তু হাত পাতবার আর জায়গা নেই। ব্যাঙ্কের সামান্য পুঁজি বহুদিন শেষ হয়েছে। বাড়িতে নগদ একটি কপর্দকও নেই। দামী আসবাবপত্র যা ছিল, খিড়কি দোর দিয়ে চলে গেছে পুরোনো বাজারে। ঘড়ি-আংটি পেন সোনার বোতাম পর্যন্ত অদৃশ্য। বন্ধুবান্ধবের দরজা বন্ধ। হাতড়ে হাতড়ে যখন কোন পথই আর মিলছে না, তখন শচীরঞ্জনই একদিন বললেন, 'আরে তুমি না একবার বিয়ে করেছিলে?'

হীরেন বলল, 'সে তো পূর্বজন্মে।'

শচীরঞ্জন বললেন, 'তাতে কি, হিন্দু স্ত্রী জন্ম-জন্মান্তরের চাকায় বাঁধা। এদেশের দাম্পত্য সম্পর্ক বিদেশের মত ঠুনকো জিনিস নয়। যাই কিছু হোক, তা ভাঙেও না, মচকায়ও না, পোড়েও না, প্রায় অবিনশ্বর আত্মার মত। তুমি নির্ভয়ে যাও, বউমার একটু খোঁজখবর নিয়ে এস।'

হীরেন নির্ভয়েই এল, কিন্তু ভয় পেয়ে গেল রমা।

হীরেন বলল, 'অমন আঁৎকে উঠলে যে।'

রমা বলল, 'তোমাকে দেখে। একি, তুমি না তোমার ভূত।'

হীরেন একটু হাসল, 'চেহারাটা সত্যিই খারাপ হয়ে গেছে। তা কি করব বল। ঘরের লক্ষ্মী রাগ করে এসে বাপের বাড়ি থাকলে নারায়ণের স্বাস্থ্য এইরকমই দেখায়। তুমি ফিরে চল, দেখবে দুদিনেই দিব্যি কন্দর্পকান্তি বেরিয়েছে।

রমা বলল, 'না।'

হীরেন বলল, 'না মানে! আমি তোমার ভূত হতে পারি, কিন্তু তুমি আমার ভবিষ্যৎ। এই কথাটা বলবার জন্যেই আমি আজ

এসেছি রমা, তোমাকে আমি ফিরিয়ে নিতে এসেছি।'
রমা বলল, 'অসম্ভব। তুমি যা করেছ, তারপর আর ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। আমি যাব না।'
স্ত্রীর ঔদ্ধত্যে হঠাৎ ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ল হীরেনের। বলল, 'যেতে তোমাকে হবেই। যেতে তুমি আইনত বাধ্য।'
রমা বলল, 'বেশ, সেই আইন-আদালতই কর গিয়ে। আমি যাব না।'
কিছুক্ষণ বাদানুবাদ চলল। রমার মা কল্যাণী এসে বললেন, 'এতদিন পরে এসেছে, একটু বিশ্রাম কর বাবা। জলটল খাও। ওসব কথা পরে হবে। তোমার সাথে না গিয়ে যাবে কোথায়, আজ না যায়, দুদিন পরে যাবে।'

কিন্তু দুদিন পরে নয়, আজই স্ত্রীকে নিয়ে যাবে হীরেন। সে অনেক সহ্য করেছে, এক মুহূর্তও সহ্য করতে আর রাজী নয়। তাদের জানতে শুনতে আর কিছু বাকি নেই। এ পাড়ায় তার জন্য জানাশোনা লোক অনেক আছে। তাদের কাছে সব খবরই পেয়েছে হীরেন।' রমার কাণ্ডকারখানার সব কথাই তার কানে গেছে। ঘরের মধ্যে রূপের হাট বসিয়েছে। পাড়ার বকাটে ছোকরাদের মধ্যে খদ্দেরের অভাব নেই।
রমা বলল, 'মজা মন্দ নয়। নিজে কত গঙ্গাজলে ধোয়া সাধুপুরুষ। তুমি আবার আমার দোষ ধরতে এসেছ। বেশ, তেমন হয়ে থাকলে হয়েছে। তুমি যার স্বামী, হাটবাজার ছাড়া তার জায়গা কোথায়?'
অফিস ছুটির পর কেশববাবু বাড়ি এলেন। একটু বাদে এল গোবিন্দ। সবাই মিলে হীরেনকে শান্ত করতে চেষ্টা করল। কিন্তু হীরেন নাছোড়বান্দা। রমাকে সে নিয়েই যাবেই। সে তার বিবাহিতা স্ত্রী। তার ওপর তার ন্যায্য অধিকার আছে।
রমা বলল, 'কক্ষনো সে যাবে না। তার ওপর হীরেনের দরদ তো কত। তার আসল মতলব সে টের পেয়েছে। স্ত্রীর জন্যে মোটেই তার মাথাব্যথা নেই। তার বাক্সের গয়নাগুলির ওপরই তার লোভ।

কিন্তু এ গয়না সে প্রাণ থাকতেও হাতছাড়া করবে না। হীরেনের সাধ্য থাকে মামলা-মোকদ্দমা করে নিক।'
গোবিন্দ অনুনয় করে বলেছিল, 'জামাইবাবু আজ আপনি যান। আমরা ওকে বুঝিয়ে সুজিয়ে রাজী করে কাল বরং পাঠিয়ে দেব।'
হীরেন জবাব দিয়েছিল, 'তোমরা যা পাঠাবে তা আমার জানা আছে। বাসই একই ভাগের কারবারে কারবারী। তা কি আমি টের পাইনি?'

এই সময় গোবিন্দ গিয়ে খবর দিয়েছিল অতুলকে। বিপদে-আপদে অতুল তার সহায়। তার শক্তি-সামর্থ্যের ওপর অনেকখানি নির্ভর করে গোবিন্দ।
দোতলায় আরো জোর চেঁচামেচি শুনে গোবিন্দ বলল, 'আবার কি হোল চল তো দেখে আসি।'
অতুল বলল, 'তুই যা। তোদের এসব ঘরোয়া ব্যাপারের মধ্যে আমি গিয়ে কি করব। যত দেখছি, তত আমার মাথা গরম হচ্ছে, আমি ফিরে যাই।'—বলে অতুল দরজা দিয়ে বেরুতে যাচ্ছিল, হঠাৎ ওপর থেকে কল্যাণীর চীৎকার শোনা গেল, 'তোরা দেখ এসে মেয়েটাকে মেরে ফেল। মাতাল বদমাস কোথাকার। এত বড় সাহস, তুমি আমার সামনে আমার মেয়ের গায়ে হাত তোল?'

অতুলের আর সহ্য হোল না। দু-তিন লাফে সবগুলি সিঁড়ি ডিঙিয়ে ও রমার ঘরে গিয়ে ঢুকল। শক্ত করে স্ত্রীর হাত চেপে ধরেছে হীরেন, বলছে, 'যেতে তুমি বাধ্য, আমি যদি জোর করে তোমাকে নিয়ে যাই, কারো সাধ্য নেই তোমাকে আটকায়—'
'হারামজাদা, শুয়ার, তোমার আটকানো আমি বের করছি। মাতলামির আর জায়গা পাওনি।' বলে পলকের মধ্যে হীরেনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল অতুল, ঘাড়ে হাত দিয়ে বলল, 'বেরোও, এক্ষুনি বেরিয়ে যাও।'
মুহূর্তের জন্যে ঘাবড়ে গেল হীরেন। এমন আচমকা আক্রমণ সে

আশঙ্কা করে নি। তারপর কোনরকমে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একটু সরে দাঁড়িয়ে বলল, 'বটে! কে বাবা তুমি। ওসমান না জগৎসিংহ, ঠিক ঠাওর করতে পারছিনে। কে তুমি? গোবিন্দের নতুন ভগ্নিপতি বুঝি?'

অতুল ধমক দিয়ে বলল, 'চুপ! বেরোও বলছি। বেরিয়ে কথা বল।'

হীরেন বলল, 'আচ্ছা, আচ্ছা, বেরোচ্ছি। কিন্তু এক মাঘে শীত যায় না, কথাটা মনে রেখো বাপ।'

বলতে বলতে হীরেন সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল কাণ্ডটা। কিছুক্ষণের জন্যে কারো মুখে কোন কথা সরল না।

একটু বাদে অতুলের দিকে তাকিয়ে রমা তীব্রস্বরে বলে উঠল, 'তুমি কেন এসেছ এর মধ্যে, তোমাকে কে আসতে বলেছে, কে ডেকেছে তোমাকে?'

অতুল বিস্মিত দৃষ্টিতে রমার দিকে তাকাল, বলল, 'কে আবার ডাকবে? আমি নিজেই এসেছি।'

রমা বলল, 'নিজেই এসেছ। বলতে লজ্জা করে না?'

অতুল বলল, 'না এলে ওই গুণ্ডাটার হাতে তোমার রক্ষা থাকত নাকি।'

রমা বলল, 'ঈস কত বড় রক্ষাকর্তা এসেছেন আমার, কত বড় উদ্ধারকর্তা একজন। আমাকে উদ্ধার করতে কাউকে আসতে হবে না। নিজের উদ্ধারের পথ আমি নিজেই জানি।' অতুলের মুখ দিয়ে হঠাৎ কোন কথা বেরুল না। রমার এই অদ্ভুত আচরণ তাকে স্তম্ভিত করেছে। স্বামীর অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করেছে বলে কোথায় কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে রমা, তা নয়, উল্টে কড়া কড়া শুনিয়ে দিচ্ছে।

কেশববাবু বললেন, 'যাকগে, কেলেঙ্কারী যা হবার খুবই হয়েছে। এবার তুমি বাড়ি যাও অতুল। শত হলেও সে জামাই। একদিন

না একদিন রমাকে স্বামীর ঘর করতেই হবে। হীরেনকে অমন করে অপমান করা তোমার উচিত হয়নি। যা বলবার আমরা বলতাম, যা করবার আমরা করতাম—তুমি কেন এলে এর মধ্যে।'

অতুল সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'আমার ঘাট হয়েছে, আমি মাপ চাইছি মেসোমশাই। আর কোনদিন আসব না, জামাই-মেয়ে যদি খুনোখুনি হয়ে মরে তবুও না। স্বামী হলে তার সাত খুন মাপ, একথা আমার বোঝা উচিত ছিল।'

গোবিন্দ পিছন-পিছনে অনেকদূর পর্যন্ত এল, বলল, 'কিছু মনে করিসনে ভাই, কিন্তু তোরও দোষ আছে। জামাইবাবু লোক ভালো নয় সে তো সবাই জানে। কিন্তু তুইও বড় গোঁয়ার। হঠাৎ অমন করে ঘাড় ধরে বসলি কেন? মুখে দু'চার কথা বললেই হোত। যাক, যা হবার হয়েছে। মামলা-মোকদ্দমার পাল্লায় না পড়তে হয় তাই ভাবছি।' বলে একটা বিড়ি বের করে গোবিন্দ অতুলের হাতে দিল। বিড়িটা ওর হাত থেকে নিয়ে অতুল দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, 'খবরদার, আর কোন কথা বলতে আসিসনে গোবিন্দ। ঢের হয়েছে। তোদের সঙ্গে আমার সব সম্পর্ক এখানেই শেষ। আর নয়।' বলে জোরে জোরে হাঁটতে লাগল অতুল।

গোবিন্দ পিছন থেকে ডেকে বলল, 'আর শোন, ও অতুল শুনে যা। তুই কি ক্ষেপে গেলি নাকি?'

অতুল মুখ ফিরিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, ক্ষেপেই গেছি। তোর ভগ্নিপতির ঘাড়ে কেবল অল্প একটু হাত বুলিয়েছি, কিন্তু তুই শালা যদি বেশী বাড়াবাড়ি করিস, তোর ঘাড় মটকে দিয়ে তবে ছাড়ব। যা সরে যা।' বলে অন্ধকার গলিটার মধ্যে অতুল দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল।

সদর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনে করবী এগিয়ে গিয়ে দোর খুলে দিল, বলল, 'আপনি!'

অরুণ বলল, 'হ্যাঁ, কেন অন্য কারো কি আসার কথা ছিল?'
করবী একটু লজ্জিত হয়ে বলল, 'না তা ছিল না। কিন্তু আপনি আসবেন তাও তো আশা করতে পারিনি। আমরা ভেবেছিলাম আপনি এ পথ ভুলে গেছেন।'
অরুণ পাল্টা অভিযোগ করে বলল, 'আপনারাও যে খুব মনে রেখেছেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়নি।'
করবী ত্রুটি স্বীকার করে বলল, 'সত্যি অনেকদিন ভেবেছি আপনার খোঁজ খবর নিই, চিঠি লিখি। কিন্তু লিখি লিখি করেও লিখে উঠতে পারিনি। বড় অশান্তির মধ্যে আছি।'
অরুণ একটু উদ্বেগের স্বরে বলল. 'কিসের অশান্তি?'
করবী বলল, 'ভিতরে আসুন। বলছি।' দুজনে বৈঠকখানা ঘরে ঢুকল, সন্ধ্যা এখনো হয়নি। কিন্তু একতলার ঘরে এরই মধ্যে অন্ধকার হয়ে এসেছে। সুইচ টিপে আলোটা জেবলে দিল করবী। একটি চেয়ার দেখিয়ে বলল, 'বসুন।'
অরুণ বলল, 'ওরা সব কোথায়? দিলীপ, পিপলু, আপনার শাশুড়ী? কারো অসুখবিসুখ হয়নি তো?'
করবী বলল, 'না, সবাই সুস্থই আছে। পিপলুকে নিয়ে দিলীপ গেছে পার্কে। মা রান্না ঘরে। তারপর আপনার খবর কি বলুন। এতদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকবার মত কি হয়েছিল আপনার?'
অরুণ একটুকাল চুপ করে থেকে বলল, 'এর মধ্যে আমাদের বাড়ীতে দুটি বড় বড় ঘটনা ঘটে গেল। বোনের বিয়ে আর আমার এক মামাত ভাইয়ের মৃত্যু। মনটা তাই নিয়ে কিছু দিন বড় উদ্‌ভ্রান্ত ছিল।'
করবী অরুণকে প্রথম থেকেই নিজের পারিবারিক পরিবেশের মধ্যে নিয়ে এসেছে, কিন্তু অরুণ এতদিন পর্যন্ত তাদের পরিবারের কারো কথা করবীর কাছে উল্লেখ করেনি। করবীর মাঝে মাঝে কৌতূহল হলেও তা সে চেষ্টা করে চেপে রেখেছে। আজ অরুণ নিজ থেকেই

পারিবারিক প্রসঙ্গ তোলায় করবী খানিকটা তৃপ্তি বোধ করল। ওর পারিবারিক গন্ডীতে যেন আরো ঘনিষ্ঠ করে পাওয়া গেছে অরুণকে।

দুর্ঘটনার সংবাদ সহানুভূতি জানিয়ে করবী বলল, 'সে কি! কি করে মারা গেলেন। কত বয়স হয়েছিল তাঁর? আপনার ছোট ছিলেন না বড়।'

অরুণ বলল, 'ছোটই ছিল। অনেক ছোট।'

করবী বলল, 'আহা, কি হয়ে মারা গেলেন?'

অরুণ একটু ইতস্তত করল। আসল কথাটা গোপন করে মিথ্যে একটা অসুখ বিসুখের নাম করবে কি না। কিন্তু কি দরকার। করবী যদি সত্যি ঘটনাই জানে তাহলেই বা কি ক্ষতি। এর আগে দু'একজন সহকর্মীর কাছেও সত্য গোপন করেনি। করবীর কাছেই বা করতে যাবে কেন। অরুণ বলল, 'কোন অসুখবিসুখ নয়। সে সুইসাইড করেছে।'

করবী অস্ফুট স্বরে বলল, 'সেকি।'

অরুণ কোন জবাব দিল না।

করবী একটুকাল চুপ করে থেকে বলল, 'কেন তিনি এমন করতে গেলেন? এত অল্প বয়সে জীবন তাঁর কাছে এমন কি দুঃসহ হয়ে উঠেছিল যে—'

অরুণ বলল, 'কেন করল তা জানা যায়নি। যেটুকু জানা গেছে তা আপনাকে পরে আর একদিন বলব, আজ নয়।'

করবী অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'মাপ করবেন, আমি হয়তো অসঙ্গত কৌতূহল প্রকাশ করে ফেলেছি—'

অরুণ বলল, 'একদিন আপনাকে সবই বলব। আপনি হয়ত সবই জানতে পারবেন কিন্তু আজ—

ভবিষ্যৎ প্রতিশ্রুতির ধরণে করবে যেন একটু লজ্জাবোধ করল। বলল, 'একদিন যে বলতেই হবে তার কি মানে আছে। ফ্যামিলি

সিক্রেট সকলেরই কিছু না কিছু থাকে। বাইরের লোককে তো কোনদিন বলা যায় না, বলা উচিত নয়—'

অরুণ বাধা দিয়ে বলল, 'না না, আপনাকে আমি মোটেই তেমনভাবে বাইরের লোক বলে মনে করিনে।'

পিপলুকে নিয়ে দিলীপ এসে ঘরে ঢুকল। অরুণের শেষ কথাটা তার কানে গিয়েছিল।

দিলীপকে দেখে অরুণই আগে কথা বলল, 'এই যে দিলীপ কেমন আছ।'

দিলীপ একটু গম্ভীর স্বরে বলল, 'ভালো। আপনি ভালো আছেন তো? অনেকদিন আসেন না এদিকে।'

অরুণ বলল, সময় পেয়ে উঠিনি। তারপর তোমার পড়াশুনো কেমন চলছে?'

দিলীপ সংক্ষেপে জবাব দিয়ে বলল, 'ভালো।'

তারপর আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অরুণ এবার পিপলুকে কাছে টানতে চেষ্টা করল, 'এই যে পিপলু এস, এস। তুমি কি ভুলে গেলে নাকি আমাদের?'

কিন্তু পিপলু কিছুতেই কাছে ঘেঁষতে চাইল না। অরুণের হাত এড়িয়ে সে মায়ের আঁচল ধরে দাঁড়াল।

করবী সস্নেহে ধমক দিল ছেলেকে, 'ছিঃ অমন করে নাকি। কাকাবাবু হয় না? কাছে যেতে হয় না ডাকলে। তুমি যে নতুন কবিতাটা শিখেছ সেটা ওঁকে শুনিয়ে দাও তো। কি যেন, হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্থে বল না।'

পিপলু বলল, 'কাকুর কাছে বলব। আমি কাকুর কাছে যাই মা।' বলে একদৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অরুণ হেসে বলল, 'হে মোর চিত্ত আবৃত্তি করলে কি হবে, আপনার ছেলে ভারি সঙ্কীর্ণচিত্ত হয়ে উঠেছে।'

করবী বলল, 'আহা ওর দোষ কি। আপনি আসবেন না, খোঁজ-

খবর নেবেন না, লোকে বুঝি আপনাকে অমনি অমনি মনে রাখবে।'
অরুণ করবীর দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'তা ঠিক. অমনি অমনি মনে রাখা যায় না।'
এই সহজ স্বীকৃতির সবটুকুই যে সহজ নয় তা করবীর বুঝতে বাকি রইল না। কিন্তু বুঝতে পেরেও একথার কোন জবাব দিল না করবী।
'কে বউমা?'
বলতে বলতে নিভাননী এসে দোরের সামনে দাঁড়ালেন। এক হাতে খানিকটা ময়দা লেগে রয়েছে। রাত্রের জন্যে রুটি তৈরি করছিলেন। অরুণকে দেখে বললেন, 'তুমি! অনেকদিন এদিকে আসনি। ভাবলাম ব্যাপার কি অসুখ বিসুখই হোল না কি। বউমাকে বললাম একটা খোঁজ নাও। কিন্তু খোঁজ নেবে কি, মনে কারো শান্তি নেই। ওর চাকরিটা গেছে। এখন কেবল একটা টিউশানি সম্বল।'
অরুণ বিস্মিত হয়ে বলল, 'সে কি। স্কুলের চাকরিটা গেল কি করে?'
করবী একথার কোন জবাব না দিয়ে বলল, 'আপনি বসুন। আমি আসছি।'

খবরটা বিস্তারিত নিভাননী বললেন। স্কুলের আর্থিক অবস্থা ভাল যাচ্ছিল না। কমিটি তাই তিনজন টিচারকে ছাড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যারা নতুন ঢুকেছে, যাদের চাকরি এখনো স্থায়ী হয়নি, তাদেরই আগে বিদায় নিতে হয়েছে।

নিভাননী বললেন, 'এখন কি করে যে, এতগুলি মুখের গ্রাস জুটবে তাই ভাবছি। চাকরিবাকরির যা বাজার—ওর তো চেষ্টার বিরাম নেই। এখানে দরখাস্ত ওখানে দরখাস্ত করেই চলেছে। কিন্তু কিছুই তো হয়ে উঠছে না। এদিকে এত বাড়িভাড়া টানাও শক্ত। আমাদের জন্যে ছোট-খাট একটা বাসা দেখে দাও অরুণ। একখানা ঘর আর রান্নার জায়গা হলেই চলবে। কি করা যায়, যখন যেমন অবস্থা তখন সেইভাবে চলতে হবে তো।'

অরুণ আশ্বাস দিয়ে বলল, 'অত অধীর হচ্ছেন কেন। দেখা যাক না। চেষ্টা চরিত্র করলে চাকরি যে একেবারে জুটবেই না এমনও তো কোন কথা নেই।'

চায়ের কাপ হাতে করবী এসে ঘরে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে নিভাননী থেমে গেলেন। আলোচনাটা বাইরে থেকেই করবীর কানে গিয়েছিল তবু সে কোন কথা বলল না। একটু বাদে নিভাননীই উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, 'যাই ওদিককার কাজকর্ম রয়েছে। তুমি ঘরের ছেলের মত অরুণ। তোমাকে আর বেশি কি বলব।'

অরুণ বলল, 'আপনি কিছু ভাববেন না। আমরা তো আছি। আমাদের সাধ্য কম। কিন্তু চেষ্টা তো করতে পারব।'

নিভাননী ঘর থেকে চলে গেলে করবী বলল, 'আপনার কাছে ঋণীই রয়ে গেলাম। ইচ্ছে ছিল এই মাসে টাকাটা শোধ করব কিন্তু—'

অরুণ বিষয়টাকে হালকা করে দেওয়ার জন্যে তরল স্বরে বলল, 'চাকরিটি তাহলে সত্যিই খুইয়েছেন?'

করবীও একটু হাসল, হ্যাঁ, তাতে কোন সন্দেহ নাই। নতুন কিছু একটা জুটবে কিনা তাই নিয়েই সংশয়।

অরুণ আশ্বাস দিয়ে বলল, 'ঘাবাড়চ্ছেন কেন, অত ভাবনার কি আছে। ব্যবস্থা কিছু না কিছু হয়েই যাবে।'

শুধু মুখেই ভরসা দিল না অরুণ। করবীর চাকরির জন্যে নিজেও নতুন উদ্যমে চেষ্টা চরিত্র শুরু করল। কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে দেখে করবীর হয়ে নিজেই দরখাস্তের খসড়া লিখে দিল। অফিসের টাইপিস্টকে দিয়ে টাইপ করিয়ে আনল সে দরখাস্ত। শুধু স্বাক্ষর ছাড়া করবীর আর কিছুই করবার রইল না।

নিভাননী একদিন কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বললেন, 'তুমি আর জন্মে নিশ্চয়ই ঘনিষ্ঠ আত্মীয় কেউ ছিলে।'

অরুণ বলল, 'আর এ জন্মে বুঝি কেউ নয়?'

নিভাননী বললেন, 'বাঃ আমি কি তাই বলছি।'

অরুণ ভাবে করবীর শাশুড়ীকে মাসীমা কিংবা এই ধরনের কোন আত্মীয় সম্বোধন করবে। কিন্তু ডাকতে গিয়েও ডাকতে পারে না। মুখে আটকে যায়।

খোঁজখবর চেষ্টাচরিত্র চলতে লাগল। কয়েক জায়গা থেকে ইন্টারভিউও পেল করবী। কিন্তু চাকরি জুটবার লক্ষণ দেখা গেল না। আরো একটা টিউশানি জুটল। কিন্তু শুধু টিউশানির টাকায় তো সংসার চলে না। অরুণ মাইনে পেয়ে পঞ্চাশটা টাকা ওর হাতে গুঁজে দিল।

করবী বলল, 'একি?'

অরুণ বলল, 'ধার।'

করবী বলল, 'কিন্তু আগের ঋণ-ই তো শোধ দেওয়া হয়নি।'

অরুণ বলল, 'তাতে কি হয়েছে। পরে সুবিধে মত এক সময় দেবেন।'

করবী মনে মনে সঙ্কোচ বোধ করে. অরুণের কাছ থেকে ক্রমাগত ধার নিতে মন সরে না। কিন্তু সংসারের প্রয়োজনে না নিয়েই বা পারে কই।

একদিন করবী বলল. 'দেখুন. মাঝে মাঝে মনে হয় আমি ভারি স্বার্থপর।'

অরুণ বলল, 'কেন।'

করবী বলল, 'আপনার কাছ থেকে একটানা কেবল নিয়েই চলেছি। কিছুই দিচ্ছিনে. কিছু দিতে পারছিনে।'

অরুণ বলল, 'একেবারেই যে কিছু দিচ্ছেন না তা কি করে বলি।'

করবী একবার অরুণের মুখের দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিল। আজকাল এ ধরণের কথাবার্তা মাঝে মাঝে অরুণ বলে। করবী ভাবে তার প্রতিবাদ করা উচিত। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয় এসব কথার প্রতিবাদ করলে তা আরো অশোভন শোনাবে। তার চেয়ে চুপ করে থাকা ভালো। সত্যি সত্যিই সে কি দিচ্ছে

অরুণকে। করবীর ।কিরবাকার সংক্রান্ত বিষয় নিয়েই অরুণ অফিস ফেরত মাঝে মাঝে আসে। দুজনের মধ্যে তাই নিয়ে আলোচনা বলে। তারপর অরুণ বিদায় নেয়। করবী তাকে দোর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসে। বাস মাত্র এইটুকু। খানিকক্ষণের সান্নিধ্য, খানিকক্ষণের আলাপ আলোচনা ছাড়া কিছুই নয়। তবু অরুণের এই নিত্য যাতায়াত করবীর শাশুড়ী দেওরের যে ভাল লাগে না তা তারা মুখে ফুটে কিছু না বললেও করবীর বুঝতে বাকি থাকে না। নেহাৎই অরুণের কাছ থেকে নানারূপ সাহায্য তাদের নিতে হয়, তাই নিভাননী স্পষ্ট কিছু বলেন না। কিন্তু অরুণের সঙ্গে বেশীক্ষণ তাকে কথা বলতে দেখলে নিভাননী নানা ছলে বারবার করবীকে ডেকে পাঠান। যে কাজটা দু'দণ্ড পরে করলেও চলে, সে কাজটা তখন তখনই করিয়ে নেন। কিংবা পিপলুকে নামিয়ে দিয়ে যান কোলের কাছে। ছেলের উপযুক্ত আদর যত্ন হচ্ছে না বলে খোঁটাও দেন মাঝে মাঝে। শাশুড়ীর কাছ থেকে এই অদাক্ষিণ্যের পরিচয় পেয়ে করবীর মন তাঁর ওপর বিরূপ হয়ে ওঠে। কেন সংকীর্ণতা? তার কি নিজের বন্ধু বলে কেউ থাকতে নেই? তার সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করলে, কথা বললেই কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়? অরুণ তো কেবল করবীরই বন্ধু নয়, সারা পরিবারেরই হিতৈষী। কিন্তু শুধু নিভাননীই নয় দিলীপও অরুণকে যেন তেমন পছন্দ করে না। অরুণকে দেখলেই সে মুখ গম্ভীর করে অন্য ঘরে চলে যায়। অমনিতে বউদির খুবই ভক্ত ফাইফরমায়েস খাটে, সাংসারিক কাজকর্মে সাহায্য করে। কিন্তু অরুণ এলেই যেন প্রকৃতি বদলে যায় দিলীপের। সন্ধ্যার পর অরুণ বিদায় নিয়ে চলে গেলে খেতে বসে দিলীপের রোজই চাকরির কথা মনে হয়। বলে, 'পড়াশুনো আর ভালো লাগছে না বউদি। সংসার চলে না, অন্যের কাছ থেকে ধার দেনা করতে হয়. এঅবস্থায় পড়া মানে বাবুগিরি। তাই না বউদি?'

করবী ধমক দেয়, 'অত বড় বড় কথা না বলে নিজের পড়াশুনোটা মন দিয়ে করতো, যাতে সাত্যিকারের কাজ হবে তাই কর।'
দিলীপ আর কোন কথা বলে না।
শেষ পর্যন্ত এবারও চাকরি জুটে গেল করবীর। তার কাকার বন্ধু শৈলেন সেন ইনকাম ট্যাক্সএর অফিসার। অনেকদিন আগেই সেখানে একটা দরখাস্ত দিয়ে রেখেছিল করবী, ইণ্টারভিউ হয়ে গিয়েছিল। মিঃ সেন ভরসা দিয়ে বলেছিলেন, 'তোমার নাম enlist করা রইল, দেখা যাক কতদূর কি করা যায়' অবশ্য তার বলবার ভঙ্গি দেখে করবী মোটেই আশ্বস্ত হয়নি, কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে নিয়োগ-পত্রটা সেখান থেকেই এল। লোয়ার গ্রেড ক্লার্কের চাকরি। ভাতা শুদ্ধ মাইনে শ'দেড়েক টাকা। স্কুল মাষ্টারি করে করবী যা পেত তার তিন গুণ। শুনে নিভাননী খুবই উল্লসিত হয়ে উঠলেন, বললেন, 'যাক্ এতদিনে ভগবান বোধ হয় মুখ তুলে চাইলেন। কি ভাবনাই যে হয়েছিল তা আর বলবার নয়। দিলু যা কিছু বাতাসা নিয়ে আয়। হরির লুট দেব।'
করবী হেসে বলল, 'মাইনেটা পেয়ে নি তারপরেই না হয় হরির লুঠ দেবেন মা, এখনই কি।'
কিন্তু নিভাননী সে কথা শুনলেন না। দিলীপকে দোকানে পাঠিয়ে দিলেন। হরির লুঠ দেওয়ার উৎসাহ দিলীপেরও কম নয়। বইপত্র রেখে সে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেল।
নিভাননী বললেন, 'বাঁচা গেল বাবা। এবার দু'মাস কষ্ট করে থেকেও পরের দেনাপত্রগুলি আগে শোধ করে দাও। মানসম্মানটা আগে। দেখি এখন আমাকে কে কি বলতে সাহস পায়।'
পরের কথাটা যে কার উদ্দেশ্যে বলা তা করবীর বুঝতে বাকি রইল না। অরুণ পর তো বটেই। তবু কথাগুলি কি অত স্পষ্ট করে না বলে পারতেন না নিভাননী? বিপদে আপদে এতদিন অরুণ যে তাদের সাহায্য করল সেকথা কি সঙ্গে সঙ্গে তাদের পক্ষে ভুলে যাওয়া সঙ্গত হয়েছে?

করবী বলল, 'কেন, এতদিনই বা আপনাকে কে কি বলেছেন?'

নিভাননী বললেন, 'না, বলবে আবার কি। নিজেরা সমঝে চলতে পারলে কার সাধ্য কি বলতে পারে। তবে জানোই তো ও বাড়ির বাঁড়ুয্যে গিন্নী কি ধরণের মানুষ। কেবল ঠেস দিয়ে ঠেস দিয়ে কথা। অরুণ আমাদের কে হয়, রোজ রোজ কি দরকারে আসে এই সব কথা প্রায়ই খুঁটে খুঁটে জিজ্ঞেস করেন।'

করবী বলল, 'আপনি বাঁড়ুয্যে গিন্নীর কাছে আর না গেলেই পারেন। এরপর কখনো আর যাবেন না।'

নিভাননী একটু হাসলেন, 'তা না হয় না গেলাম। কিন্তু পাশের বাড়ির দত্তদের মেজো বউও বললেন—বাড়ির কর্তাদের মধ্যেও নাকি এসব নিয়ে কথা উঠছে।'

করবী ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'কি কথা?'

নিভাননী বলল, 'সে যাকগে। ওসব কথায় আমাদের কিছু এসে যায় না। নিজেরা বুঝেসুঝে চললে কার সাধ্য কি বলতে পারে। বোঝতো বউমা আমাদের মাথার ওপর পুরুষ অভিভাবক নেই। থাকার মধ্যে এক দিলীপ। সে তো নাবালক, ছেলেমানুষ। সংসারের কর্তা বললেও তুমি, কর্ত্রী বললেও তুমি। তোমার ওপরই মান সম্মান সব নির্ভর করছে।'

করবী গম্ভীরভাবে বলল, 'বেশ তো। অরুণবাবুকে এরপর থেকে নিষেধ করে দেব আর যেন তিনি এ বাড়িতে না আসেন। তাঁকে তো আর আমাদের দরকার নেই।'

শেষ কথাটায় বেশ একটু শ্লেষ ফুটে উঠল করবীর গলায়।

নিভাননী বললেন, 'ছিঃ আমি সে কথা বলছিনে। নিষেধ কেন করতে যাবে। অরুণের মত ছেলে হয় না। তার চাল-চলন স্বভাব-চরিত্র এত সুন্দর যে, কেউ তার বিরুদ্ধে কোন কথা বলতে পারবে না। তার সম্বন্ধে একটুও আমার আপত্তি নেই। শুধু নিজেদের একটু সমঝে চলা। পরেশ থাকতেও তো তোর বন্ধুদের সঙ্গে

সমানভাবে মিশেছ, কত চিঠিপত্র লিখেছ, আমি কি আপত্তি করেছি? কেন করব? যখন যেমন দিনকাল তখন সেভাবে চলতে হবে। তা ছাড়া সে নিজেই যখন এসব পছন্দ করত, আমি কেন বাধা দিতে যাব। কিন্তু এখন তো আর সেদিন নেই, এখন যে আমাদের কপাল একেবারে পুড়ে গেছে বউমা।' গলা আর্দ্র হয়ে উঠল নিভাননীর, চোখ দুটো ছল ছল করতে লাগল।

সন্ধ্যার পর অরুণ আজও এল খোঁজ নিতে। নিভাননীই এগিয়ে এসে সুখবরটা দিলেন, 'বউমার তো চাকরি হয়ে গেছে অরুণ আজই জয়েন করেছে।'

অরুণ খুসি হয়ে বলল, 'তাই নাকি। ভালোই তো।' করবীর দিকে তাকিয়ে তরলকণ্ঠে বলল, 'এত বড় খবরটা চেপে রেখেছেন কেন। খাইয়ে দিন, তারপর অফিসের আবহাওয়াটা কেমন লাগল বলুন তো।'

কিন্তু করবী আজ এ ধরণের আলাপে মোটেই যোগ দিল না। চা-ও করে আনল না, দু' এক মিনিট বাদেই উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'কিছু মনে করবেন না অরুণবাবু শরীরটা ভালো লাগছে না, মাথা ধরেছে। আমি যাচ্ছি।'

অরুণ হেসে বলল, 'বলেন কি প্রথম দিনেই মাথা ধরল! ঘাবড়াবেন না প্রথমদিন মাথা অমন একআধটু ধরেই, তারপর দুদিনেই সব ঠিক হয়ে যায়। মাথা বলে যে ঘাড়ের ওপর কিছু আছে, তা টেরও পাওয়া যায় না।'

কিন্তু করবী আজ হাসল না। এসব লঘু পরিহাসের কোন জবাব দিল না। গম্ভীর শুকনো মুখে শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

নিভাননী একবার সেদিকে তাকিয়ে দেখলেন তারপর অরুণকে বললেন, 'তুমি বোস। আমি চা করে আনছি।'

কিন্তু অরুণ সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'না-না চা আজ থাক।

চা আমি একটু আগেই খেয়ে এসেছি।' বলে গম্ভীর মুখে অরুণও বেরিয়ে গেল।

নিভাননী মনে মনে ভাবলেন, একটুতেই রাগ হয়েছে বাছাদের। তা হোক গিয়ে। রাগ না লক্ষ্মী।

পাঁচটার পরে করবী সবে অফিসের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে, চোখে পড়ল, একটু দূরে অরুণ তার জন্যে অপেক্ষা করছে। সহকর্মী দুটি মেয়ে সঙ্গে ছিল। করবী তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অরুণের সামনে এসে দাঁড়াল, 'কি ব্যাপার, আপনি যে এখানে।'

অরুণ বলল, 'আপনার মাথাধরার খবর নিতে এলাম। মাথাটা কি আজ ছাড়ল, না ধরাই আছে। যদি না ছেড়ে থাকে চলুন এক কাপ চা খাই, মাথা ধরায় চা বেশ ভালো ওষুধ।'

করবী হেসে বলল, 'আর যদি ছেড়ে গিয়ে থাকে।'

অরুণ বলল, 'তা হ'লেও আমরা চা খেতে পারি। মাথাধরার পরেও চা-টা বেশ উপভোগ্য।'

করবী বলল, 'ধরলেও চা না ধরলেও চা। আপনার উচিত ছিল কোন চা কোম্পানীর প্রচার সচিবের পদ নেওয়া।'

অরুণ বলল, 'এই দেখুন, আমি যে কোন সচিবপদের যোগ্য একথা আপনি ছাড়া আর কারো মুখ থেকে শুনলুম না। এরপর থেকে আপনাকে নতুন নামে ডাকা উচিত। চারু-ভাষিণী না প্রিয়ংবদা— বলুন কোন্‌টা আপনার পছন্দ।'

করবী হেসে বলল, 'কোনটাই নয়, ওর সবই তো পুরোন।'

অরুণ বলল, 'না আপনি বড়ই নৈতিবাদিনী। নাম পুরোন হ'তে পারে কিন্তু প্রয়োগ তো নতুন, নাম্নী তো নতুনা।'

ট্রাম বাসে দারুণ ভিড়। উঠতে গেলে ঠেলাঠেলি করতে হবে। দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে এসপ্লানেডে এসে পৌঁছল। এখান থেকে পথ আলাদা। একজনের দক্ষিণে আর একজনের বামে।

অরুণ বলল, 'সত্যিই চা খাবেন না?'

করবী বললে, 'চলুন। এবারও যদি না করি আপনি ফের একটা অপবাদ দেবেন।'

দু'জনে চৌরঙ্গীর মোড়ের একটি রেস্টুরেণ্টে গিয়ে ঢুকল। দোতলায় উঠে পশ্চিমদিকের জানালা ঘেঁষে একটি টেবিলে বসল মুখোমুখি। বয় এসে দাঁড়াতেই অরুণ বলল, 'দুটো ভেজিটেবল চপ আর চা।' দুজনেরই আর একদিনের চা খাওয়ার কাহিনী মনে পড়ল। করবী বলল, 'কিন্তু আপনি তো মাংসের কিছু নিলেই পারতনে।'
অরুণ বলল, 'এক যাত্রায় পৃথক ফল কি হয়, আপনি তো নিরামিষ ছাড়া কিছু খাবেন না।'
করবী একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, 'তা নাইবা খেলাম। খাওয়াতে তো পারি। জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই পৃথক ফলকে মেনে নিতে হয়।'
অরুণ বলল, 'কিন্তু যদি না মানা যায় তাতেই বা কি ক্ষতি।'
করবী এবার কোন জবাব না দিয়ে মাথা নিচু ক'রে চামচ দিয়ে এক টুকরো চপ ভেঙে নিল।
অরুণ করবীর দিকে তাকাল। কুমারীর সিঁথির মতই ওর সিঁথি সাদা। পরনে চওড়া কালো পেড়ে সাদা খোলের তাঁতের শাড়ি। হাতে দু'গাছি চুড়ি। গলায় চিক্ চিক্ করছে সরু একছড়া হার। মানিয়েছে। মনেই হয় না করবীর বিয়ে হয়েছিল, সে বিধবা। ওর বয়সে অনেক মেয়েই তো এখনকার দিনে অবিবাহিতা থাকে। সারা জীবনের জন্যে ভবিষ্যতের দ্বার করবীর কাছেই কি রুদ্ধ হয়ে গেল? সে দ্বার কি নতুন ক'রে খুলে দেওয়া যায় না?
করবী বলল, 'ওকি ডেকে এনে আপনি যে হাত উঁচু করে বসে রইলেন। খাচ্ছেন না কিছু? কি দেখছেন চেয়ে চেয়ে, রাস্তার লোকজন?'
অরুণ বলল, 'না লোকজন নয়, দেখুন কি চমৎকার রঙ হয়েছে আকাশের। এমন রঙ তো রোজই হয়, রোজই এমন ক'রে চৌরঙ্গীর

সময় হয় না। চার দেয়াল ঘেরা অফিস ঘরে ফাইলের ওপর মুখ গুঁজে পড়ে থাকি।'

করবী বলল, 'আপনার বুঝি খুব আফসোস হয়?'

অরুণ বলল, 'কেন আপনার হয় না?'

করবী মাথা নেড়ে বলল, 'উহুঁ। রোজ বিকেলের আকাশের নিচে দাঁড়ালেই কি তার দিকে আপনি তাকিয়ে দেখতেন? তার রঙ আপনার চোখে ধরা পড়ত? আর রোজ যদি জোর ক'রে নিয়ম বেঁধে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতেন সে দেখাও হোত অভ্যাসের দেখা। তার চেয়ে এই অনভ্যাসের দেখা ভালো।'

অরুণ বলল, 'মানে আপনি বলতে চান, অনেকদিনের না দেখার আফসোস দু' একদিনের দেখার আকাশে বেশি ক'রে রঙ ধরে।'

করবী হেসে বলল, 'না ওভাবে আমি বলতে চাইনে। কারণ হাজার চেষ্টা করলেও আপনাদের মত কবিত্ব আমি করতে পারব না। আপনিও বুঝি কবিতা লিখতেন?'

বলেই করবীর মুখ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। অনেকদিন বাদে মনে পড়ল, স্বামী পরেশের কথা। সে কবিতা লিখত।

অরুণ করবীর এই ভাবান্তর লক্ষ্য করল কিন্তু কারণ কিছুই বুঝতে পারল না। বলল, 'কি হোল আপনার?'

করবী বলল, 'না কিছুই হয়নি। ভালো কথা, ওঁর সেই বইটা কি বিক্রি-টিক্রি হচ্ছে। অনেকদিন কোন খোঁজ নেওয়া হয় না।'

এবার অরুণ বুঝতে পারল। কবিতা লেখার প্রসঙ্গে স্বামীর কথা করবীর মনে পড়েছে। তেমন যেন প্রসন্ন হোল না অরুণ। বলল, 'বাঃ খোঁজ নিচ্ছি বই কি। কিন্তু জানেনই তো কবিতার বইয়ের বিক্রি তেমন বেশি নয়। আমার সেই পাবলিশার বন্ধু চেষ্টার কোন ত্রুটি করছে না। চলুন না একদিন তার ওখানে?'

অরুণ বলল, 'আমি? আমি গিয়ে কি করব?'

অরুণ বলল, 'কেন, খোঁজ খবর নিয়ে আসবেন।'

করবী একটু হাসল, 'আপনি রাগ ক'রে বলছেন। খোঁজ খবর নেওয়ার ভার তো আপনার ওপর। আমি কি আপনার চেয়ে বেশি খোঁজ নিতে পারব?'

অরুণ লজ্জিত হয়ে বলল, 'তা নয়। তবু আপনি মাঝে মাঝে গেলে ভালো লাগে। বিনয়ও বলেছিল একদিন আলাপ করার কথা।'

করবী বলল, 'বেশ তো যাওয়া যাবে একদিন।'

অরুণ বলল, 'একদিন না, কালই চলুন। কাব্য সাহিত্যের ওপর পরেশবাবুর তো কিছু প্রবন্ধও রয়েছে। সেগুলি নিয়েও তো একটা বই হ'তে পারে।'

করবী উৎসাহিত হয়ে বলল, 'তা তো পারেই। কিন্তু কে ছাপবে বলুন আমার নিজের তো আর সামর্থ্য নেই।'

অরুণ বলল, 'ওই বিনয়ই ছাপবে। ও প্রবন্ধের বই মাঝে মাঝে বের করে। আমার তো মনে হয় পরেশবাবুর লেখা ওর ভালো লাগবে। আমাদের উচিত লেখাগুলি এখনই বুক ফর্মে ধরে রাখা। না হলে পরে হয়তো হারিয়ে যাবে। তাহ'লে কালই চলুন কেমন? ছুটির পর কাল আপনার সঙ্গে ঠিক এই সময় আমি দেখা করব। তারপর দুজনে মিলে—'

দুজনে মিলে কথাটার মধ্যে যেন একটু উৎসাহ প্রকাশ পেল অরুণের। করবী একবার তার দিকে তাকিয়েই তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিল। অরুণের মনে হোল, আকাশের রঙের ছোপ করবীর মুখে এসেও লেগেছে।

একটু বাদে করবী বলল, 'চলুন, এবার ওঠা যাক্।'

অরুণ বলল, 'চলুন।'

ট্রামে ক'রে বাসায় ফিরতে ফিরতে সেই দুজনে মিলে কথাটা করবীর কানে বাজতে লাগল। যেন বই ছাপার ব্যাপারটা উপলক্ষ্য। আসল কথা এই দুজনে মেলা। অরুণ কি তা'হলে এই উদ্দেশ্য নিয়েই রোজ আসে, তার সঙ্গে দেখা করে? তার লক্ষ্য আর কিছু নয়, শুধু

দুজনের মিলন? কিন্তু ছি', এসব কি ভাবছে করবী? অরুণের মত অমন হিতৈষী বন্ধুর সম্বন্ধে এসব মনে করাও অশোভন, অসঙ্গত। অরুণ তো তার কম উপকার করেনি। পরিচয় হওয়ার পর থেকে নানা আপদে বিপদে তাকে সাহায্য করেছে। এমন কি, তারই আগ্রহে উৎসাহে পরেশের কবিতার বই ছাপা হয়ে বেরোতে পেরেছে। অরুণের কাছে চিরজীবনের জন্যে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত করবীর। অবশ্য একথা ঠিক, করবীর সান্নিধ্য তাকে আনন্দ দেয়। অরুণ তার সঙ্গে কথা বলতে, আলাপ করতে, এক সঙ্গে বেড়াতে ভালোবাসে। তাতে দোষ কি, অরুণ যদি বন্ধু না হয়ে করবীর বাপের বাড়ি কি শ্বশুরবাড়ির দিক থেকে কোন আত্মীয়ই হোত তাহ'লে তো মেলামেশায় কোন দোষ থাকতো না। সত্যি, এমন সদালাপী সুহৃদ করবীর আত্মীয় স্বজনের মধ্যেও নেই। নানা চিন্তা ভাবনায়, বিষাদ নৈরাশ্যে মন যখন ভেঙে পড়ে অরুণ এলে অন্তত কিছুক্ষণের জন্যেও সে কথা ভুলে যায় করবী। মনে যেন নতুন উৎসাহ আসে করবীর, কাজে নতুন উদ্দীপনা। একথা তো অস্বীকার করবার জো নেই। কিন্তু স্বীকার করতেই বা দোষ কি, স্বীকার করতেই বা ভয় কি। আত্মীয় না হোক, আত্মীয়ের মত বন্ধু না হয় তার রইলই।

ট্রাম-স্টপেজে নেমে মোড়ের দোকান থেকে দুটি কমলালেবু কিনল করবী। বাসায় এসে দেখল ছেলে ঘুমিয়ে পড়েছে।

করবী শাশুড়ীকে বলল, 'পিপলু যে আজ এত সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়েছে।'

নিভাননী বললেন, 'সকাল সকাল কই। এই সময়ই তো ঘুমোয়। একটু আগে মার কাছে যাব, মার কাছে যাব বলে কি কান্না। তোমার যে এত দেরী হোল।'

করবী হঠাৎ বলে ফেলল, 'অফিসে কাজের চাপ ছিল।'

পরক্ষণেই মনে মনে ভাবল, ছি ছি এমন একটা মিথ্যে কথা কেন সে বলতে গেল। তার মনে যদি কোন ভয়ই থাকবে তাহলে সে সত্য

গোপন করতে গেল কেন। করবী নিজের মনকে যুক্তি দেখাল, ভয় তো করবীর নয়, ভয় নিভাননীর। তিনি পাছে ভয় পান, তিনি পাছে অনর্থ উদ্বেগ বোধ করেন সেইজন্যেই কথাটা একটু ঘুরিয়ে বলেছে করবী আর কোন কারণে নয়।

ঘরে গিয়ে ঘুমন্ত ছেলের কপালে আলগোছে চুমো খেল করবী, কমলা দুটো রেখে দিল পাশে। তারপর স্বামীর ফটোর দিকে তাকাল। অনেকদিন আগের একটা মালা শুকিয়ে রয়েছে ফ্রেমের ওপর। ছি ছি ছি কতদিন ধ'রে নতুন মালা দেওয়া হয় না ওঁর ফটোয়। কি করে দেবে। এতদিন ফুলের দিকে লক্ষ্য ছিল নাকি করবীর। পয়সা ছিল নাকি ফুল কিনবার। কিন্তু চার পয়সার ফুলও কি কিনতে পারত না। ফুল তিনি কত ভালোবাসতেন। কতদিন এক সঙ্গে ফুল কিনে দুজনে মিলে বাড়ি ফিরেছে।

দুজনে মিলে! আর একজনের কথা মনে পড়ল করবীর, আর একজনের মুখ মনে পড়ল। কিন্তু জোরে জোরে মাথা নেড়ে মন থেকে তার চিন্তা যেন ঝেড়ে ফেলে দিতে চাইল করবী। না, এখন আর কেউ নয়, কোন আত্মীয় নয়. এখন শুধু সে আর তার স্বামী। নাই বা রইল সে কাছে, নাই বা রইল ঘরে। করবীর মন থেকে তো কেউ তাকে সরিয়ে নিতে পারবে না! মনের মধ্যে তো সে চির অক্ষয়, চির-জীবন্ত। কালই আসবার পথে ফুলের মালা কিনে আনবে করবী, আনবে রজনীগন্ধার তোড়া। রজনীগন্ধা ভারি ভালোবাসত পরেশ। ফুলদানীটা কোনদিনই খালি থাকত না।

রাত্রে জলখাবার খেয়ে ঘরে বসে স্বামীর পুরান লেখাগুলি খুলে নিয়ে বসল করবী। এর থেকে বেছে বেছে কয়েকটা প্রবন্ধ নিয়ে বেশ একখানা বই করা যাবে। অরুণ নিজেই যখন উপযাচক হয়ে বলেছে এ সুযোগ হাতছাড়া করা উচিত নয়।

একটু বাদে নিভাননী এসে দোরের কাছে দাঁড়ালেন, 'এত রাত জেগে

কি করছ। সারাদিন খেটে খুটে এসেছ, যাও এখন শুয়ে ঘুমোও গিয়ে। ওগুলি আবার কি বের করেছ।'

করবী বলল, 'ওঁর লেখা, ভেবেছি একটা প্রবন্ধের বই বার করব।'

নিভাননী ঘরে ঢুকে পুত্রবধূর পাশে এসে বসলেন। একটু চুপ ক'রে থেকে আস্তে আস্তে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'ঘরের টাকা খরচ করে বই ছেপে আর কি হবে বউমা। বিক্রী যখন হয় না।'

করবী শাশুড়ির দিকে তাকাল, 'বিক্রি হওয়াটাই বুঝি সব? আজ বিক্রি না হয় দুদিন পরে হবে। ওঁর লেখার কদর একদিন লোকে করবেই। তাছাড়া অরুণবাবু বললেন, ঘরের টাকা খরচ করতে হবে। না মা। ও'র সেই পাবলিশার বন্ধুই নিজের খরচে এ বই ছেপে বের করতে পারেন।'

নিভাননী একটু যেন চমকে উঠলেন, 'অরুণ! অরুণের সঙ্গে তোমার আবার কোথায় দেখা হোল। সে তো আজ এখানে আসেনি।'

করবী একটু অপ্রতিভ হোল। কিন্তু এবার আর মিথ্যে কথা বলতে চেষ্টা করল না। অরুণের সঙ্গে তার যদি দেখা হয়ে থাকে, কথা হয়ে থাকে স্বামীর বইয়ের প্রসঙ্গেই হয়েছে।

করবী বলল, 'না এখানে নয়, ছুটির পর আমাদের অফিসের কাছেই তিনি এসেছিলেন। তখন এই বইয়ের কথা উঠল।'

নিভাননী বললেন, 'ও, কিন্তু একটু আগে তো তুমি এসব কথা কিছু বললে না বউমা। তখন যে বললে অফিসের কাজে—'

করবী রুক্ষস্বরে বলল, 'হাঁ, অফিসের কাজও ছিল, এবার এ কাজও ছিল। সব সময় সব কথা মানুষের মনে থাকে নাকি। আপনি যদি কথায় কথায় এমন কৈফিয়ৎ তলব করেন, অবিশ্বাস করেন তাহলে তো ঘরের বারই হওয়া যায় না।'

নিভাননী আহত হয়ে বললেন, 'ছিঃ এসব তুমি কি বলছ বউমা। এর মধ্যে কৈফিয়ৎ তলবেরই বা কি আছে, অবিশ্বাসেরই বা কি আছে। তুমি আমাকে এত বড় একটা কথা বললে। আমি কোন কথা বললেই

তুমি আজকাল অমন কর। নিতান্তই পোড়াকপাল আমার। নইলে শেষে-কিনা বউয়ের রোজগারের ভরসায় থাকতে হয়। মানুষের সব যায়, কিন্তু পেটের জ্বালা যেন যায় না।'

নিভাননীর গলা ধরে উঠল, চোখ দুটো ছল ছল করতে লাগল।

করবী বিব্রত বোধ ক'রে বলল, 'আমাকে মাপ করুন মা। আমি ওসব কিছু ভেবে বলিনি। আমি কি আপনার পর যে, আপনি ওসব কথা তুলছেন? আপনার যদি আর একটি রোজগেরে ছেলে থাকত আমার মত আর একটি মেয়ে থাকত তাহলে সেও কি চাকরি করত না? তার টাকা কি আপনি না নিয়ে পারতেন? এখন বাধ্য হয়েই আমাকে কাজে বেরোতে হচ্ছে। দু'দিন পরে দিলীপ যখন উপযুক্ত হবে, পিপলু যখন বড় হবে, যখন রোজগার করবে, তখন তো আর এত কষ্ট করতে হবে না। ওরাই তো আমাদের আশা ভরসা। যান, শুয়ে বিশ্রাম করুন গিয়ে।'

অনেক রাত্রে করবীর ঘরে আলো জ্বলতে দেখে তার ঘুম ভেঙে গেল। 'ও কি বউমা, এত রাত অবধি জেগে জেগে করছ কি? শরীর খারাপ করবে যে।'

কোন জবাব না পেয়ে নিভাননী ফের এসে করবীর ঘরে ঢুকলেন। তক্তাপোশের ওপর করবী বিভোরে ঘুমুচ্ছে। আর পরেশের লেখা প্রবন্ধের ফাইলটা তার হাত থেকে খসে পড়ে লুটোচ্ছে মাটিতে। নিভাননী মুহূর্তকাল দাঁড়িয়ে কি দেখলেন। তারপর ফের একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে ছেলের লেখাগুলি কুড়িয়ে তুলে রাখলেন টেবিলের ওপর। তারপর সুইচটা অফ্ ক'রে দিয়ে বিছানায় শুয়ে ঘুমন্ত নাতিকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন।

পরদিন অফিসে গিয়ে করবী স্থির করল অরুণের সঙ্গে আজ আর সে [illegible] দোকানে যাবে না। তাকে বলবে অরুণ নিজেই আগে

যাক, প্রবন্ধের বইটি সম্বন্ধে কথাবার্তা বলুক, তারপর তিনি যদি বই ছাপতে রাজি নহ, তখন একদিন না হয় করবী অরুণকে সঙ্গে নিয়ে তার পাবলিশার বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করবে। আজ করবী সকাল সকাল বাড়ি ফিরবে। স্বামীর ফটোতে দেওয়ার জন্য ফুলের মালা কিনবে, আসবার সময় পিপলু লজেন্সের বায়না ধরেছিল, লজেন্স কিনে নিয়ে যাবে তার জন্যে। আজ আর সে অন্য কোথাও বেরোবে না।

পাঁচটার আগে আগেই অফিস থেকে বেরোল করবী। দু'চার পা এগুতেই দেখল। রাস্তা পার হয়ে অরুণও এদিকে আসছে। করবী কিছু বলবার আগেই অরুণ বলল, 'আপনি অপেক্ষা করে থাকবেন তাই খবরটা দিতে এলাম। আজ আমাদের বিনয়ের ওখানে যাওয়া হবে না।'

করবীও না যাওয়ার সিদ্ধান্ত করেছিল। কিন্তু সে কথা গোপন করে কৌতূহলের ভঙ্গিতে বলল, 'কেন বলুন তো। হঠাৎ আপনার মত বদলাবার কি কারণ ঘটল। বিনয়বাবুর ওখানে গিয়ে কোন সুবিধে হবে না মনে করছেন বুঝি?'

মৃদু হাসল করবী।

কিন্তু অরুণ হাসল না। ওর মুখ বিষণ্ণ গম্ভীর।

অরুণ বলল, 'না তা নয়, বিনয়ের সঙ্গে যোগাযোগের কোন সুযোগই করে উঠতে পারি নি। সকাল থেকেই মনটা বড় উদ্বিগ্ন রয়েছে।'

করবী বলল, 'কেন বলুন তো।'

অরুণ বলল, 'আমার ভাই আছে আর জি কর হাসপাতালে। তাকে দেখতে যেতে হবে।'

করবী বলল, 'কি হয়েছে আপনার ভাইয়ের।'

অরুণ একটু ইতস্তত করে বলল, 'কাল রাত্রে দত্তবাগানের কাছে গুণ্ডার ছুরিতে সে আহত হয়েছে। রাস্তার লোক ধরাধরি করে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছে। আমি সোজা সেখানেই যাব।'

করবী আঁৎকে উঠে বলল, 'কি সাংঘাতিক ব্যাপার। এখন অবস্থা কেমন?'

অরুণ বলল, ঠিক করে বলা যায় না। যতদূর শুনেছি আঘাতটা মারাত্মকই। ডান দিকের কাঁধের একটু নীচে লেগেছে।'

ট্রাম লাইন পর্যন্ত করবী অরুণকে এগিয়ে দিতে এল। অরুণ ট্রামে উঠতে গিয়ে হঠাৎ বলল, 'আচ্ছা এক কাজ করুন না। আপনিও আমার সঙ্গে আসুন। তারপর যদি ওকে একটু ভালো দেখি ফেরার পথে পাবলিশারের দোকান হয়ে আসা যাবে।'

করবী বলল, 'পাবলিশারের দোকান-টোকান আজ থাক অরুণবাবু। আপনার ভাই সুস্থ হয়ে উঠুন তারপর ওসব দেখা যাবে। চলুন আপনাকে বরং এগিয়েই দিয়ে আসি। আপনি যেমন নার্ভাস হয়ে পড়েছেন—'

অরুণ বলল, 'না না নার্ভাস হব কেন। নার্ভাস হই নি। তবে—'

তবু করবী তার সঙ্গে আসায় অরুণ খুশিই হোল। অতুলের সঙ্গে করবীর পরিচয় নেই। কদাচিৎ দু' একবার অরুণের মুখে সে অতুলের নাম শুনে থাকবে, কিন্তু অরুণের উদ্বেগে যে করবীও উদ্বিগ্ন হয়েছে সহানুভূতির ছোঁয়া লেগেছে তার মনে তা বুঝতে পেরে অরুণ তৃপ্তি বোধ করল। বেলগেছিয়াগামী ট্রামে লেডিজ সিট মার্কা একটা বেঞ্চে দুজনে বসল পাশাপাশি।

করবী বলল, 'আপনার এই ভাইয়ের কথা এর আগে আমাকে কখনো বলেন নি। কার কথাই বা বলেছেন।'

অরুণ বলল, 'না কারো কথাই বলিনি। পরিবারের লোকজনের সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ট নয়। সব চেয়ে দূরের সম্পর্ক আমার আপন ভাই অতুলের সঙ্গে। আমাদের দুজনের মধ্যে শিক্ষাদীক্ষা রুচি প্রকৃতিতে কিছুমাত্র নেই। আমি ভাবতাম সেইজন্যে বুঝি স্নেহ সহানুভূতিরও অভাব আছে। ভেবেছি ওর বিপদে আমার কিছু এসে যায় না।'

করবী বলল, 'তাই কি আর হয়। শত হলেও আপন ভাই তো তিনি আপনার। দেখুন একজনের সম্বন্ধে আর একজনের স্নেহ ভালোবাসা মনের কোথায় যে লুকিয়ে থাকে তা অনেক সময় টের পাওয়া যায় না। কিন্তু হঠাৎ এক এক সময় তা জানান দেয়।'

অরুণ বলল, 'একথা জানা আর এমন কঠিন কি। এ ধরনের সাধারণ অভিজ্ঞতা সকলের জীবনেই দু' একবার হয়।'

যেতে যেতে অতুলের আরো অনেক কাহিনী করবীর কাছে বলতে লাগল অরুণ। একমাত্র পড়াশুনোতেই ওর ভয়, তা ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে ভয় কাকে বলে ও জানে না। ওর দুঃসাহসের অন্ত নেই। দাঙ্গার সময় ভিন্ন সম্প্রদায়ের অনেকে ওর হাতে জখম হয়েছে, আবার বস্তীর অনেক বিপদাপন্ন নারী আর শিশুকে ও আশ্রয়ও দিয়েছে। পাড়াপড়শীর শাসন তিরস্কারে ভ্রূক্ষেপ করেনি। তখনকার দিনের অনেক লাঠি ছোরার আঘাতের দাগ লক্ষ্য করলে ওর গায়ে এখনো হয়ত দু' একটা মেলে। আর একবার দুর্ধর্ষ এক খুনি ডাকাতের পিস্তল শুদ্ধ হাত ও চেপে ধরেছিল। থানা থেকে পঁচিশ টাকা পুরস্কার দিতে এসেছিল ওকে। সে পুরস্কার ও নেয়নি। বলেছিল, 'ও টাকা আপনাদের জমাদার দফাদারদেরই ভাগ করে দিন গিয়ে। আমার ওতে দরকার নেই। আমি যা করেছি পুরস্কারের লোভে করিনি।'

করবী জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু এই দুর্ঘটনা ঘটল কি করে? কারো সঙ্গে কি ওঁর কোন শত্রুতা ছিল?'

এমন চরম শত্রু যে ওর কে তা অরুণ ভালো করে জানে না তবে মেজাজ তো অতুলের ভালো নয়। অনেকের সঙ্গেই ওর রাগারাগি চটাচটি দিনের মধ্যে বহুবার হয়ে থাকে। দু'চারবার চড় ঘুষির বিনিময়ও যে না হয় তা নয়। কিন্তু ওকে খুন করে ফেলতে চেষ্টা করবে এমন মারাত্মক শত্রু যে কে তা অনুমান করা শক্ত। খানিকটা দূরের একটি বিড়ির দোকানের ছোকরার মুখ থেকে ঘটনার কিছু কিছু জানা গেছে।

রাত সাড়ে দশটা এগারটায় দ্রুত সাইকেল চালিয়ে আসছিল অতুল। হঠাৎ দুজন কালো জোয়ান মত লোক ওর সামনে এসে দাঁড়িয়ে সাইকেল থামিয়ে দিয়ে বলল, 'লোকের গায়ের ওপর দিয়ে সাইকেল চালাও, ইয়ার্কি পেয়েছ নাকি?'

অতুল বিস্মিত হয়ে বলেছিল, 'তোমরা বা কোথায় ছিলে আমি বা কোথায়?

সাইকেল কি বাতাসে তোমাদের গায়ে গিয়ে উড়ে পড়ল! আমার সাইকেল ছেড়ে দাও। যেতে দাও আমাকে।'

বলে সামনের লোকটিকে একটি ধাক্কা দিয়েছিল অতুল। আর সঙ্গে সঙ্গে দুজন লোকই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, 'এত বড় আস্পর্দা! আমাদের গায়ে হাত তুলিস তুই?'

আর্ত চীৎকারে বিড়ির দোকানের ছোকরাটি যখন ঘর থেকে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিল, তখন সেই দুজন লোক সরে পড়েছে। আর রক্তাক্ত সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ঝোপের ধারে পড়ে আছে অতুল। চীৎকার চেঁচামেচি শুনে আশেপাশের অনেকেই তখন সেখানে গিয়ে ভিড় জমিয়েছিল। কিন্তু আততায়ীদের কোন সন্ধান মেলেনি। পুলিসে ডায়রী করা হয়েছে। খোঁজ খবর নিয়ে যতদূর জানা গেছে লোক দুটি ভাড়াটে গুণ্ডা। অতুলের সঙ্গে তাদের নিজের কোন শত্রুতা ছিল না। টাকার বিনিময়ে তারা অন্যের শত্রুতার শোধ নিয়েছে।

হাসপাতালের সামনে ট্রাম এসে থামল। কম্পাউণ্ডের ভিতর ঢুকে এগিয়ে করবী হঠাৎ থেমে দাঁড়াল, 'আপনি গিয়ে দেখে আসুন আপনার ভাইকে, আমি এখানে অপেক্ষা করছি।'

অরুণ বলল, 'না না, আপনিও চলুন।' করবী ইতস্তত করে বলল, 'তার চেয়ে আমি বরং এখানে অপেক্ষাই করি। আপনাদের বাড়ির অন্য সব আত্মীয়স্বজনও নিশ্চয়ই এসেছেন। তাঁদের সঙ্গে তো আমার পরিচয় নেই। তাঁরা হঠাৎ আমাকে দেখলে কি মনে করবেন।'

অরুণ চেষ্টটু ইতস্তত করল। তাইতো। একথা তো সে ভাবে নি।

কিন্তু পরমুহূর্তে সমস্ত দ্বিধা সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বলল, 'তাতে কি হয়েছে। পরিচয় নেই, পরিচয় হবে। ওঁদের সঙ্গে আপনাকে পরিচিত করাবার দায়িত্ব আমার। আর যদি ততখানি ভরসা আমার ওপর আপনার না থাকে নিজের পরিচয় কি আপনি নিজেই দিতে পারেবন না? আসুন আপনি।'

দোতলায় সার্জিক্যাল ওয়ার্ডের একটি রুমে গিয়ে দুজনে ঢুকল। করবীর অনুমান সত্যিই। অরুণের বাবা মা কাকা কাকীমা সবাই এসে অতুলের বেডের চারদিকে ঘিরে দাঁড়িয়েছেন। ব্যান্ডেজ-বাঁধা অতুল সারা বিছানা জুড়ে পড়ে রয়েছে। খানিকটা জ্ঞান ফিরে এসেছে আজ। জ্বরের ঘোরে মাঝে মাঝে ভুল বকছে।

অরুণরা ঘরে ঢুকতেই বাসন্তী তাদের দিকে তাকালেন। এ মেয়েটি আবার কে। পরিচয় করিয়ে দিতে হোল না, বলে দিতে হলো না, বাসন্তীর মনই বলে উঠল এ সেই করবী। মেয়েটির রূপ আছে বটে। কিন্তু রূপ যেমন আছে তেমন তো ওর নিজের ঘর সংসার আছে, ছেলে আছে। এত সব থাকতেও তাঁর ছেলের পিছু নিয়েছে কেন। রূপ থাকলে কি মানুষের আর কোন বিচার বিবেচনা থাকতে নেই?

ছেলের দিকে চেয়ে বাসন্তী বললেন, 'এতক্ষণে ছুটি হোল তোর?'

বাসন্তীর হয়ে অবনীমোহনই জবাব দিলেন, 'বিপদের আশঙ্কা একেবারে কাটেনি। তবে সকালের চেয়ে অনেকটা ভালো।'

তিনিও একবার করবীর দিকে চেয়ে দেখলেন। কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। নিজের ভাইয়ের যখন জীবনমৃত্যুর আশঙ্কা সে সময়ে বান্ধবী ছাড়া অরুণের চলল না। ছেলের এই নির্লজ্জতায় অবনীমোহনও মনে মনে অপ্রসন্ন হলেন।

অরুণ বুঝতে পারল করবীকে সবাই ওঁরা চিনেছেন। অন্তত মনে মনে আন্দাজ করে নিয়েছেন। করবী তাদের বাড়িতে না [illegible] লেও, একটি সুন্দরী তরুণী বিধবার সঙ্গে অরুণের ঘনিষ্ঠতা হয় এবং [illegible]কে

সে বিপদে আপদে সাহায্য করে, একথা পরিবারের কারোরই আর জানতে বাকি নেই। তবু প্রকাশ্যভাবে সকলের সঙ্গে করবীর পরিচয় করিয়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু বলি বলি করেও অরুণ যেন হঠাৎ কিছু বলে উঠতে পারল না। এই সময় হাসপাতালের ঘণ্টা পড়ল। আর পাঁচ মিনিট রোগীর কাছে তার আত্মীয়স্বজনেরা থাকতে পারে।
'চল বড়দি, আর কেন এবার ওঠা যাক।'
'অত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন। আরো তো মিনিট পাঁচেক সময় আছে।'
গোবিন্দ আর রমা। অতুলের দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ওরাও এসেছে। অতুলের আত্মীয়দের কাছ থেকে একটু দূরে বিচ্ছিন্নভাবে দাঁড়িয়ে রোগীর যন্ত্রণাকাতর মুখের দিকে তাকিয়েছিল। এতক্ষণে ওদের অস্তিত্ব যেন ভুলে ছিলেন বাসন্তী। এবার রমার মুখের দিকে তাকিয়ে ফের চোখ ফিরিয়ে নিলেন। করবীও তার এই প্রায় সমবয়সী মেয়েটির দিকে তাকিয়ে দেখল। মেয়েটি স্থির দৃষ্টিতে অতুলের দিকে চেয়ে রয়েছে। খয়েরী রঙের একখানা সস্তা সাড়ী পরনে। সিঁথিতে সিঁদুরের অস্পষ্ট আভাস দেখে সধবা বলেই চেনা যায়। কে এই মেয়েটি? অতুলদের সঙ্গে এর সম্পর্কই বা কি? করবী মনে মনে একটু কৌতূহল না হয়ে পারল না।
আর একবার ঘণ্টা বাজল। বাসন্তী টুলটা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। দরজার দিকে পা বাড়ালেন সবাই। করবী এবারও লক্ষ্য করল বেরুবার আগে সেই মেয়েটি আগে সেই মেয়েটি অতুলের দিকে আর একটু এগিয়ে গেল। আর একবার নির্ণিমেষে তাকিয়ে তাকিয়ে কি দেখল। তারপর আস্তে আস্তে চলে বেরিয়ে এল।
বাইরে নেমে করবী বাসন্তীকে দেখিয়ে বলল, 'উনিই বুঝি আপনার মা?'
অরুণ লজ্জিত হয়ে বলল 'হ্যাঁ। চলুন এবার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি।'
করবী বলল, 'থাক না। ও'রা হয়ত বিব্রত বোধ করবেন। আর সব চেয়ে বেশি বিব্রত হবেন আপনি।'

অরুণের আত্মসম্মানে খোঁচা লাগল এবার। বলল, 'বাঃ, বিব্রত হওয়ার কি আছে।'

দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে বাসন্তীর মনোযোগ আকর্ষণ করল অরুণ, 'মা ইনিই করবী, করবী বসু। এ'র কথা অনেকবার তোমাকে বলেছি।'

করবী নিচু হয়ে প্রণাম করতে যেতেই বাসন্তী তাড়াতাড়ি ওর হাত ধরে ফেললেন, 'হ্যাঁ, আপনার কথা অরুণ অনেক দিন বলেছে।'

করবী বলল, 'আপনি বলছেন কেন মা। আমি তো আপনার মেয়ের বয়সী। আমাকে তুমিই বলবেন। অরুণবাবু আমার কথা সব আপনাদের বলেছেন, কিন্তু আপনাদের কথা সব গোপন করে গেছেন। আমি তাই নিজেই এলাম আলাপ করতে।'

খুব তো বিনয় আছে মেয়েটির, আর কথা বলবার ভঙ্গিটি তো ভারি সুন্দর। গলার স্বরটুকুতো বেশ মিষ্টি, খানিকক্ষণ আগের বাসন্তীর অপ্রসন্নতা যেন অনেকটা প্রশমিত হয়ে এল, আর ভারি চমৎকার সুগঠিত ছোট ছোট যুঁই ফুলের মত দাঁতের সার। হাসলে সুন্দর মানায়। বাসন্তী করবীর কথার জবাবে বললেন, 'গোপন তো করবেই। বাড়ির বাইরে গেলে আমাদের কারো কথা ওর মনে থাকে নাকি।'

করবী বলল, 'আসল কথা তা নয়, ও'র ধারণা নিজেদের বাড়িঘরের কথা বাড়ির বাইরের কাউকেই বলতে নেই।'

একে একে অন্য সকলের সঙ্গেও করবীর পরিচয় করিয়ে দিলেন বাসন্তী। তারপর অতুলের কথায় ফিরে গিয়ে বললেন, 'বড় অশান্তিতে আছি মা। ডাক্তার আজ ভরসা দিয়ে গেছেন তাই তোমার সেঙ্গ দুটো কথা বলতে পারছি। এই ছেলে নিয়ে মহা জ্বালা হয়েছে আমার। এই সব অপঘাতেই একদিন ও শেষ হবে।'

করবী বলল, 'কি যে বলেন। পুরুষ ছেলের বিপদ আপদ এমন ঘটেই।'

অতুলের সম্বন্ধে করবীর পুরুষ ছেলে বিশেষণ প্রয়োগটা অরুণ লক্ষ্য না করে পারল না।

শ্যামবাজারের মোড় পর্যন্ত হেঁটে এসে একই ট্রাম ধরল সবাই। রমারাও আসছিল পিছনে পিছনে। একই বেঞ্চে করবী তার পাশে গিয়ে বসল। বলল, 'কই আপনার সঙ্গে তো পরিচয় হোল না?'

'আমার নাম রমা।'

করবী বলল, 'রমা চন্দ? আপনি কি ওঁদের আত্মীয়?'

রমার মুখ একটু আরক্ত দেখাল। 'আজ্ঞে না। রমা চ্যাটার্জি। সম্পূর্ণ অনাত্মীয়। আমার ভাই অতুলের সহপাঠি বন্ধু। তাই দেখতে এসেছিলাম।'

করবী বলল, 'ও।'

মনে মনে ভাবল, কিন্তু যেভাবে তুমি দেখলে তাতো শুধু ভাইয়ের বন্ধুকে দেখা নয়।

মীর্জাপুরে এসে বাসন্তীরা সবাই নামলেন। করবীকেও নেমে তাঁদের বাসাটা দেখে যাওয়ার জন্যে অনুরোধ করলেন। কিন্তু করবী রাজী হোল না। বলল, 'আজ থাক। আর একদিন আসব।'

অরুণ বলল, 'আর একদিন কেন। আজই চলুন না। ফেরার সময় বরং এগিয়ে দিয়ে আসা যাবে।'

করবী মৃদু হেসে বলল, 'অনেক ধন্যবাদ।'

তারপর বাসন্তীর দিকে সবিনয়ে বলল, 'আর একদিন আসব। আজ রাত হয়ে যাচ্ছে। কালও অফিস থেকে ফিরতে দেরি হওয়ায় ছেলে বড় কান্নাকাটি করেছিল। আজ তাকে বলে এসেছি তাড়াতাড়ি ফিরব। না দেখলে আজও হয়ত ওর ঠাকুরমাকে বিরক্ত করবে।'

ছেলের ওপর করবীর এত দরদ দেখে নিজের ছেলের সম্বন্ধে অনেকটা আশ্বস্ত হলেন বাসন্তী। তাহলে মেয়েটির তিনি যা ভেবেছিলেন তা সে নয়। করবীর দিকে তাকিয়ে এবার তিনি সস্নেহে বললেন,

'তাহলে আর তোমাকে দেরি করতে বলব না। কিন্তু কথা দিয়ে যাও ছেলেকে নিয়ে আর একদিন আসবে।'

করবী স্মিতমুখে সম্মতি জানাল, 'আচ্ছা আসব।'

করবীদের সংসারে এবার খানিকটা শান্তি আর স্বাচ্ছন্দ্য আসবার কথা।

চাকরির দিক থেকে খানিকটা নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে করবী। মাইনে যা পাবে তাতে সংসারে খরচ মোটামুটি চলে যাবে। দেনাদায়গুলিও ধীরে ধীরে মিটিয়ে দিতে পারবে। এখন কোনরকম অশান্তি থাকবার কথা নয়। তবু অশান্তির যেন আর অন্ত ছিল না। শাশুড়ীর আর দেওরের সঙ্গে সামান্য কারণ নিয়ে খিটিমিটি লাগা যেন নিত্যকার ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই মনান্তর নিয়ে খুব জোর গলায় ঝগড়া হয় না। তবু মনের অমিলটা বোঝা যায়। কেউ যে কারো ওপর প্রসন্ন নয়, নেহাৎই বাধ্য হয়ে এক বাড়িতে রয়েছে, তা টের পেতে কারো আর বাকি নেই। করবী লক্ষ্য করেছে নিভাননী তার সঙ্গে প্রায় কথাই আর আর আজকাল বলতে চান না। দিলীপের মারফৎই কাজকর্ম সারেন। এমন কি ফিরতে একটু দেরী হলে দিলীপই এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে, 'বউদি, এত রাত করলে কেন।' কোনদিন করবী জবাব দেয়, 'দরকার ছিল।' কোদিন বা বলে, 'তুমি ছেলেমানুষ তোমার এত কথায় কাজ কি। যাও, পড়াশুনো কর গিয়ে।' কিন্তু ছেলেমানুষ সঙ্গে সঙ্গে চলে যায় না। খানিকক্ষণ উদ্ধত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে, তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে করবীর মুখের দিকে, তারপর দ্রুত পায়ে তার সামনে থেকে সরে যায়।

মাঝে মাঝে ভারি দুঃসহ লাগে, অত্যন্ত নীরস মনে হয় জীবন। স্নেহ নেই, প্রীতি নেই, মায়া নেই, কেবল কর্তব্য আর কর্তব্য। ভেবে আতঙ্ক হয় এই শুষ্ক কর্তব্যের বোঝা সারাজীবন করবী বয়ে বেড়াবে কি করে। একথা মনে হওয়ায় দৈনন্দিন অফিসের কাজকেও একঘেয়ে লাগে করবীর।

সমস্ত মনটা উন্মুখ হয়ে থাকে ছুটির জন্যে। ছুটির পরে প্রায় রোজই এসে অরুণ তার জন্যে অপেক্ষা করে। এই দেখাসাক্ষাৎ যেন নিয়মিত অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের। কিন্তু এ অভ্যাসে ক্লান্তি নেই। তা ছাড়া রোজ ঠিক এক জায়গায় তারা যায় না, এক ধরণের আলাপ করে না। গল্প করতে করতে গঙ্গার ঘাটগুলি তারা পরিক্রমা করে। কোনদিন বা কোন একটা রেস্টুরেন্টে ঘণ্টা দেড়েক কাটিয়ে দেয়। যেদিন অরুণ কোন কারণে আসতে পারে না, কিংবা শাশুড়ী দেবরের খোঁটার ভয়ে করবী নিজেই অরুণকে না জানিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যায়, সেদিন করবীর নিজেরই শেষ পর্যন্ত খারাপ লাগে। কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা মনে হয়, সেই ফাঁক ভরে তুলবার জন্যে দু'এক দিনের বেশি দূরে সরে থাকতে পারে না। একদিন যদি দূরে থাকে পরদিন নিজেই যেচে গিয়ে খোঁজ নেয়। এই এগুনো-পিছুনো ভাবটা অরুণের মধ্যেও যে আছে, তা করবীর বুঝতে বাকি নেই। অরুণের মনের ভাবও ধরা পড়ে গেলে তার কাছে। কখনো বই, কখনো ফুলের তোড়া, কখনো টুকিটাকি জিনিসপত্রও তাকে আজকাল দেয় অরুণ। দিতে সাহস করে। করবী ভাবে ওকে ধমকে দেবে, কিন্তু জোর পায় না। গঞ্জনাটা কখন যে মৃদু গুঞ্জনে নেমে আসে, করবী টেরও পায় না। টের যে একেবারে পায় না তা নয়। টের পেতে ভয় পায়। আর ভয় পেয়ে যত দূরে সরে যেতে চায়, ততই যেন কাছে এগিয়ে আসে।

নিজের মনের দশা বুঝতে পেরে বহুবার করবী নিজেকে নিজে ধিক্কার দেয়, শাসন করে। ছি ছি ছি, এ সব কেন! অরুণের সঙ্গলাভের জন্য কেন এই স্পৃহা, কেন এই কাঙালপনা। তার ছেলে আছে, তার ওপর নির্ভর করে আছে তার নাবালক দেওর আর বৃদ্ধা শাশুড়ী, তার কি এসব কাজে? ব্যক্তিগত সুখ তার জন্যে নয়। করবী শুধু তার সংসারের জন্যে আছে, সংসারের জন্যেই থাকবে! অফিস থেকে ফিরে এসে বাড়িতেই থাকে। ছুটির দিনটা বাড়িতেই কাটায়।

একবার থেকে দুবার করে গুছায়, ছেলেকে আদর করে, দেওরের পড়াশোনার খোঁজ নেয়, শাশুড়ীর প্রিয় নিরামিষ তরকারীগুলি তৈরী করতে বসে কিন্তু নিজের বুঝতে বাকী থাকে না, সে মনকে আঁখি ঠারছে। এ জীবন নব, জীবনের খোলস—সংসার নয়, সংসার সংসার খেলা অভিনয়। সত্যিকারের জীবন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে, তার দিকে বার বার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। কিন্তু তার হাত ধরতে যে হাত কাঁপে, ধরতে যে বুক কাঁপে করবীর, লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে হয়। এই দ্বিধা, এই অন্তর্দ্বন্দ্বের হাত থেকে বাঁচাবে কে? এই যে মুহূর্তে মুহূর্তে মরা, এর হাত থেকে তাকে কে রক্ষা করবে?

সেদিন শনিবার। সকাল সকাল অফিস ছুটি হয়ে গেছে। অন্য দিনের মত আজও অরুণ এসে দাঁড়াল। কিন্তু করবী আজ মনে মনে দৃঢ়সঙ্কল্প করেছে। আজ আর সময় নষ্ট করবে না, সোজা চলে যাবে বাড়িতে। শুধু আজ নয় রোজ। অরুণের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ, কথাবার্তার মাত্রা কমিয়ে আনতে আনতে ধীরে ধীরে বন্ধ করে দেবে। পাড়ার লোকের কানাঘুষার ভয়ে নয়, বাড়ির লোকের অসন্তুষ্টির ভয়ে .নয়, শুধু নিজেকে বাঁচবার জন্যে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে করবীকে।

অরুণ বলল, 'ব্যাপার কি, আজ এত তাড়াতাড়ি পালাচ্ছেন কোথায়?'

করবী বলল, 'কাজ আছে বাড়িতে।'

অরুণ বলল, 'কাজ তো রোজই থাকে। কিন্তু আজ যে আরো কথা আছে। কাজের চেয়ে তা নেহাৎ কম জরুরী নয়।'

করবী বলল, 'কিন্তু আমার মনে হয়, আপনার সব কথাই অজরুরী। একদিনের কথা আর একদিন বললে কোন ক্ষতি হয় না।'

অরুণ গাম্ভীর্যের ভাণ করে বলল, 'কিন্তু আজকের বক্তব্য ভিন্ন রকম। আজকের কথা আজই বলতে হবে, বাসি করলে চলবে না।'

করবী অপরূপ ভ্রূভঙ্গী করে বলল, 'শুনে যেন ভয় ভয় লাগছে।'

গভর্ণমেণ্ট প্লেস দিয়ে দুজনে পূবমুখী হেঁটে চলছিল। একখানা গাড়ি প্রায় গা ঘেঁষে গেল করবীর। অরুণ হাত ধরে তাকে খানিকটা নিজের দিকে টেনে এনে বলল, 'ব্যাপার কি! ভয় এড়াবার জন্যে গাড়ি চাপা পড়তে চান নাকি।'

করবী বলল, 'তা অত সহজ নয়।'

করবীর হাতখানা তখনো অরুণের মুঠির মধ্যে। আস্তে আস্তে করবী হাত ছাড়িয়ে নিল। মনে মনে ভাবল, এবার সব ছাড়তে হবে। নইলে দিনের পর দিন যেভাবে জড়িয়ে পড়ছে, তাতে কোনদিন আর মুক্তি মিলবে না। কিন্তু মুক্তিই যে তার একমাত্র কাম্য, সেকথা করবী জোর করে ভাবতে পারে কই, জোর করে বলতে পারে কই।

একটু বাদে করবী বলল, 'আপনার জরুরী কথাটা এবার বলুন। শুনে নিয়ে ট্রামে উঠি।'

অরুণ বলল, উঁহু, অত তাড়াতাড়ি আজ আপনি ট্রামে উঠতে পারবেন না। নিজের জন্মদিনে এমন করে ফাঁকি দেবেন ভাবছেন বুঝি?'

জন্মদিন! এতক্ষণে করবীর মনে পড়ল। মাসখানেক আগে কথায় কথায় বয়সের হিসাব ওঠায় নিজের জন্মদিনের কথাটা অরুণকে বলেছিল করবী। অরুণ যে তা মনে করে বসে আছে, তা ভেবে শুধু অবাকই লাগল না, আনন্দও লাগল। বাবা মা বেঁচে থাকতে খুব ছেলেবেলায় জন্মদিন পালন করা হোত। তাঁরা মারা যাওয়ার পর ও পর্ব উঠেগেছে। বিয়ের পরে স্বামীর জন্মদিন আর বিবাহবার্ষিক পালন করত। কিন্তু তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সে সব অনুষ্ঠানও শেষ হয়েছে। নিজের জন্মদিনের কথাটা ভুলেই গিয়েছিল করবী। অরুণের প্রশ্নের জবাবে হেসে বলল, 'তা আমার মত মহাজনের জন্মদিনটা কিভাবে যাপন করবেন শুনি।? আমার কাছে দু'কাপ চায়ের দাম আছে। যদি খান তো খাওয়াতে পারি।'

অরুণ মাথা নেড়ে বলল, 'উঁহু, অত অল্পে আজ ফাঁকি দিতে পারবেন না, শুধু চা নয়।'

করবী বলল, 'তাহলে চলুন আমাদের বাড়িতে। ক্ষুদকুঁড়ো যা আছে তার ভাগ পাবেন।'

অরুণ বলল, 'আপনার বিনয়ের তুলনা নেই। কিন্তু আপনাদের বাড়িতেও আজ আর যাব না। তার চেয়ে চলুন শহরের বাইরে কোথাও ঘুরে আসি। এই ইঁট, কাঠ, লোহা-লক্কড়ের খাঁচার মধ্যে বন্দী থাকতে থাকতে প্রাণ যেন হাঁপিয়ে উঠেছে। চলুন বেরোই। কাছাকাছি কোন গ্রামে গিয়ে চোখ মেলে বসে থাকব! তারপর সন্ধ্যার অন্ধকারে যখন আর কিছু দেখা যাবে না, তখন ফের উঠে বসব গাড়িতে।'

করবীর মন উল্লসিত হয়ে উঠল। কথাটা মন্দ নয়। অন্য দিনের মত রেষ্টুরেণ্ট কিংবা গঙ্গার ঘাটে বসে গল্প করার চেয়ে অরুণের প্রস্তাবে নতুনত্ব আছে। সত্যি অনেকদিন শহরের বাইরে যায় নাই। অফিস আর বাড়ি, বাড়ি আর অফিস করতে করতে জীবনে যেন একঘেয়ে হয়ে উঠেছে।

তবু করবী একটু ইতস্তত করতে লাগল, 'ঠিক সময়ে ফেরা যাবে তো?'

অরুণ বলল, 'ফেরা যাবে বইকি।'

করবী বলল, 'রাত হবে না তো বেশি?'

অরুণ বলল, 'রাত হয়ত হবে, কিন্তু বেশি হবে না।'

যাব কি যাব না করতে করতে আরো কিছুক্ষণ ইতস্তত করল করবী। চা খেতে খেতে সময় কাটল আরো খানিকটা। তারপর দুজনে হাওড়া স্টেশনের বাস ধরল।

টিকিট কেটে ভিড় ঠেলে একখানি মধ্যম শ্রেণীর কামরায় করবীকে নিয়ে উঠে বসল অরুণ।

করবী বলল, 'কোথাকার টিকেট কাটলেন?'

অরুণ মৃদুস্বরে জবাব দিল, 'ভয় পাবেন না—টিকেট দুখানা

নিরুদ্দেশের নয়, দূরদেশেরও নয়, নেহাৎই কাছাকাছি কোন গ্রাম দেশের।'

স্টেশনের নাম মণিরামপুর। ছোট্ট গ্রামের স্টেশন। তবু লোকজন নেহাৎ কম নামল না। করবীকে ইতস্তত করতে দেখে অরুণ বলল, 'কি করবেন, হাঁটবেন? না ওয়েটিংরুমে চুপচাপ বসে থাকবেন?'

করবী বলল, 'চুপচাপ বসেই থাকব, কিন্তু ওয়েটিংরুমে নয়।'

অরুণ খুশি বলল, 'আমারও সেই কথা। তাহলে চলুন এই মাঠটা পার হওয়া যাক।'

মাঠ হয়ে গ্রাম। গ্রামের কোল দিয়ে আবার মাঠ। দুজনকে যেন চলার নেশায় পেয়েছে।

অবশেষে করবী এক সময় পিছনের দিকে তাকাল, 'ঈস, কতদূর এসে পড়েছি। চলুন এবার ফেরা যাক।'

অরুণ বলল, 'এই মাইল দুই আড়াই হেঁটে আপনার যা অবস্থা হয়েছে, তাতে এক্ষণি ফিরতে হলে আপনাকে কাঁধে নিয়ে ফিরতে হবে। তার চেয়ে চলুন এই যে একটা পুকুরঘাটের মত দেখা যাচ্ছে, ওখানে খানিকক্ষণ বসে জিরিয়ে নিই।'

করবীকে রাজী হতে হোল।

পুকুরটা প্রায় শুকনো। পুরোন ভাঙগা সিঁড়িগুলির ফাটল দিয়ে ঘাস গজিয়েছে। পকেট থেকে রুমাল বের করে খানিকটা জায়গা ঝেড়ে অরুণ বলল, 'বসুন।'

ধারে কাছে আর কোন জনমানব নেই। শুধু নিজের হৃদপিণ্ডের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ শুনতে পাচ্ছে না করবী। সামনের দিকটা ঘন বাঁশঝাড়ে আচ্ছন্ন। তার ওপর সন্ধ্যার পাতলা অন্ধকার নেমেছে। অরুণ বলল, 'সেই জরুরী কথাটা বলি বলি করে কিছুতেই বলা হচ্ছে না। কিন্তু আর না বললেই নয়।'

করবী জানে, আজ সেই চরম কথা ওর না শুনে উপায় নেই। বলবার সমস্ত সুযোগ আর সাহস দিনে দিনে সেই দিয়েছে অরুণকে। আজ

বাধা দিলে শুনবে কেন?
তবু বাধা দেওয়ার চেষ্টা করল করবী। বলল, 'এতদিনই যদি না বললে চলে থাকে, আজও চলবে। কোন কথার দরকার নেই অরুণ-বাবু। চলুন আমরা ফিরি। বেশি দেরী করলে আজ আর বোধ হয় ফিরতে পারব না।'
অরুণ কোন কথা খুঁজে পেল না। কিন্তু পকেটে হাত দিয়ে একটি জিনিস খুঁজে পেল। ছোট্ট একটি লেডীজ সেফার্স তুলে নিয়ে করবীর হাতে পেনটা গুঁজে দিল অরুণ—বলল, 'নিন জন্মদিনের উপহার।'
করবী বলল, 'এ আবার কি। এ দিয়ে কি হবে। এতে তো আমার কোন দরকার নেই।'
অরুণ বলল, 'একথার জবাবে বলতে ইচ্ছে হয়—

তোমায় কিছু দেব বলে চায় যে আমার মন।
নাইবা তোমার থাকল প্রয়োজন।

কি ভাগ্য যে, গানে আর কবিতায় আপনি বলে কোন কথা নেই। সব কেবল তুমি আর তুমি। কিন্তু করবী, আমরা কি আমাদের গদ্য থেকেও এই সম্বোধনের দূরত্ব ঘুচিয়ে দিতে পারিনে? আরো কি কাছাকাছি আসতে পারিনে আমরা?'
করবী ওর হাতের মুঠো থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিল না, নিতে পারল না। কি যেন বলতে গেল, কিন্তু মুখ থেকে কথা বেরুল না। এই অনিবার্য পরিণতির কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া যেন আর কোন উপায় নেই।
খানিকক্ষণ বাদে করবী ফের বলল, 'এবার ওঠা যাক।'
স্টেশনে এসে শোনা গেল ঘণ্টাখানেকের মধ্যে গাড়ি নেই। দুজনে ওয়েটিংরুমে চুপচাপ বসে রইল। পাশাপাশি থেকেও কেউ কোন কথা বলল না। আর যেন কিছু বলবার নেই, আর যেন কিছু বলবার প্রয়োজন নেই।

কলকাতায় ফিরতে ফিরতে রাত সাড়ে বারটা বেজে গেল। ট্রাম-বাস সব বন্ধ। অরুণ হাওড়া স্টেশন থেকেই একটা ট্যাক্সি নিল।

করবী বলল, 'আমি একাই যাব। আমি একাই যেতে পারব।'

অরুণ বলল, 'অসম্ভব। এত রাত্রে তোমাকে একা যেতে দিতে পারিনে।'

করবী বলল, 'কিন্তু দুজনে যাওয়ার পরিণাম—'

অরুণ বলল, 'যে পরিণামই হোক, তা আমরা দুজনেই ভোগ করব।'

ট্যাক্সী এসে করবীদের বাড়ির সামনে থামল। কড়া নাড়তে নিভাননী এসে দোর খুলে দিলেন। দিলীপ ঘুমায় নি। নিজের ঘরে বসে বই নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল।

কিন্তু বইতে মন ছিল না। গাড়ির শব্দে সে-ও দোরের কাছে এসে দাঁড়াল।

করবী বেরিয়ে এসে নিঃশব্দে ভিতরে ঢুকল।

নিভাননী তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'একেবারে না ফিরলেই তো হোত।'

একথার কেউ কোন জবাব দিতে চেষ্টা করল না।

অরুণ বলল, 'বিশেষ একটা দরকারী কাজে—'

নিভাননী বাধা দিয়ে বললেন, 'থাক, কৈফিয়তের আর কোন দরকার নেই।'

বেলা সাড়ে তিনটা বাজতে না বাজতেই রমা বেরুবার উদ্যোগ করছিল, তার মা কল্যাণী বাধা দিয়ে বললেন, 'কোথায় যাচ্ছিস।'

রমা সংক্ষেপে জবাব দিল, 'হাসপাতালে।'

কল্যাণী বললেন, 'অতুলকে দেখতে বুঝি?' রমা একথার কোন জবাব দিল না।

কল্যাণী বললেন, 'এখন তো শুনেছি সেরে উঠেছে। দু' একদিনের

মধ্যেই ওরা ছেড়ে দেবে। এখন তোর রোজ রোজ যাওয়ার কি দরকার।'
রমা বলল, 'গেলামই বা। তাতেই বা কি।'
কল্যাণী রূঢ় কণ্ঠে বললেন, 'তাতেই বা কি। তুই এখন আর ছেলেমানুষ নস রমা। ভালো মন্দ বুঝবার তোর যথেষ্ট বয়স হয়েছে।'
রমা অদ্ভুত একটু হাসল, 'তাতো হয়েইছে। কিন্তু তোমরা তা বুঝতে চাইছ কই।'
কল্যাণী খানিকক্ষণ গুম হয়ে থেকে বললেন, 'বুঝতে পারব না কেন বাপু, খুবই বুঝতে পারছি। আমি তো আর তোমার পেটে হইনি, তুমি আমার পেটে হয়েছ। সারা পাড়া ভরে ঢি ঢি পড়ে গেছে। তোর জন্যেই নাকি ছোরা খেয়েছে অতুল। ছি ছি ছি।'
মুহূর্তের জন্য রমার মুখখানা আরক্ত হয়ে উঠল। মার চোখ থেকে চোখ নামিয়ে নিল। পরক্ষণেই সোজাসুজি তাকাল তাঁর দিকে। দৃঢ় স্পষ্ট স্বরে বলল, 'তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে তো ওকে আমার দেখতে যাওয়াই উচিত মা।'
কল্যাণী বললেন, 'যাওয়াই উচিত? কথাটা বলতে তো লজ্জা করল না?
রমা বলল, 'না। কেন লজ্জা করবে। লজ্জা যে ওকে পিছন থেকে ছোরা মেরেছে তার। যে নিজে ওর সঙ্গে গায়ের জোরে পারেনি রাতের অন্ধকারে গুন্ডা লেলিয়ে দিয়েছে, লজ্জায় মরতে হয় সে মরুক। আমার কিসের লজ্জা।'
কল্যাণী বললেন, 'তোর লজ্জা না থাকতে পারে কিন্তু আমরা যে মুখ দেখাতে পারছিনে। আমার তো আরো পাঁচটি ছেলে-মেয়ে আছে। তাদের বিয়ে-থা দিতে হবে, তাদের ভবিষ্যৎ দেখতে হবে। কেবল তোর খামখেয়ালি নিয়ে থাকলেই তো আমার চলবে না।'
রমা বলল, 'চলতে বলে কে তোমাকে।'
তারপর খাবারের পুঁটলি হাতে সোজা বেরিয়ে এল।
কল্যাণী পেছন থেকে চেঁচাতে চেঁচাতে বললেন, 'ভালো হবে না রমা, ভালো হবে না বলে দিচ্ছি। আপিস থেকে আসুক আজ বাড়িতে,

তারপর তোর তেজ যদি আমি না ভাঙি কালী মুখুজ্জের মেয়ে নই আমি।'

রমা ভ্রূক্ষেপ করল না। মোড়ের চায়ের দোকান থেকে পাড়ার একটি বকাটে ছোকরা মন্তব্য করল, 'এই যে হাসপাতাল যাওয়ার সময় হয়ে গেছে। যাই বলিস ভাই এমন ছোরা খেয়েও লাভ আছে।'

রমা ওদের দিকে না তাকিয়ে হন হন করে সামনের দিকে এগিয়ে চলল।

ওদের কথায় কান দিয়ে তার জবাব দিলে ওদের প্রশ্রয়ই দেওয়া হবে। হাসপাতালে যখন এসে পৌঁছল, রোগীদের আত্মীয়স্বজন দু' একজন করে আসতে শুরু করেছে। অতুলদের বাড়ি থেকে এখনও কেউ আসেনি। তারা আজকাল পাঁচটার আগে কেউ আসে না। তারা আসতে না আসতেই রমা চলে যায়। অতুলের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে কথা বলবার জন্যে বেছে বেছে এই সময়টুকুই রমা ঠিক করেছে। অতুলের দু' পাশের দুটি বেড খালি হয়ে গেছে। জায়গাটা অপেক্ষাকৃত জনবিরল। একটা টুল টেনে নিয়ে রমা বসল অতুলের বিছানার কাছে।

অতুল দেয়াল-ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আজ এত দেরি করলে কেন?'

রমা বলল, 'বাঃ দেরি কোথায়! এই তো সবে চারটে দশ।'

অতুল বলল, 'দশ মিনিটই বা কেন দেরি করবে। এই দশটা মিনিটই তো লোকসান।'

রমা বলল, 'তুমি তো সেরে উঠেছ। এখন একেবারে না এলেই বা কি।'

অতুল বলল, 'তাই নাকি। তাহলে তুমি যাতে রোজ আসতে পার তার জন্যে সারাজীবন আমাকে একটা না একটা অসুখ বানিয়ে শুয়ে থাকতে হয়। তুমি কি কেবল চিরকাল আমাকে বিছানায় শোয়া দেখতেই চাও? আমি সুখে আছি, সুস্থ আছি, হেঁটে চলে কাজকর্ম

করে বেড়াচ্ছি তা বুঝি তোমার দেখতে ইচ্ছে করে না রমা?'

অতুল হাত বাড়িয়ে ওর হাতখানা চেপে ধরল। রমা এদিক ওদিক তাকিয়ে তাড়াতাড়ি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'ছিঃ ছাড়। তোমার অসুখ সারল, কিন্তু প্রলাপ বকুনিটা সারল না।'

অতুল বলল, 'প্রলাপ? একে তুমি প্রলাপ বলছ?'

রমা বলল, 'প্রলাপ ছাড়া কি।'

অতুল বলল, 'মোটেই প্রলাপ নয়। এই আমার সত্যিকারের অন্তরের কথা। এ আমি হাজার লোকের সামনেও বলতে পারি।'

কিন্তু একজন নার্স এদিকে এগিয়ে আসতেই অতুল তাড়াতাড়ি চুপ করল। রমাও টুলটা একটু সরিয়ে বসল। নার্স মুখ টিপে হেসে এগিয়ে গেল সামনের দিকে।

খানিকক্ষণ দুজনেই চুপ করে রইল। রমা এবার খাবারের কৌটোটা খুলতে যাচ্ছিল; কার পায়ের শব্দে মুখ তুলল, তার ছোট ভাই গোবিন্দ।

দুজনের দিকে একটু তাকিয়ে নিয়ে গোবিন্দ বলল, 'এই যে অতুল আজ কেমন আছিস।'

অতুল বলল, 'শুনছি তো পরশু দিনই ছেড়ে দেবে। ছেড়ে দিলেই এখন বাঁচি। আর কাঁহাতক শুয়ে থাকা যায়?'

গোবিন্দ বলল, 'তা ঠিক। বিশেষ করে তোর মত লোকের শুয়ে থাকা তো শক্তই।'

তারপর রমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বড়দি, কতক্ষণ এসেছ?'

রমা বলল, 'এই খানিকক্ষণ হোল। তুই যে আজ সকাল সকালই চলে এলি? অফিস ছুটি হয়ে গেল?'

গোবিন্দ বলল, 'ছুটি কি আর হয়েছে? ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে এলাম ঘণ্টাখানেক আগে। কিন্তু এসেও কি শান্তি আছে। বাড়িতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই—'

বলতে বলতে গোবিন্দ হঠাৎ থেমে গেল।

রমা বলল, 'সঙ্গে সঙ্গে কি?'
গোবিন্দ বলল, 'না কিছু না। দিদি আজ তুমি আর দেরি কোরো না। তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে যাও। বাড়িতে দরকার আছে।'
রমা গম্ভীর মুখে বলল, 'আমি যদি বলি এখানেও আমার দরকার রয়েছে!'
গোবিন্দ বলল, 'বললেই ত হবে না। এখানকার দরকারের জন্যে তো আমিই রইলাম। অতুলদের বাড়ি থেকে যতক্ষণ কেউ না আসে আমি এখানে বসব, ওর সঙ্গে গল্প টল্প করব। ওর খাওয়া হয়ে গেলে কৌটোটাও আমিই সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারব। তার জন্যে তোমার থাকবার দরকার হবে না। পিণ্টু মিণ্টু দুজনেরই জ্বর। মা'র একা একা সব দিক সামলাতে কষ্ট হচ্ছে। তুমি এবার চলে যাও দিদি।'
রমা বলল, 'মা'র কষ্টের জন্যে তো তোমার কত ভাবনা। আমার বুঝতে আর কিছু বাকি নেই।'
গোবিন্দ বলল, 'বুঝতেই যদি পেরে থাক তাহলে তোমার এক্ষুণি চলে যাওয়া উচিত বড়দি। আমি ছোট ভাই হয়ে বলছি তুমি আর একটুও দেরি কোরো না।'
রমা খানিকক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল। তারপর টুল ছেড়ে উঠে তীরের মত বেগে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।
রমার পরিত্যক্ত টুলটায় গোবিন্দ এসে বসল। অতুলের ঘন চুলের মধ্যে আস্তে আস্তে হাত বুলাতে বুলাতে বলল, 'আজ তোকে গোটা কয়েক কথা বলব অতুল। বল রাগ করবি নে?'
অতুল গোবিন্দের দিকে তাকাল, 'রাগের কথা হলে নিশ্চয়ই রাগ করব।'
গোবিন্দ বলল, 'না তাহলেও রাগ করতে পারবি নে। তুই আমার ছেলেবেলার বন্ধু। সুখ দুঃখের সাথী। তোকে যেমন ভালোবাসি তেমনি পৃথিবীতে আমি কাউকেই ভালোবাসিনে। তোর গা ছুঁয়ে

বলছি, কোন মেয়েকেও না। বন্ধুর সঙ্গে কোন মেয়ের ভালোবাসার তুলনা হয়?'
অতুল আস্তে আস্তে বলল, 'তা হয় না। তুই কি বলবি বল?'
গোবিন্দ তবুও ভূমিকা করে চলল। ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে যত দুঃসাহসিক কাজ করেছে তার উল্লেখ করল। পরীক্ষার সময় অতুলের নকল করার সাহায্য করতে গিয়ে ধরা পড়ে মার খেয়েছে, নিজের সখের কলম বিক্রী করে অতুলের জরিমানার টাকা জুগিয়েছে, বন্ধুর জন্যে ছোট বড় এমনি নানা স্বার্থত্যাগের কাহিনী আজ নিজের মুখে বর্ণনা করতে লাগল গোবিন্দ। অবশ্য অতুলও তার জন্যে কম করেনি। সে তার শারীরিক শক্তি দিয়ে বন্ধুকে রক্ষা করেছে। গোবিন্দের বিন্দুমাত্র অপমানও সহ্য করেনি। নিজের বিপদের ঝুঁকি নিয়ে বন্ধুর মান রক্ষার জন্যে বড়লোকের পাহারাওয়ালাকে ঠেঙিয়েছে, থানা পুলিসের সঙ্গে ঝগড়া করেছে, কাউকে পরোয়া করেনি। অতুলের সেই সব কীর্তিকাহিনীর কথাও গোবিন্দ উল্লেখ করতে ভুলল না। 'সংস্কৃতের পণ্ডিতমশাই আমাদের বলতেন মাণিকজোড়। তোর মনে আছে অতুল?'
অতুল বলল, 'আছে।'
গোবিন্দ বলল, 'তিনি অবশ্য ঠাট্টা করেই বলতেন। কিন্তু আমরা সেটাকে ঠাট্টা ভাবিনি। আমরা তাকে সত্যি করে তুলছি। কত জনের কত গভীর বন্ধুত্ব ভেঙ্গে যেতে দেখলাম, কিন্তু আমাদের জোড় আজও ঠিক আছে। সেই জোড় তুই ভেঙ্গে দিসনে অতুল। আমার কথা শোন। আমার বড়দিকে তুই ছেড়ে দে। তার বদলে তুই যাকে চাস আমি তাকেই দেব। আমার সবচেয়ে ভালোবাসার মেয়েকেও তোকে এনে দেব অতুল, কিন্তু আমার বড়দির দিকে তুই কুনজর দিসনে ভাই। তা আমি সহ্য করতে পারব না।'
অতুল বলল, 'কি যা তা বাজে কথা বলছিস গোবিন্দ, তুই থাম। চুপ কর।'

গোবিন্দ বলল, 'না তুই আমাকে কথা দে, তবেই থামব। দেখ, কেউ আমরা সাধু পুরুষ নই। মেয়েমানুষের ওপর আমাদের সবারই লোভ আছে, কিন্তু তাই বলে বন্ধুর বোন, বন্ধুর বউ আমরা বাদ দিয়ে চলি। বন্ধুর ঘর নষ্ট করিনে। তুইও তা করতে যাসনে অতুল। তোর নামে আর বড়দির নামে পাড়া ভরে কুৎসা রটবে এ আমি সহ্য করতে পারব না। ওর একবার বিয়ে হয়ে গেছে। ওকে তো তুই আর বিয়ে করতে পারবিনে। স্বামীর সঙ্গে ওর আজ বনিবনা হচ্ছে না, কিন্তু দুদিন পরে হতেও তো পারে। সেই পথে তুই কাঁটা দিসনে অতুল, তুই আমার বড়দিকে ছেড়ে দিস, দোহাই—'

অতুল স্থির দৃষ্টিতে বন্ধুর মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, 'তুই এবার যা গোবিন্দ। আমাদের বাড়ির সবাই এখন এসে পড়বে।'

গোবিন্দ বলল, 'যাচ্ছি। কিন্তু তুই আমাকে কথা দে।'

অতুল বলল, 'দিলুম। আমি তোদের সবাইকেই ছেড়ে দেব গোবিন্দ। কাউকেই ধরে রাখব না, কাউকেই আটকে রাখব না। আমি তোদের সকলের চোখের আড়ালে গিয়ে থাকব।'

অপমানে আর অভিমানে অতুলের গলা বুজে এল। গভীর ক্লান্তিতে চোখ বুজল অতুল।

গোবিন্দ উঠে আসবার আগে আর একবার ওর কপালে সস্নেহে হাত রেখে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলল, 'তুই যতই আড়ালে যাস অতুল আমার চোখ কিছুতেই এড়াতে পারবিনে। আমি তোকে খুঁজে বার করবই।'

দিন দুই পরে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এল অতুল। এই দুদিনের মধ্যে রমা আর আসেনি। কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগতে লাগল অতুলের। বেরিয়ে অনেক লোকজন আর আত্মীয়স্বজনের মধ্যে এসেও সেই শূন্যতা যেন আর কিছুতেই ভরতে চাইল না। অতুল

বুঝতে পারল রমার ইচ্ছা থাকলেও আর আসতে পারছে না। ছোট বড় সবাই মিলে তাকে আটকে রেখেছে। তার আর বেরুবার জো নেই। কিন্তু অতুল গিয়ে কি দেখা করতে পারে না তার সঙ্গে? না গোবিন্দ যে সব কথা বলেছে তার পর আর ওদের বাড়িমুখো হতে পারে না অতুল। মান-সম্মান বিসর্জন দিতে পারে না।

বাসন্তী ছেলের দাড়িভরা মুখে হাত বুলিয়ে বললেন, 'ঈস কি চেহারাই না হয়ে গেছে। এখন আর বাড়ি থেকে বেরিয়ে দরকার নেই। হৈ হৈ না করে দিন কয়েক বিশ্রাম কর। সময় মত নেয়ে খেয়ে শরীরটাকে শুধরে নে।

কিন্তু শরীর শোধরানো পর্যন্ত সবুর সইল না অতুলের। দু' তিন দিন পরেই চাকরির চেষ্টায় বেরোল। রমা আর গোবিন্দর সঙ্গে সেই যৌথ ব্যবসা তো আর চলবে না। অতুলকে কিছু না কিছু করে খেতেই হবে।

কিন্তু চাকরি চাইলেই তো আর চাকরি পাওয়া যায় না। দিনকয়েক ঘোরাঘুরির পর অতুলের মনে হোল কলকাতায় তার কোন সুবিধে হবে না। তা ছাড়া কলকাতায় সে থাকতেও চায় না। এ শহরের যেখানেই থাকুক তার মন পড়ে থাকবে রমাদের ওখানে। ঘুরে ঘুরে অতুলের পা দুটো তাদের বাড়ির দিকেই এগুতে চাইবে। এরই মধ্যে কবার মাঝপথ থেকে ফিরে এসেছে। গোবিন্দ যা বলেছে তারপর ওদের ওখানে কিছুতেই আর যাওয়া চলে না অতুলের, আর কোন সম্পর্ক রাখা চলে না ওদের সঙ্গে। সম্পর্ক অতুল রাখতেও চায় না। না ওদের সঙ্গে, না কলকাতার সঙ্গে। শহরতলী দিয়েই অতুল চাকরি খুঁজে বেড়াতে লাগল।

এর মধ্যে একদিন শিয়ালদহ স্টেশনে দেখা হয়ে গেল পুরোন বন্ধু শ্রীপদ দাস-এর সঙ্গে। গায়ে হাফসার্ট, হাতে একটা ফাইবারের সুটকেস নিয়ে সে কোথায় চলেছে হন হন করে। অতুলের সঙ্গে দেখা হতেই থমকে দাঁড়াল, "এই যে, তারপর খবর কি তোর।

কোথায় আছিস, কি করছিস।'

অতুল বলল, 'কোথাও নেই, কিছুই করছি নে।'

'বাপের হোটেলেই আছিস তাহলে?'

অতুল বলল, 'তাই বা থাকতে পারছি কই। সে হোটেলের দোরও বন্ধ হোল বলে একটা চাকরি-বাকরি জোগাড় করে দেনা ভাই।'

শ্রীপদ একটু চিন্তা করে বলল, 'তা দিতে পারি। কিন্তু আমরা যা করছি তা কি তুই করতে পারবি? কাজ করবি চটকলে? কলকাতা ছেড়ে যাবি নৈহাটির মত জায়গায়?'

অতুল বলল, 'কেন যাব না। তুই যদি সঙ্গে নিস সুবিধে সুযোগ করে দিতে পারিস, নিশ্চয়ই যাব।'

শ্রীপদ বলল, 'তাহলে চল আমার সঙ্গে, আজই ঠিকঠাক করে আসবি। দেখে টেকে যদি পছন্দ হয়—'

রাত বারটা বেজে গেল অতুলের দেখা নেই। বাসন্তী উদ্বিগ্ন হয়ে বার বার ঘর বার করছেন, আশঙ্কা করছেন নিশ্চয়ই আবার কোন একটা কাণ্ড ঘটিয়েছে তাঁর ছেলে! এই সময় অতুল ফিরে এল। অবনীমোহন গম্ভীরভাবে ছেলের দিকে তাকালেন, কোন কথা বললেন না।

বাসন্তী বললেন, 'আমি ভেবে মরি আবার তুই কোথায় কি ঘটিয়ে বসলি। তুই কোথায় গিয়েছিলি অতুল।'

অতুল বলল, 'একটা চাকরি জোগাড় করে এলাম মা।'

বাসন্তী বললেন, 'কি কাজ।'

অতুল বলল, 'সে তোমার শুনে কাজ নেই মা, কুলীমজুরের কাজ।'

বাসন্তী বললেন, 'কোথায়?'

অতুল বলল, 'কলকাতার বাইরে। সপ্তাহে একদিন এসে তোমার সঙ্গে দেখা করে যাব।'

বাসন্তী খানিকটা অভিমানের সঙ্গে বললেন, 'অমন হতচ্ছাড়া চাকরি কি তোর না নিলেই চলত না।'

অতুল হেসে বলল, 'না মা চলত না। আমি তো একা নই, আমার মত আরো হাজার হাজার লোক এই হতচ্ছাড়া কাজে নেমেছে। এর চেয়ে ভালো কাজ যখন জুটবে তখন এটা ছেড়ে দেব। কিন্তু যতদিন না জোটে ততদিন বসে থেকে লাভ কি?'
সোমবার কাজে যোগ দিতে হবে। রবিবার সকাল থেকেই তার উদ্যোগ আয়োজন চলতে লাগল। বাসন্তী ছেলের বিছানা বাক্স গুছিয়ে দিতে দিতে বার বার বলতে লাগলেন, 'এখনও তুই ভালো করে ভেবে দেখ অতুল। আমি বলি নাই বা গেলি।'
অতুল বলল, 'তুমি অমন কোরো না মা। তাহলে সত্যিই আর যেতে পারব না।'
অতুল সবই ঘুরে টুরে দেখে এসেছে। বস্তীর মধ্যে শ্রীপদদের ঘরের পাশে একখানা খালি ঘরও পাওয়া গেছে। অতুল সেখানে গিয়েই উঠতে পারবে। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা প্রথমে শ্রীপদদের ওখানেই হবে। সে তার বউ ছেলে নিয়ে থাকে। কোন অসুবিধে হবে না। আর মাইনেপত্র পেলে হোটেলেও স্বাধীনভাবে অতুল ব্যবস্থা করে নিতে পারবে। সবরকম বন্দোবস্তই আছে। এখন আসা না আসা অতুলের ইচ্ছা। শ্রীপদের স্ত্রী রাধা বলেছিল, 'ঈস, আমি থাকতে হোটেলে খেতে যাবে কেন ঠাকুরপো। আপনি চলে আসুন ঠাকুরপো। আপনার কোন কষ্ট হবে না।'
কষ্ট না হওয়ারই কথা বটে। নোংরা কুলী বস্তী। খোলার চাল আর মাটির দেয়াল ঘেরা ছোট ছোট এক একটি খুপরি। তবু রাধার আশ্বাসটুকু ভারী ভালো লেগেছে অতুলের। কথা দিয়ে এসেছে সে যাবেই।

ভোর বেলায় কড়া নাড়ার শব্দে করবীই এসে দোর খুলে দিল। তারপর আগন্তুক দেখে খানিকক্ষণ অবাক হয়ে থেকে বলল, 'দাদা তুমি! তুমি কি করে এলে।'

হিরণ্ময় বলল, 'উড়ে আসিনি। গাড়িতে গড়িয়ে গড়িয়েই এসেছি। অবশ্য উড়ে আসবারই ইচ্ছে ছিল। কিন্তু বড্ড খরচ। সে যাক। তারপর তোর খবর কি। কেমন আছিস? পিপলু ভালো তো?'

করবী বলল, হ্যাঁ ভালো। কিন্তু তোমার ব্যাপার তো বুঝতে পারলাম না দাদা। চিঠি নেই পত্তর নেই হঠাৎ এমন করে—'

হিরণ্ময় বলল, 'চিঠিপত্র দিয়ে এলে তো তুই সাবধান হয়েই যেতে পারতিস। কোন বে-আইনি কাজ করছিস কিনা তাই তদন্ত করবার জন্যে এসেছি বুঝলি?'

তারপর গলা নামিয়ে বলল, 'তোর শাশুড়ী জরুরী চিঠি দিয়েছিলেন। তুই নাকি কুল মান কিছু আর রাখলিনে। ব্যাপারটা কি।'

করবী মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে থেকে বলল, 'ও এতক্ষণে বুঝতে পারলাম। এসো ভিতরে এসো।'

হিরণ্ময় বলল, 'ভিতরে যে যেতে বলছিস, আমি কিন্তু বিপক্ষের গোয়েন্দা, তা যেন মনে থাকে।'

করবী গম্ভীরভাবে বলল, 'এসো, তোমার স্বপক্ষের লোকও তো এখানে আছে।'

ভিতরে এসে নিভাননীর সঙ্গে কুশল প্রশ্ন বিনিময় করল হিরণ্ময়, 'কেমন আছেন মাঐমা, সব ভালো তো?

নিভাননী বললেন, 'এই একরকম আছি বাবা। ভগবান যেমন রাখবেন তেমনিই তো থাকব। বউমাকে নিয়ে এলে না? তাকে কোথায় রেখে এলে?'

নিজেই গরজ করে হাত মুখ ধোয়ার জল দিলেন, চা জলখাবার করে দিলেন নিভাননী। তারপর হিরণ্ময়কে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, 'নিতান্ত বিপদে পড়েই তোমাকে ওসব কথা লিখতে হচ্ছে হিরণ্ময়। লিখতে আমার বুক ফেটে গেছে। নিজের ঘরের কলঙ্কের কথা কি অমন করে লিখে যায়? শত হলেও তো আমার নিজেরই ছেলের বউ। কিন্তু ওর ভবিষ্যতের কথা ভেবেই তোমাকে সব কথা জানিয়েছি বাবা।

তুমি। কিছুদিনের জন্যে দিল্লীতে তোমার কাছে নিয়ে রাখ। ছেলের বউয়ের চাকরি আমি খেতে চাইনে। আমার কপালে যা আছে তাই হবে। তুমি ওকে কিছুদিনের জন্যে ওই ছোকরার চোখের আড়ালে নিয়ে যাও। কলকাতায় থাকলে ওকে আর রক্ষা করতে পারব না হিরণ্ময়। কিন্তু রক্ষা যে করতেই হবে। ও তো একা নয়, ওর সঙ্গে যে আমার পিপলুর ভবিষ্যৎ জড়িয়ে আছে।'

হিরণ্ময় গম্ভীর হয়ে বলল, 'আমি ভেবে দেখছি মাঐমা।'

নিভাননী বললেন, 'হ্যাঁ ভেবে দেখ। ওর বাঁচবার পথ বের কর। তুমি যা বলবে আমি তাতেই রাজী হব।'

বলে নিভাননী অরুণ আর করবীর এই কয়েক মাসের ঘনিষ্ঠতার কাহিনী, সেদিন শেষরাত্রে বাইরে থেকে মোটরে করে ফিরে আসার বিবরণ সব খুঁটে খুঁটে বলতে লাগলেন। শেষে বললেন, 'ও এখন আমার শাসনের সম্পূর্ণ বাইরে চলে গেছে হিরণ্ময়। এখন দেখ তোমার শাসনে কোন কাজ হয় কি না। তুমি তো ওর দাদা। বাপের বাড়ির দিক থেকে একমাত্র গার্জিয়ান। ওর যাতে ভালো হয় তা দেখা তোমারও তো দেখা তোমারও তো কর্তব্য।'

হিরণ্ময় চিন্তিতভাবে বলল, 'কর্তব্য বই কি মাঐমা। সেইজন্যেই তো এলাম।'

দুপুরে খাওয়া দাওয়া সেরে হিরণ্ময় করবীকে বলল, 'চল একটা মিউড়ে স্ত্রীল দিয়ে আসি। মেঘলা দিন আছে। বেড়াতে মন্দ লাগবে না।'

করবী আপত্তি করল না। সে বুঝতে পারল হিরণ্ময় নির্জনে তাকে কিছু বলতে চায়। সব কথা করবীরও শুনে নেওয়া দরকার। তারপর তারও বলবার কথা আছে।

হাঁটতে হাঁটতে তারা দুজনে কিছুদূরের একটা পার্কের বেঞ্চে গিয়ে বসল। খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর করবীই আগে জিজ্ঞাসা করল, 'উনি তোমাকে কি কি লিখেছেন? চিঠিটা আছে তোমার কাছে?'

হিরণ্ময় বলল, 'না চিঠিটা পড়েই আমি ছিঁড়ে ফেলেছি। প্রথমে ঠিক সহ্য করতে পারিনি।'

করবী বলল. 'নিশ্চয়ই খুব বানিয়ে বানিয়ে—'

হিরণ্ময় বলল. 'বানানো কথা সে চিঠিতে ছিল বই কি। কিন্তু আসল কথাটা বানানো নয়, সেটা সত্যি।'

করবীর মুখখানা আরক্ত দেখাল. 'তাই তোমাদের বিশ্বাস। বেশ যদি সত্যি হয়—'

হিরণ্ময় বলল. 'তাহলে তার ব্যবস্থা করতে হবে।'

করবী বলল, 'কি ব্যবস্থা করবে তোমরা? কি শাস্তি দেবে শুনি?'

হিরণ্ময়ের দিকে এবার সোজাসুজি মুখ তুলে তাকাল করবী।

হিরণ্ময়ও বোনের দিকে একটুকাল তাকিয়ে রইল। তারপর সস্নেহে আশ্বাসের সুরে বলল, 'আমি এই চাই করবী। শেষ পর্যন্ত তোর এই সাহস, মনের এই জোর বজায় থাকুক আমি তাই চাই। দেখ, তোর শাশুড়ীর চিঠি পেয়ে প্রথমে মনের অবস্থা ভারি খারাপ হয়ে পড়েছিল। ভারি আঘাত পেয়েছিলাম। সারারাত দুশ্চিন্তায় ঘুম হয়নি। ছি ছি আমার বোন করবী এমন কেলেঙ্কারীর মধ্যে গেল! সংযম, শিক্ষা, সংস্কৃতি কিছুর মূল্যই সে দিল না?'

করবী বাধা দিয়ে বলল. 'শোন, তুমি যা ভেবেছ—'

হিরণ্ময় বলল, 'আমাকে শেষ করতে দে। হ্যাঁ, তুই ঠিকই বলছিস। আমি তখন যা ভেবেছিলাম তা ভুল, তারপরে যা ভেবেছি তাই সত্যি। ভোরে উঠতেই আমাদের পাশের ফ্ল্যাটের সুরমার সঙ্গে দেখা। সে হেসে বলল, দাদা, আজ যে এত সকাল সকাল উঠেছেন, আপনারা তো দু'জনে পাল্লা দিয়ে ঘুমোন। দেখুন গিয়ে আপনার প্রতিবেশীর এখনো কেমন নাক ডাকছে। অল্পদিন হোল সুরমারা এসেছে। কিন্তু এর মধ্যে দাদা বউদি পাতিয়ে আমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে নিয়েছে। সুরমা আর তার স্বামী প্রফুল্ল আমাদের ব্রিজ খেলার, সিনেমা দেখার সঙ্গী। সুরমার গলায় আমি তোর গলাই শুনতে পেলাম। তার মুখে

কল্পনা করলাম তোর মুখের প্রসন্নতা। সুরমাও ঠিক তোর মত। সে ও বিধবা হওয়ার পর ফের বিয়ে করেছে। বেশ সুখে শান্তিতে আছে ওরা।'

করবী শিউরে উঠে বলল, 'দাদা, কি বলছ তুমি।'

হিরণ্ময় বলল, 'ঠিক বলছি। ওরা যা পেরেছে তোরাই বা পারবিনে কেন। এই তো স্বাভাবিক। জীবনের দাবীই তো তাই। সে দাবী যদি সোজাপথে না মেটে, তা গলি ঘুঁজির বাঁকা পথ নেবে। কিন্তু তোকে আমি সোজা স্বাভাবিক পথ নিতেই বলব, বোন, যাতে সেই পথে চলতে পারিস তার সাহায্য করব। আমি সেইজন্যেই এসেছি।'

করবী ফের অস্ফুটস্বরে বলল, 'দাদা তুমি কি বলছ?'

হিরণ্ময় বলল, 'এ কেবল আমারই বলবার কথা নয়, তোরও মনের কথা। কি বলিস, ঠিক ঠিক বলিনি?'

করবী আস্তে আস্তে বলল, 'দাদা, আমি তো ঠিক ওই ধরণে ভাবিনি।'

হিরণ্ময় বলল, 'ভাববার ওই একমাত্র ধরণ করবী। তার কোন ধরণে মর্যাদা নেই, সম্মান নেই, সমস্যার সমাধান নেই।'

করবী বলল, 'কিন্তু তুমি যা বলছ তা কি সম্ভব? পিপলুর সমস্যা আছে। তার ঠাকুরমা, তার কাকা এদের ওপর কর্তব্য আছে।'

হিরণ্ময় বলল, 'তাতো আছেই, সে কর্তব্যকে তো আমি অবহেলা করতে বলিনে। আমি সব দিক ভেবে দেখেছি। অরুণের কাছ থেকে এটুকু ঔদার্য নিশ্চয়ই আশা করা যায় যে, পিপলুকে সে সহ্য করবে।'

করবী বলল, 'তা হয়ত করবেন। পিপলুকে তিনি ভালোই বাসেন।'

হিরণ্ময় বলল, 'তবে আর কি। বাকী রইলেন পিপলুর ঠাকুরমা আর কাকা। যতদিন তাঁদের অন্য আর্থিক সংস্থান না হয়, যতদিন দিলীপ উপার্জনক্ষম না হতে পারে ততদিন তুই ওঁদের সাহায্য করবি। তোর মাইনের সব টাকাটা ওঁদের দিবি। দুঃস্থ মা বাপকে মেয়ে যেমন দেয়। আর অরুণ যা রোজগার করবে, সেই টাকায় তোদের সংসার চলবে।'

করবী একটু হাসল, 'দাদা, তুমি অঙ্কের ছাত্র ছিলে। কিন্তু জীবনটা

তো আগাগোড়া অঙ্কের খাতা নয়। তুমি যত সহজে হিসেব করলে ব্যাপারটা কি তত সহজ? এসব ঘটবার পরে ওঁরা আমার কাছ থেকে টাকা নেবেন কেন? অথচ ও'রা কষ্ট পাবেন, অর্থাভাবে দিলীপের পড়া বন্ধ হয়ে যাবে, তাই বা আমি কি করে সইব। না দাদা, এ সমস্যার কোন সমাধান নেই।' হিরণ্ময় বলল, 'কিন্তু সমাধান যে করতেই হবে বোন। দোটানায় পড়ে সারা জীবন তুই কেবল ক্ষতবিক্ষত হবি আমি তা হতে দিতে পারিনে। প্রথম প্রথম এক আধটু অসুবিধে তো হবে। কিন্তু পরে সব ঠিক হয়ে যাবে দেখে নিস।'

করবী বলল, 'তুমি একে অসুবিধে বলছ দাদা অকর্তব্য বলছ না?'

হিরণ্ময় বলল, 'না অকর্তব্য নয়, জীবনকে অস্বীকার করাই অকর্তব্য। অঙ্ক কষতে ভুল করাটাই অকর্তব্য, তোর শাশুড়ী যদি যুক্তি না মেনে চলেন,—তাঁর পক্ষ থেকেই কর্তব্যের ত্রুটি ঘটবে। তাঁর দুঃখ কেউ এড়াতে পারবে না। কিন্তু তুই ইচ্ছে করে নিজের জীবনে দুঃখ ডেকে আনিসনে। প্রবঞ্চনা মাত্রেই খারাপ। কিন্তু আত্মপ্রবঞ্চনা সবচেয়ে ক্ষতিকর। কারণ তা বিবেকের ছদ্মবেশ পরে আসে। সারা জীবন তাকে চেনা যায় না, চেনার সাহস হয় না।' আশ্চর্য দাদার মুখে এ যেন নিজের চিন্তারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছে করবী। যে গোপন চিন্তার অস্ফুট উচ্চারণও তার সাহসে কুলোয়নি, হিরণ্ময় তা তারস্বরে বলেছে, যে গোপন দ্বন্দ্বের করবী কোন মীমাংসায় আসতে পারেনি, গাণিতিক হিরণ্ময় কয়েক মিনিটের মধ্যে অঙ্ক কষে তার বিশুদ্ধ ফল নির্ণয় করেছে। তবে কি এই নিশ্চিন্ত পরিণামের কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই করবীর? যুক্তি ছাড়া মুক্তির আর কোন পথ নেই? হিরণ্ময় বলল, 'কি ভাবছিস।'

করবী কাতর স্বরে বলল, 'আমি কিছুই ভাবতে পারছিনে দাদা। তুমি যা ভালো বোঝ তাই কর।'

'ঠিক করে দিয়ে যাব। তোর সব জট খুলে দিয়ে যাব করবী। আমার ওপর তুই নির্ভর কর বোন। তোর কোন ভয় নেই।'

কিন্তু হাতে যে আর সময়ও নেই হিরণ্ময়ের। আর একটিদিন মাত্র কলকাতায় সে থাকবে। কালকের দিনটি অন্য কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হবে।

করবীর জন্যে আজকের দিনটি ছাড়া সে সময় দিতে পারবে না। তাতে কোন অসুবিধে নেই, ঝড়ের বেগে, ঝোঁকের মাথায় কাজ সারাই স্বভাব হিরণ্ময়ের। এই পদ্ধতিই তার পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী। অফিসের সাতদিনের জমানো কাজ সে একদিন রাত বারটা পর্যন্ত খেটে শেষ করে দিয়ে যায়। করবীর ফাইলই বা সে আজকের মধ্যে ক্লিয়ার করতে পারবে না কেন। রাত বারটার এখনো অনেক দেরি।

তাই বাসায় ফিরে এলে নিভাননী যখন তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হোল। বুঝিয়ে সুঝিয়ে সব বলতে পারলে? নিজের দোষ ও স্বীকার করল? তোমার উপদেশ ও শুনল তো?'

হিরণ্ময় এই সুযোগ ছাড়ল না, অতি সহজভাবে বলল, 'ওকে এমন উপদেশ দিয়েছি যে, না শুনে ওর জো নেই মাঐমা। আমি বলেছি এসব চলবে না। এসব বেয়াড়া চালচলন আমাদের সকলের পক্ষেই অসম্মানকর। তার চেয়ে অরুণকে তুমি বিয়ে কর।'

নিভাননী খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে বললেন, 'তুমি তাই বলেছ? তুমি ওকে শেষ পর্যন্ত বিয়ে করতে বলেছ?'

হিরণ্ময় বলল, 'হ্যাঁ, আপনি যদি ভালো করে ভেবে দেখেন আপনিও তাই বলবেন। এক্ষেত্রে বিয়েটাই সবচেয়ে সম্মানের, সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়।'

নিভাননী জ্বালাভরা কণ্ঠে বললেন, 'ভিতরে ভিতরে তুমি তাহলে এই মতলব করেই এসেছ? তোমার বিধবা বোনের তুমি ফের বিয়ে দেবে?'

হিরণ্ময় অনুত্তেজিত, শান্ত স্বরে বলল, 'ও কেবল আমার বিধবা বোনই নয়, আপনারও বিধবা মেয়ের মত। ও যাতে সুখী হয়, ওর যাতে ভালো হয়, ওর যাতে মঙ্গল হয় তা আপনারও করা উচিত।

দেখুন স্মৃতিকে সম্বল করে যারা থাকতে পারে, তারা থাকুক। শতকরা নিরানব্বই জন ভিতরে ভিতরে পারে না। তাদের পারতে আমরা বাধ্য করি। কিন্তু করবী যখন আর একজনকে ভালোবেসেছে, আর একজনকে ভালোবাসার সুযোগ জীবনে যখন এসেছে তখন কেন ওকে আমরা মিছামিছি যোগিনী সাজিয়ে রাখব। ত্যাগের নামে সংযমের নামে ওকে বঞ্চিত হতে বাধ্য করব। তার চেয়েও আর এক সংসার গড়ে তুলুক, আরো ছেলেমেয়ে হোক, ও নিজে সুখী হোক, দশজনকে সুখী করে তুলুক।'

নিভাননী বললেন, 'করবীরও বুঝি সেই মত?'

হিরণ্ময় বলল, 'হ্যাঁ। ওর মনে এখনো যেটুকু দ্বিধা আছে আমরা বুঝিয়ে বললে সেটুকু আর থাকবে না। আপনি যদি অনুমতি দেন—'

নিভাননী অদ্ভুত একটু হাসলেন, 'অনুমতি আমি দেব না তো কে দেবে।'

হিরণ্ময় বলল, 'হ্যাঁ, আপনিই দেবেন। আমি জানি আপনিও লেখাপড়া শিখেছেন, শিক্ষিত সমাজের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ আছে—'

নিভাননী বললেন, 'থাক থাক তোমাকে আর বক্তৃতা দিতে হবে না। বিধবা বোনের বেলায় এমন কথা সবাই বলতে পারে, এমন উদার সবাই হতে পারে। বিয়ে দেওয়া বোন পরের ঘর থেকে পরের ঘরে যাবে। তার ওপর আর মমতা কিসের। কিন্তু এই যদি তোমার বিধবা ভাইয়ের বউ হোত পারতে তুমি এত সহজে তার ফের বিয়ের ব্যবস্থা করতে? পারতে তুমি সব মমত্ব, সব স্বত্ব ছেড়ে দিতে?'

পাশের ঘর থেকে দিলীপ এসে দোরের সামনে দাঁড়াল, 'মা, তুমি কাকে কি বলছ। ও'রা যখন ভিতরে ভিতরে সব ঠিক করেই ফেলেছেন ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও ও'দের, এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে দাও।'

নিভাননী বললেন, 'তাতো দেবই। এ কথা শোনার পর এ বাড়িতে তো ওকে আর থাকতে দেবই না। ও যাক। এক্ষুণি চলে যাক।

কিন্তু পিপল্ আমার, পিপল্ আমার পরেশের। ওকে আমি কাউকে দেব না।'

পিপল্ ঠাকুমার পায়ের কাছে বসে নিজের মনে মামার আনা মোটরগাড়ি চালাচ্ছিল, নিভাননী তাকে নিজের কাছে টেনে নিলেন। জোর করে এখ্নি যেন কেউ পিপল্কে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

পিপল্ বিব্রতভাবে বলল, 'ছাড় ঠাকুরমা, ছাড়। আমার গাড়ি থেমে গেল যে।'

হিরণ্ময় নিভাননীর কথার জবাবে বলল, 'পিপল্ যেমন আপনার পরেশের, তেমনি আমার বোনেরও। শিশুকে তার মার কোল থেকে আপনি কেড়ে রাখতে পারেন না। ও তার মার কোলেই থাকবে শুধু মাঝে মাঝে এসে ঠাকুরমার কোলের ভাগ দিয়ে যাবে।'

বলে হিরণ্ময় উঠে দাঁড়াল।

করবী তাকে ডেকে নিয়ে বলল, 'দাদা, তুমি এ কি করলে! আমি তো এসব চাইনি। যেভাবে চলছিল আমি তো সেইভাবেই চলতে পারতাম।'

হিরণ্ময় ধমকের ভঙ্গিতে বলল, 'সেভাবে চলাটাই সবচেয়ে অন্যায়। সেভাবে চলাটা না চলার সামিল। এ যুগে তো একেবারে অচল। চাসনি মানে চাইতে সাহস পাসনি। কিন্তু সাহস তোকে পেতেই হবে। সব বাধাবিঘ্নের সামনে সাহস নিয়ে দাঁড়াতে হবে তোকে। যে বন্ধন শিথিল হয়ে এসেছে, যে বন্ধন আপনিই একদিন খসে পড়বে, তা ছিঁড়ে ফেলার সাহস মনে তোকে আনতেই হবে। চল আজই আমরা অরুণকে খোঁজ নিয়ে আসি।'

করবী আরক্ত হয়ে বলল, 'ছিঃ আমি তা পারব না।'

হিরণ্ময় বলল, 'কেন পারতে দোষ কি। বেশ না যেতে পারিস কিছু একটা লিখে দে।'

করবী বলল, 'তোমার হাত দিয়ে তাকে চিঠি পাঠাব?'
হিরণ্ময় বলল, 'পাঠালিই বা। তাতে দোষ কি। তোর ভয় নেই, আমি সেই চিঠি খুলে পড়ব না।'
হিরণ্ময়ের পীড়াপীড়িতে অবশেষে এক টুকরো কাগজ লিখে দিল করবী। সম্বোধন করল না, স্বাক্ষর করল না, ঠিকানা তারিখ দিল না, শুধু লিখল 'এত তাড়াতাড়ির দরকার ছিল না। আমরা আরো দেরি করতে পারতাম। কিন্তু আজ যা ঘটল, তাতে আর দেরি করবার জো নেই। দাদার মুখেই সব শুনবে। তোমার জবাবের অপেক্ষায় রইলাম।'

হিরণ্ময়ের হাত থেকে খামখানা নিয়ে তার মুখটা ছিঁড়ে ফেলল অরুণ। তারপর সেই টুকরো চিঠিটা বার দুই পড়ে বন্ধুর মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এর মানে কি?'

হিরণ্ময় বলল, 'মানে কি তুমি নিজেই বুঝতে পারছ না? বেশ, না বুঝতে পারো তো বুঝিয়ে দিচ্ছি। খুঁজে খুঁজে তোমার এই চিলেকোঠা পর্যন্ত যখন উঠে আসতে পেরেছি, তখন মানেটুকু বুঝিয়ে বলাও আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হবে না।' হিরণ্ময় এরপর আনুপূর্বিক সব খুলে বলল। তার প্রাথমিক বিদ্বেষ, তারপর সমস্যা সমাধানের জন্য অসাধারণ তৎপরতা কিছুই গোপন করল না। শেষে বলল, 'দেখ, অফিসেও কাজের পাল্লা দিয়ে তুমি আমার সঙ্গে পারোনি, এক্ষেত্রেও পারবে না। ঘটক সেজে এসে আমি যদি একটা ধাক্কা না দিতাম মন জানাজানির পালা শেষ হতে যুগ-যুগান্তরই কেটে যেত। পাড়াপড়শীর চোখ রাঙানি আর কান মলা খেতে খেতে অস্থির হয়ে উঠতে।' আমি তার হাত থেকে তোমাদের বাঁচালাম। আমার কাছে তোমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। এ কথা স্বীকার কর কি না।'
অরুণ বলল, 'করি।'

হিরণ্ময় বলল, 'বাস, তা হোলেই হোল। আমার কাজ আমি সেরে গেলাম। বাকিটুকু ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কিংবা কালীঘাটের পুরুতের। তোমাদের যাকে পছন্দ। মিষ্টি মুখটা দিল্লীতে গিয়েই করিয়ো। কলকাতার কোন খাবার আমার পেটে সয় না। এবার উঠি।'
অরুণ বলল, 'সে কি চা-টা না খেয়েই?'
হিরণ্ময় বলল, 'বেশ যদি এক কাপ খাওয়াতে চাও, খাওয়াতে পার। কিন্তু চা-টা আর না। পেটটা ভালো যাচ্ছে না।'
চা খাবার খেয়ে হিরণ্ময় খানিক বাদে বিদায় নিল। ট্রাম লাইন পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দিয়ে এল অরুণ। হিরণ্ময় বলল, 'আমি কালই চলে যাচ্ছি।'
অরুণ বলল, 'কালই?'
হিরণ্ময় বলল, 'হ্যাঁ। তাতে কি, গন্ধর্ব বিয়েতে অভিভাবকদের অনুপস্থিতিই বাঞ্ছনীয়। ব্যবস্থাটা করে ফেলতে বেশি দেরি কোরো না। কারণ, করবীর ওখানকার অবস্থা তো বললামই। আমি জানি অনেক সমস্যা আছে, তোমার দিক থেকেও অনেক বাধা আছে। কিন্তু একটা একটা করে জট খুলবার যদি চেষ্টা করো, জীবনের জটিলতার আর শেষ হবে না। যেখানে গিঁটের সংখ্যা বেশি, জটের সংখ্যা বেশি, সেখানে নির্মম হয়ে মূল সুদ্ধ উপড়ে ফেলতে হয়। এ ছাড়া আর কোন পথ নেই অরুণ।' হিরণ্ময় বিদায় নিল।
অরুণ অনেক রাত অবধি শহরের পার্কে পথে ঘুরে বেড়াল। সত্যিই এই চরম পথ ছাড়া আর কোন পথ নেই। ভালোই হোল, এ ভালোই হোল। এত তাড়াতাড়ি সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। কতদিন অরুণ মনে মনে ভেবেছে সরাসরি কথাটা করবীকে বলবে। কিন্তু বলতে বলতে বলা হয়নি। এবার করবী নিজেই বলেছে। মুখে না হোক, কলমের মুখে। একই কথা। দাদার সাহায্য অবশ্য করবীকে নিতে হয়েছে।
কিন্তু নিয়েছে তো করবী নিজেই। একই কথা। কিছুদিন ধরে

এই কল্পনাই তো মনে মনে করে আসছে বাস্তব রূপ নেবে তা সে ধারণাই করতে পারেনি। করবী রাজি হয়েছে। ওর মনে আর কোন দ্বিধা দ্বন্দ্ব নেই। ওর দাদার সানন্দ সম্মতি পাওয়া গেছে। এখনো অবশ্য বাধা আসবে। বাধা আসবে অরুণের বাবা মার কাছ থেকে। বাধা আসবে করবীর শাশুড়ীর দেওরের কাছ থেকে। কিন্তু নিজেদের মনের যদি জোর থাকে, নিজের সংকল্প যদি দৃঢ় হয়, তাহলে এসব বাইরের বাধাকে সহজেই অতিক্রম করে যেতে পারবে অরুণ। প্রথম প্রথম দুঃখ দুর্ভোগ তো কিছু হবেই। ঘনিষ্ট আত্মীয়স্বজনেরা আঘাত পাবেন। কিন্তু সে আঘাতের দাগ মিলিয়ে যেতে দেরি হবে না মিলন ঘটাতে পারবে। তার পরিচিত দু' একজন বন্ধুর ক্ষেত্রেও এমন হয়েছে! প্রথম ছেলের অসবর্ণ বিয়েতে মা বাবা রাজি হননি। বিরোধিতা করেছেন, ত্যাজ্য পুত্র করবেন বলে শাসন করছেন, তারপর দু' এক বছর বাদে সব আবার ঠিক হয়ে গেছে। তাদের মা বাবা মেনে নিয়েছেন, ছেলে বউকে ঘরে তুলে নিয়েছেন। প্রথম প্রথম হয়ত বাবা মা রাজি হবেন না, কিন্তু দু' এক বছর সহ্য করে থাকতে পারলেই অরুণ করবীকে এই বাড়িতেই নিয়ে আসতে পারবে। কিংবা অন্য বাড়িতে থাকলেও বাবা মার অনুমোদন পেতে বাধা হবে না। কিন্তু যদি কোনদিন বাবা মা তাকে ক্ষমা করতে না পারেন, যদি চিরজীবনের জন্য যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন তাহলে? তাই বরং সম্ভব। ক্ষমা না করাই সম্ভব। সহ্য করতে না পারাই সম্ভব। করবী বিধবা। তা ছাড়া তার একটি ছেলেও আছে। তাঁদের পক্ষে এই বিসদৃশ বিয়েকে মেনে নেওয়া কঠিন। মেনে নিতে তাঁরা পারবেন না। সুতরাং বিয়ে করতে হলে এসব ঝুঁকি অরুণকে ঘাড়ে নিতেই হবে। বাপ মা ভাই বোনেদের সঙ্গে চিরদিনের বিচ্ছেদ, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনের সম্পর্কচ্ছেদকে মেনে নিতে হবে অরুণকে। তা হোলই বা। করবীকে নিয়ে সে আলাদা বাসা করে থাকবে। সে আর করবী। না শুধু সে আর

করবী নয়। মাঝখানে আরো একজনকে স্থান দিতে হ
পিপলু। করবী শাশুড়ী দেওরের মায়া কাটিয়ে আসতে পারবে
কিন্তু পিপলুকে ছেড়ে আসতে পারবে না। ছেড়ে আসতে দেওয়া
উচিত হবে না অরুণের। না না সেটা অত্যন্ত অসঙ্গত হবে।
নিষ্ঠুরতা হবে না করবীর ওপর? করবী মুখে হয়ত কিছু বলবে
না কিন্তু মনে দুঃখ পাবে। ছেলেকে চোখের সামনে না দেখলে
সংসারের কাজে ওর মন লাগবে না। না পিপলুকে নিজেদের কাছে
এনে রাখতে হবে। কারণ পিপলু করবীরই ছেলে। আশ
করবীরই ছেলে কিন্তু অরুণের কেউ না। লোকজন বন্ধু-বান্ধব
এলে অরুণ কি পরিচয় দেবে পিপলুর? না মিথ্যে কথা সে বলতে
পারবে না। অন্যের ছেলের পিতৃত্ব সে কেন নিতে যাবে? বলবে
আমার স্ত্রীর আগের পক্ষের—'। স্ত্রীর আগের পক্ষের। ভ
অদ্ভুত, ভারি হাস্যকর কথাটা। না ওভাবে বলা যাবে না। ঘু
অন্য ভাষায় বলতে হবে। কিন্তু—

ছি ছি এসব কি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে অরুণ ভেবে মরছে। করবীর চিঠির জবাব দিতে হবে। আজ রাত্রেই জবাব তৈরি করে ফেলতে হবে অরুণকে। করবী তার প্রতীক্ষায় রয়েছে। একটি দীর্ঘ চিঠি রচনার জন্যে অরুণ দ্রুত পায়ে বাসার দিকে চলল। আজ আর কোন কুণ্ঠা সঙ্কোচের কারণ নেই। করবীর সঙ্গে তার সম্পর্ক আজ অবারিত। করবীকে আজ যা খুশি লেখা যায়, চিঠির পাতায় মনের সব উদ্দেশ্যে অরুণ আজ সমস্ত রাতটি নিবেদন করবে।

সন্ধ্যার পর অতুল মন স্থির করে ফেলল। কাল সকালেই সে কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছে। যাওয়ার আগে রমার সঙ্গে সে একবার দেখা করে যাবে। শুধু একটিবারের জন্যে চোখের দেখা দেখে গেলে গোবিন্দ কিছু বলতে পারবে না। যদি বলেই তার কথা গ্রাহ্য করবে না অতুল। সে তো ছেড়েই যাচ্ছে, সে তো চলেই যাচ্ছে; কিন্তু যাওয়ার আগে অন্তত রমাকে না দেখে সে যেতে পারবে না, যাবে

। ক'দিন ধরে সে রমাদের বাসার কাছাকাছি গিয়ে ফিরে এসেছে, ভিতরে ঢোকে নি। কিন্তু আজ নিজের ভীরুতাকে সে নিজেই ধিক্কার দিল। কেন অত ভয় কিসের, এত পরোয়া করবে সে কাকে। সদর দরজা খোলাই ছিল। অতুল আজ আর ইতস্তত না করে সোজা ভিতরে চলে গেল। বৈঠকখানা ঘরে কেউ নেই। সিঁড়ি বেয়ে তেতালায় উঠতে যাচ্ছে, কেশববাবু সামনে পড়লেন। তিনি নীচে নামছেন। অতুলকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন, ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'তুমি আবার এ বাড়িতে কেন? তুমি কি চাও?'

এই অভদ্র আচরণে অতুলের মেজাজ গরম হয়ে উঠল। অপমানের শোধ নেওয়ার জন্যেই সে মরীয়া হয়ে বলল, 'আমি কাল বাইরে চলে যাচ্ছি। রমার সঙ্গে দেখা করে যাব। ওর সঙ্গে দরকার আছে আমার।'

কেশববাবুর দুটো কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল, 'রমার সঙ্গে? পাজী বদমাস কোথাকার? তুমি আমার সামনে আমার মেয়ের নাম ধরে ডাকতে সাহস পাও! এত বড় স্পর্ধা তোমার? বেরোও, বেরোও বলছি।'

রমা এসে পিছনে দাঁড়াল, 'কি হয়েছে বাবা? তুমি অমন করছ কেন?'

কেশববাবু গর্জে উঠলেন, 'অমন করছ কেন? ন্যাকী কোথাকার, যেন কিছু জানেন না। তোর আস্কারা না পেলে ও ফের আসতে পারে এ বাড়িতে? তোর সায় না থাকলে—'

রমা ফের বলল 'বাবা?'

কেশববাবু বলে চললেন, 'পাড়ায় আমার আর মুখ দেখাবার জো রইল না। ছি ছি ছি। অফিসে পর্যন্ত তোদের কেচ্ছা কেলেঙ্কারী গিয়ে পেঁৗচেছে। লোকে আমাকে দেখলেই মুখ টিপে হাসে। গা টেপাটেপি করে। তোর এত বড় সাহস! আমার বাড়িতে থেকে, আমারই চোখের ওপর—'

কল্যাণী ব্যস্ত হয়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, 'তোমরা শুরু করলে কি, এ্যাঁ। হোল কি তোমাদের। আমি তো মহাজ্বালায়

পড়লাম তোমাদের নিয়ে। গোবিন্দই বা গেল কোথায়, সেই দে
অফিস থেকে এসেই আড্ডা দিতে বেরিয়েছে, আর ফেরবার নাম নেই'
কেশববাবু স্ত্রীর কথার কোন জবাব না দিয়ে ফের অতুলের দিকে
তাকালেন, 'তুমি এখনও দাঁড়িয়ে আছ। বেরোও, এক্ষুণি বেরিয়ে
যাও। সোজা কথায় যদি না বেরোও আমি ঘাড় ধরে বের করে দেব।
যাও এখান থেকে।'
রমা দৃঢ়স্বরে বলল, 'না, ও যাবে না। ওকে এমন করে অপমান
করবার অধিকার নেই বাবা।'
কেশববাবু বললেন, 'অধিকার নেই! আমার বাড়িতে চড়াও হয়ে
এসে ও আমার জামাইয়ের গায়ে হাত তুলবে, আমাকে অপমান করবে
আর ওকে বের করে দেওয়ার আমার অধিকার নেই? অধিকার আ
কি না আছে দেখবি? দেখাব?'
রমা বলল, 'না বাবা, যথেষ্ট হয়েছে। যথেষ্ট দেখলাম। আর আম
কিছু দেখে কাজ নেই।'
ব'লে কেশববাবুর পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে লাগল রমা।
কেশববাবু বিস্মিত হয়ে বললেন, 'ওকি তুই যাচ্ছিস কোথায়?'
রমা মুখ ফিরিয়ে বলল, 'যেখানে আমার জন্যে তোমার কোন অপমান
নিন্দা গ্লানি সহ্য করতে হবে না আমি সেখানে গিয়ে থাকব। আমি
তোমার চোখের আড়াল হয়ে থাকব বাবা। দেখি, পৃথিবীতে আমার
আর কোথাও কোন জায়গা আছে কি না।'
কেশববাবু উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'যাবি তো যা। ভারি তো বড়াই
করছিস, যাওয়ার মধ্যে আছে তো এক শ্বশুড়বাড়ি। সেখানে কত
আদর, কত যত্নই পাবি। নেমকহারাম মেয়ে কোথাকার। যা গিয়ে
মজা দেখ গিয়ে একবার। মাতাল স্বামী মুগুর নিয়ে বসে আছে—।
একথার কোন জবাব না দিয়ে রমা দ্রুত পায়ে বেরিয়ে একা গিয়ে
দাঁড়াল বড় রাস্তার সামনে। হাতে একটা কাপড়ের পুঁটলি। আঁচলে
বাঁধা দু'খানা দশ টাকার নোট, ও একেবারে তৈরী হয়ে এসেছে।

রাস্তার মোড়ে এসে রমা থেমে দাঁড়াল। যাবে কোথায়। সত্যি কোথায় আছে তার যাওয়ার জায়গা। রাস্তা দিয়ে ট্রাম বাস রিক্সা ট্যাক্সীর স্রোত চলেছে। কত লোক আসছে যাচ্ছে। প্রত্যেকেরই গন্তব্যের ঠিক আছে। শুধু রমারই নেই। নেই গড় ঠিকানা। যা সব ঘটে গেছে তাতে শ্বশুরবাড়ি আর যাওয়ার জো নেই। সেই অপমানের অন্ন কিছুতেই রমার মুখে উঠবে না। তা ছাড়া সেখানে সে যাবে কার কাছে। স্বামীর কাছে? সেই মাতাল বদমাস স্বার্থপর পুরুষটিকে রমা আর স্বামী বলে স্বীকার করে না। তার সঙ্গে রমার সম্পর্ক অনেকদিন আগেই শেষ হয়ে গেছে। বাবার কাছেও আর থাকা চলে না। তিনি তো স্পষ্টই বলে দিলেন রমার জন্যে তাঁর লাঞ্ছনা আর অপমানের শেষ নেই। পাড়ায় তিনি মুখ দেখাতে পারেন না। এসব শুনেও সে কি করে সেখানে থাকে। শুধু খাওয়া পরাটাই কি সব। মান মর্যাদা সুখ-শান্তি বলে কি কিছু নেই। দূর সম্পর্কের দু' এক ঘর আত্মীয়, বন্ধু শ্রেণীর দু' চারটি পরিচিতা মেয়ের মুখ মনে এল রমার। তাদের ঠিকানা সে জানে। কিন্তু তারা এখন স্বামী-পুত্র নিয়ে ঘর-সংসার করছে। তাদের ওখানে এখন হঠাৎ গিয়ে ওঠা কি ঠিক হবে? তারাই কি রমাকে স্থান দেবে? আর আছে শহরের নানা ধরনের নানা শ্রেণীর মহিলা আশ্রম। আত্মীয়-স্বজনহীন আশ্রয়হীন মেয়েদের সেখানে স্থান হয় রমা শুনেছে। কিন্তু কোথায় সে সব আশ্রম আছে, যারা সে সব চালায় তারা কি প্রকৃতির মানুষ কিছুই রমা জানে না। তা ছাড়া নিজেকে এখন নিঃস্ব নিরুপায় বলে ঘোষণা করতেও তার সম্মানে বাঁধল। না রমা তেমনভাবে কোথাও যাবে না কারো আশ্রয় নেবে না, স্বাধীনভাবে সে একা থাকবে। নিজের খাওয়াপরার সমস্যার সমাধান সে নিজে করবে! রমা আর কারো দ্বারস্থ হবে না, কারো সাহায্য চাইবে না। সবাইকে দেখাবে সে একা থাকতে পারে কি না।

'রমা!'

চমকে উঠে রমা মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল 'কে?'
অতুল কোন জবাব দিল না, নিঃশব্দে আরো কাছে সরে এল।
রমা বলল, 'তুমি আমার নাম ধ'রে ডাকছ!'
অতুল বলল, 'সেটা বড় কথা নয়। তুমি যদি পছন্দ না করো নাম ধরে ডাকব না! তুমিই ডেকো, এতদিন যেমন ডাকছিলে। নামের কথা নয়, আজ আমি অন্যকথা বলতে এসেছি।'
অতুলের বলবার ভঙ্গি দেখে একটু যেন কেঁপে উঠল রমা, দুরু দুরু করতে লাগল বুক। আস্তে আস্তে বলল, 'অন্য কথা, কি কথা, আর বাকি আছে তোমার!' অতুল বলল, 'সবই বাকি। তুমি ও বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছ ঠিকই করেছ ওখানে থাকা আর তোমার মানায় না। এবার তুমি আমার সঙ্গে চল।'
রমা অস্ফুটস্বরে বলল, 'তোমার সঙ্গে! কোথায়!'
অতুল বলল, 'নৈহাটিতে আমার সেই চাকরির জায়গায়।'
রমা বলল, 'সেখানে গিয়ে আমি কি করব।'
জনকয়েক লোক বার বার কৌতূহলী হয়ে তাদের দিকে তাকাচ্ছে। এতক্ষণে যেন তা খেয়াল হোল অতুলের।
এটা মনের কথা বলবার মত নিভৃত নিরালা জায়গা নয়, কলকাতার রাস্তা। জনারণ্য। অরণ্য। কিন্তু প্রত্যেকটি গাছ পালার চোখ আছে, কান আছে, মুখ আছে, জিভ আছে। হাতের ইশারায় একটা খালি ট্যাক্সীকে তাড়াতাড়ি ডেকে নিল অতুল। তারপর নিজেই গাড়ির দরজা খুলে রমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওঠো।'
রমা তেমনি মৃদুস্বরে বলল, 'কিন্তু এর পরিণাম—'
অতুল বাধা দিয়ে বলল, 'পরিণামের কথা আমি জানি। আমি তার জন্যে তৈরী। তুমিও তো তৈরী হয়েই এসেছ। চল আর দেরি করোনা। গাড়িতে যেতে বাকি সব কথা বলব।'
আর কোন প্রতিবাদ না ক'রে রমা গাড়িতে উঠে বসল। অতুল তার পাশে গিয়ে বসে ড্রাইভারকে বলল 'শিয়ালদ' ষ্টেশন।

ট্যাক্সী ছুটে চলল।

রমা যে তাঁর চোখের সামনে দিয়ে সত্যি সত্যি বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে, একথা যেন কেশববাবু বিশ্বাস করতেই পারছিলেন না। মেয়ের আচরণে তিনি খানিকক্ষণ বিহ্বল স্তম্ভিত হয়ে রইলেন। একটু বাদে স্ত্রীর কথায় তাঁর চমক ভাঙল, 'ওকি, চুপচাপ বসে আছ যে। দেখ, এত রাত্রে মেয়েটি কোথায় গেল।'

কেশববাবু বললেন, 'যাক্, যে চুলোয় ওর খুশি। আমার কি! অমন মেয়ের আমি মুখ দর্শন করতে চাইনে।'

কল্যাণী বললেন, 'তাতো চাও না; কিন্তু মেয়েটা গেল কোথায়, সে খেয়াল আছে?'

কেশববাবু বললেন, 'শ্বশুরবাড়ির নাম করে গেল যে, সেখানে এক দণ্ডও যদি টিকতে পারে। আমি তোমাকে বলে দিলাম।'

কল্যাণী বললেন, 'বয়ে গেছে ওর সেখানে যেতে। অতুলটা সঙ্গে সঙ্গে গেল, লক্ষ্য করলে না? নিশ্চয়ই ওরা কোথাও—'

কেশববাবু বললেন, 'এ্যাঁ, বলছ কি তুমি। ওদের এত বড় সাহস হবে, এত স্পর্ধা? আমাদের চোখের ওপর দিয়ে—'

ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লেন তিনি। কিন্তু কাছে-ধারে তাদের কোন চিহ্নও দেখতে পেলেন না।

খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরির পর কেশববাবু বাসায় ফিরে এলেন। ততক্ষণে গোবিন্দও ফিরে এসেছে।

কেশববাবু ছেলেকে বললেন, 'তুই শিগগির শ্যামবাজার যা। গিয়ে দেখে আয় রমা সেখানে গেছে কি না।'

গোবিন্দ বলল, 'আপনি যেতে বলেন যেতে পারি। কিন্তু গিয়ে আর কোন লাভ হবে না বাবা।'

কল্যাণী অস্ফুটস্বরে বললেন, 'সর্বনাশী, এই তোর মনে ছিল?'

পাঁচ বছরের মেয়ে পিণ্টু বলল, 'বড়দি কোথায় গেল বাবা। আমাকে নিয়ে গেল না যে!'

কেশববাব্ বজ্রনাদে তাকে ধমকে উঠলেন, 'চুপ!'

অনেক রাত পর্যন্ত চিঠির জবাব ঠিক করে লিখে উঠতে পারল না অর্ণ। যতবার শ্রু করল, ততবারই কতকগ্লি 'কিন্তু' মনের কোণে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে লাগল। নতুন করে লিখবার আয়োজন করছে, বাসন্তী এসে দোরের কাছে দাঁড়ালেন। তাঁর ম্খ শ্কনো, পা কাঁপছে।

'নান্তু।'

সাদা প্যাডটা ল্কিয়ে ফেলে অর্ণ তাড়াতাড়ি সামনের দিকে তাকাল। 'কি হয়েছে মা?'

বাসন্তী বললেন, 'বাইরে আয়, শোন। নীচে গোবিন্দরা সব কি বলছে শোন।'

অর্ণ বলল, 'কি বলছে?'

বাসন্তী গলা নামিয়ে বললেন, 'ওদের নাকি পাওয়া যাচ্ছে না।'

অর্ণ বলল, 'ওদের মানে কাদের?'

বাসন্তী বললেন, 'অতুল আর রমাকে।'

খ্ঁজে লাভ নেই তব্ মার সান্ত্বনার জন্যে পারিবারিক কর্তব্য হিসেবে গোবিন্দদের দলের সঙ্গে ভাইকে খ্ঁজতে বেরোল অর্ণ। সম্ভাব্য সব জায়গায় একবার করে খোঁজ নিয়ে এল। রাত কাটল। পরের দিন সকাল, দ্প্র, সন্ধ্যা কেটে গেল অতুলদের কোন সন্ধান মিলল না। গোবিন্দ অবশ্য বেশিক্ষণ অর্ণদের সঙ্গে সহযোগিতা করল না। অতুলের নামে থানায় গিয়ে ডায়েরী করে এল। সে কথা অর্ণকে জানিয়ে দিয়ে বলল, 'দেখি কতদিন ও ল্কিয়ে থাকতে পারে। আমি শেষ পর্যন্ত লড়ব। আমি ওকে কিছ্তেই ছাড়ব না। এতদিনের বন্ধ্ হয়ে ও যখন আমার সঙ্গে এমন চরম বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারল, আমিও এর শোধ নেব আপনাকে স্পষ্ট বলে দিল্ম।

বাইরে থেকে অবনীমোহনের কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। অন্য দিনের মতই অফিসে গেলেন, অফিস থেকে ফিরে এলেন। বাড়ির

ভিতরের বাইরের নানারকম আলোচনা সমালোচনা, শ্লেষ, ব্যঙ্গোক্তি কিছুই যেন তাঁর কানে গেল না। সকালের দিকে কেশববাবু উত্তেজিতভাবে অতুলের আচরণ নিয়ে অভিযোগ করতে এসেছিলেন, অবনীমোহন তাঁকে বলে দিয়েছেন, 'আপনার মেয়ে তো নাবালিকা নয়। সে বুঝে শুনে স্বেচ্ছায় ওর সঙ্গে গেছে। এতে আপনারও কিছু করবার নেই, আমারও বলবার কিছু নেই। আপনি এবার বাড়ি যান।'

কেশববাবু গাল দিতে দিতে বলেছেন, 'এমন বাপ না হলে কি অমন দুশ্চরিত্র কুপুত্র জন্মায়?'

অবনীমোহন মৃদু হেসে এই তিরস্কার সহ্য করেছেন কোন জবাব দেননি।

কিন্তু ওই হাসির আড়ালে যে অত্যন্ত মর্মান্তিক দুঃখই তিনি গোপন করেছেন তা অরুণের বুঝতে বাকি থাকেনি। তাঁর কাছে না গিয়ে, তাঁর সঙ্গে কথা না বলেও অরুণ যেন বাবার সঙ্গে এক গভীর নৈকট্য বোধ করল। নতুন করে নিবিড় একাত্মতা বোধ করল মার সঙ্গে।

রাত্রে নিজের ঘরে এসে অরুণের মনে পড়ল করবীর চিঠির জবাব দেওয়া হয়নি। কাটাকুটি ভরা পাতাটি ছিঁড়ে ফেলে প্যাডের নতুন পাতায় অরুণ ফের জবাব লিখতে বসল।

করবী,

তোমার চিঠির জবাব দিতে পুরো একদিন দেরী হয়ে গেল। এই চব্বিশ ঘণ্টা তোমার যে মিনিট গুণে গুণে কেটেছে, তা আমি জানি। আমারও তাই কাটবার কথা ছিল। কিন্তু একটি পারিবারিক ঘটনায় ঘড়ির দিকে তাকাবার আর সময় পাই নি। অতুল রমাকে নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়েছে। অনুসন্ধান বৃথা জেনেও মার মুখের দিকে তাকিয়ে তার জন্যে ছুটোছুটি না করে পারি নি। আমার মুখে কথাটা শুনতে ভারি অদ্ভুত লাগছে, না করবী? আমারও মা আছে, আর আমিও তাঁর দিকে তাকাই। সত্যি, ছেলেবেলা থেকেই আমার

[illegible] হয়েছে অ[illegible]ার বড় বেশি মানুষ, বড় বেশি ভিড়। হাঁটতে গেলে গায়ে গা ঠেকে, মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি হয়, সেই স্পর্শানুভূতি আমার কাছে কোনদিনই সুখকর মনে হয় নি, আমি তাই সব সময় ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলেছি। আমার চিলেকোঠাকে গোটা বাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছি। আমার চিন্তা, আমার ভাবনা, আমার স্বাতন্ত্র্যের দেয়ালে চারদিক ঘিরে ভেবেছি আমি একক। আমি সকলের চেয়ে আলাদা, ওদের কারো সঙ্গেই আমার কোন যোগ নেই। কি করে থাকবে! শিক্ষা-দীক্ষা রুচি-প্রবৃত্তি সব কিছুতে ওদের সঙ্গে আমার অমিল। আমি রক্তের সম্বন্ধ মানিনে, ভাবের সম্বন্ধ মানি।

এতদিন আমি তাই ভেবেছি। তুমি যখন মাঝে মাঝে আমাদের পরিবারের লোকজনের কথা জিজ্ঞেস করেছ, আমি তার জবাব ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গেছি। পরিবারের কারো সম্বন্ধেই আমার কোন ঔৎসুক্য ছিল না, এমন কি মার সম্বন্ধেও নয়। মা তো ছোট ভাই-বোনদের মা, আমার কি। দেড় বছর দু'বছর অন্তর অন্তর আমার এক একটি করে ভাইবোনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, আর মার সঙ্গে আমার ব্যবধান বেড়ে গেছে। মার স্ফীতোদরের দিকে আমি চোখ তুলে তাকাতে পারিনি। আমার লজ্জা হয়েছে, ঘৃণা হয়েছে, অদ্ভুত বিদ্বেষে মন ভরে উঠেছে। দরিদ্রের সংসারে আবার আর এক অংশীদার এল। আর সব কিছুর জন্যে দায়ী আমার বাবাকে আমি কিছুতেই ক্ষমা করতে পারিনি। তাঁর ওপর আমার আক্রোশ চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে।

এই তো আমার পরিবার। আর এই তো তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক। কিন্তু [illegible]রাত্রে ছোট একটি ঘটনায় সব কিছু যেন ওলট-পালট হয়ে [illegible] এমনিভাবে তোমার কাছে চিঠি লিখতে বসেছি [illegible] আমার [illegible] তাঁর চৌকাঠের সামনে দাঁড়িয়ে ডাকলেন [illegible] আমি [illegible] তাঁর দিকে তাকালাম। তাঁর ঠোঁট দু[illegible]